ISSN : 13660

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

দ্বাদশ বর্ষ • শারদ সংখ্যা • আশ্বিন ১৪২৯ • অক্টোবর ২০২২

রামমোহন রায়

- কোভিড নিয়ে আরও
- ইউক্রেন যুদ্ধ
- পদ্মা সেতু
- ছত্তিশগড়ের বস্তার
- ক্রিপটোকারেন্সি

- লতা-সন্ধ্যা যুগাবসান
- নারায়ণী কড়চা
- ঈশ্বরের বানপ্রস্থে
- মহারাজার অসুখ : যশপাল
- স্মরণে সুভাষ-সুরজিৎ
- চড়ুই পাখি
- কুকুর ও সাপ কামড়ের চিকিৎসা

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

STAND WITH
UKRAINE

STOP
WAR

STOP
BOMBING
UKRAINE
PUTIN
!! STOP

STOP
WAR

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন

ISSN : 13660

জন উদ্যোগের সমাহার গণ আন্দোলনের কণ্ঠস্বর

দ্বাদশ বর্ষ ● শারদ সংখ্যা ● আশ্বিন ১৪২৯ ● অক্টোবর ২০২২

পৃষ্ঠপোষক : সনৎ রায়চৌধুরী, জ্ঞানব্রত শীল, সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, রূপক ঘোষ, অনিতা মজুমদার, ষড়ানন পাণ্ডা, অরুণ সেন, বিজন ভট্টাচার্য্য, ফণিগোপাল ভট্টাচার্য্য, নির্মলেন্দু নাথ, সমর বাগচী, দীপক দাঁ, হীরালাল কোনার, পুণ্যব্রত গুন, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর পাল, রাহুল মুখোপাধ্যায়, বরুণ সাহা, সন্দীপ ঘোষ, সৈয়দ শাজাহান সিরাজ ও অলকানন্দা রায়

উপদেষ্টামণ্ডলী : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, জয়া মিত্র, তৃপ্তি সান্ত্রা, কমল চক্রবর্তী, ভবানীপ্রসাদ সাহু, জাতিশ্বর ভারতী, কৌশিক সেন, সোমনাথ গুহ, সোমা সেনগুপ্ত, অর্ণব সেনগুপ্ত, অমিতাভ চক্রবর্তী, সোমেন চক্রবর্তী, শুভম ভট্টাচার্য্য, সুদেব সাহা, অমিতাভ সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শমিত কর, অমিত পান ও দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী : গুণধর বাগদি, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরি, শুভময় দত্ত ও অরণি সেন

সম্পাদকীয় সহযোগিতা: অভিজিৎ দাস, অনন্ত কর্মকার, রাজা রাউথ, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য, পূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম শর্মা, উত্তান বন্দ্যোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা রায় ও অরুণাভ বিশ্বাস

ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সোম, দিলীপ সেন, অর্ঘ্য মিত্র, সুমন্ত বিশ্বাস ও তপন দাস

যোগাযোগ : রামজীবন ভৌমিক (কোচবিহার), সুমন গোস্বামী (আলিপুরদুয়ার), গার্গী সিংহ (জলপাইগুড়ি), ধীরাজ লাখোটিয়া (শিলিগুড়ি), রূপক পাল (রায়গঞ্জ), সূরজ দাস (বালুরঘাট), মৃদুল কান্তি সরকার (মালদা), সুমনা সেনগুপ্ত (বহরমপুর), রঞ্জন আচার্য (পুরুলিয়া), সুনীল সোরেন (সিউড়ি), তুষার গলুই (দুর্গাপুর), মৃণাল বাগচী (চাকদা), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), নীলকণ্ঠ আচার্য (বারাসাত), আনোয়ার হোসেন (দঃ বারাসাত), লক্ষ্মী ভট্টাচার্য (বজবজ), সুশান্ত রায় (হাওড়া)

পরিবেশনা : অয়ন ঘোষ, প্রদীপন গাঙ্গুলী, অভিজিৎ সেন, সুজয় পাল ও স্বপন সামন্ত

প্রচ্ছদ : অর্ক মিত্র; **বর্ণসংস্থাপন :** রাজু রায়

ই-মেল : ssunnayan@gmail.com || **ওয়েবসাইট :** www.ssu2011.com

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশিষ্ট ক্রিকেটার যশপাল শর্মা, টেড ডেক্সটার, অ্যালান ডেভিডসন, অ্যাসলে ম্যালেট, সোনি রামাধীন, রডনি মার্স, শ্যেন ওয়ার্ন, অ্যান্ড্রু সাইমণ্ডস; ফুটবলার সনৎ শেঠ, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ফ্রেডি রিঙ্কন, চিবুজোর; হকি খেলোয়াড় চরণজিৎ সিং; ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় নন্দু নাটেকর; অ্যাথলেটিকস কোচ ও.এম. নাম্বিয়ার; বিজ্ঞানী আব্দুল কাদির খাঁন; শিক্ষাবিদ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন চক্রবর্তী; সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি, বরুণ দাশগুপ্ত; সঙ্গীত শিল্পী স্বপন গুপ্ত, চণ্ডীদাস মাল, বাপী লাহিড়ি, কৃষ্ণকুমার কুনাথ (কে. কে.), নির্মলা মিশ্র; সঙ্গীত পরিচালক বেনার্দ হাইতিঙ্ক, সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়; বাচিক শিল্পী গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ; তবলা বাদক শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ ঘোষ; অভিনেতা ভীষ্ম গুহঠাকুরতা, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়, সুরেখা সিক্রি, পিটার ব্রুক; মনোবিদ অ্যারন টি. বাক; চিকিৎসক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; সাহিত্যিক মিহির সেনগুপ্ত; মানবাধিকার কর্মী ডেসমন্ড টুটু, ফ্রোজান সাফি; রাজনৈতিক নেতা দেবপ্রসাদ সরকার।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে ৩

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৫

● স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ● ফিয়োদর মিখাইলোভিচ দস্তইয়েভস্কি ● চার্লস পিঁয়েরে বোদলেয়ার ● গুস্তাভ ফ্লবেয়ার ● অরবিন্দ ঘোষ ● মার্শেল প্রাউস্ত ● রমাপদ চৌধুরী ● মৃণাল সেন ● রোজালিন ইয়ালো ● রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ● ভি. বালসারা ● এপিডিআর

স্মরণিকা ১০

● ফাদার স্ট্যান স্বামী ● লতা মঙ্গেশকর ● সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ● কমলা ভাসিন ● গেল ওমবেত ● তরুণ মজুমদার ● হাসান আজিজুল হক ● শাঁওলী মিত্র ● বিরজু মহারাজ ● বুদ্ধদেব গুহ ● গার্ড মুলার ● সুভাষ ভৌমিক ● সুরজিৎ সেনগুপ্ত ● শিবকুমার শর্মা ● আবদুল গফফার চৌধুরি ● ব্রিজবিহারী পাণ্ডে

বিশেষ স্মরণিকা ১৭

● নারায়ণী কড়চা—সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়
● সুনন্দ সান্যাল : আপসহীন এক পরিবর্তনপন্থি—সনাতন মুর্মু
● সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় : এক টাকার ডাক্তার

বিশেষ ক্রোড়পত্র ২২

● সমাজ-সচেতক রামমোহন রায়—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
● জন্মের সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো রামমোহনের জন্মভিটা—রাজীব মৈত্র
● রামমোহন রায় এবং ভারতের নবজাগৃতি: একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান—বাপ্পাদিত্য রায়

জনস্বাস্থ্য ৩৪

● কোভিড-১৯ সংক্রমণ, অতিমারি ও শিশুস্বাস্থ্য —অরুণালোক ভট্টাচার্য্য
● কোভিড-এর শিক্ষা—ভবানী প্রসাদ সাহু
● জলাতঙ্কের মত সাপের কামড়কেও জাতীয় কর্মসূচিতে নিয়ে আসতে হবে—দয়াল বন্ধু মজুমদার
● কুকুর ও সাপ কামড়ের সমস্যা—গৌতম মৃধা
● Covid 19 & Health System–Claudio Schuftan
● Vaccines, that received Emergency Use Authorisation by WHO
● Monkeypox - Epidemiology and Management Compiled by Snigdha Banerjee
● Hippocratic Oath: Classical Version & Modern Version
● Charaka Shapath

প্রকৃতি ও পরিবেশ ৫৩

● চড়ুই পাখি—অজন্তা প্রবাহিতা
● নদী শাসনের পরম্পরা : সেকাল ও একাল—কল্যাণ রুদ্র
● মহানন্দা কথা—সৌমিত্র চৌধুরী
● জল সংরক্ষণ : কেন জরুরি—রাজা রাউত
● ইউক্যালিপটাস বনসৃজন সম্পর্কে দু এক কথা—সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
● রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ও পরিবেশ বিনাশ—সোমনাথ গুহ
● COP26 & We—Greenpeace Communique

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৬৭

● অন্নদাতাদের বজ্রপাত থেকে রক্ষার তাগিদে—ষড়ানন পাণ্ডা
● এক যে ছিলেন সরস্বতী—অঙ্কিতা সেনগুপ্ত
● ব্যাটারির ন্যানো কথা—তপন দাস
● মেরুজ্যোতির রহস্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি—অমিতাভ চক্রবর্তী

শিক্ষা প্রসঙ্গে ৭৫

● 'করোনা'-র সমার্থক 'লেখাপড়া করো না'—সোমা সেনগুপ্ত
● আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থা কী সত্যিই চেতনা জাগাতে পারছে এই প্রজন্মের মধ্যে—বরুণ দাস
● শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে দায়িত্ব সরিয়ে নিতে তৎপর সরকার—অনুপম কাঞ্জিলাল
● দুর্নীতির গ্রাসে রাজ্যের শিক্ষা—হরিবাসর বাগদি

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৮৫

● "হাউ ডেয়ার ইউ!" থেকে "আপরুট দ্য সিস্টেম" : দুটি পথের নির্দেশক—তপন সামন্ত
● FIAM সম্পর্কে কিছু কথা—চিন্ময় দাস
● ছত্তিশগড়ের বস্তার আজও অন্ধকারে—অন্তরা ঘোষ
● অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের উৎপাদন—জয়দেব গুপ্ত
● বিচারের বাণী—শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়
● অসময়ের ডায়েরি থেকে—বাবুয়া চৌধুরী
● সমাজের দুর্বল বা অনগ্রসর অংশ থেকে রাষ্ট্রপতি—জিতেন প্রসাদ
● Tradition, Change and Land Alienation... –Pinak Tarafdar & Subhankar Roy

অর্থনীতি ১২৩

● ক্রিপটোকারেন্সি—অমিত দাশগুপ্ত
● অর্থনীতির হালহকিকৎ–বুনো রামনাথ

আন্তর্জাতিক ১৩০

● বাংলাদেশের পদ্মা সেতু—রাকিবুল ইসলাম জয়
● ইউক্রেনের ইতিকথা—গ্যাবিয়েল লোপেজ
● শ্রীলঙ্কায় লঙ্কা কাণ্ড—অরণি সেন
● শিনজো আবের মৃত্যু—রঞ্জিম ভাদুড়ি

গল্প ১৩৩

● মহারাজার অসুখ (মূলরচনা (হিন্দি) যশপাল) —বাংলা রূপান্তর : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

কবিতা ১৩৬

● এক জোড়া মিষ্টি জলের মাছ—আব্বাস কিয়ারোস্তামি
● সংকর সময়—সুধীর চন্দ্র সরকার
● বাবাকে নিয়ে স্বীকারোক্তি—নরেশ দাস
● পরিবেশ—পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়
● পথ—বিপুল আচার্য
● নিজস্ব সংবাদদাতা—মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

ভ্রমণ ১৩৮

● ঈশ্বরের বানপ্রস্থে—দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

পত্রিকার দুনিয়ায় ১৪৩

● অনন্ত যুগও এক দিন ফুরোবে—বিকাশ সিংহ

চিঠিপত্র, রিপোর্ট ১৪৪

● দেওচা পাঁচামির প্রস্তাবিত কয়লা খনি—সবুজ মঞ্চ
● রাজা রামমোহন ২৫০তম জন্মবর্ষ পালন—রাধানগর পল্লি সমিতি
● ১৯মে-র ঐতিহাসিক ভাষা পদযাত্রা—সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ

খবরাখবর ১৫০

সম্পাদকীয়র পরিবর্তে

যুদ্ধ, ধ্বংস, হিংসা, অত্যাচার, হত্যা, গণহত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, সন্ত্রাস, নির্বাচনী সন্ত্রাস, উচ্ছেদ, বর্ণ বৈষম্য, দলিত ও আদিবাসী হত্যা, ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতি বিদ্বেষ, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, স্বৈরাচার, প্রতারণা, দুর্নীতি, তোলাবাজি, অবিচার ও অন্যায়, পরিবেশ দূষণ ও ধ্বংস এবং কর্পোরেট লুঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রতিরোধে সামিল হোন।

ক্রন্দনরতা জননীর পাশে

মৃদুল দাশগুপ্ত

ক্রন্দনরতা জননীর পাশে
এখন যদি না থাকি
তবে কেন এ লেখা, কেন গান গাওয়া
কেন তবে আঁকাআঁকি?

নিহত ভাইদের সব দেহ দেখে
না-ই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন বা সমাজ
কীসের মূল্যবোধ!

যে-মেয়ে নিখোঁজ, ছিন্নভিন্ন
জঙ্গলে তাকে পেয়ে
আমি কি তাকাব আকাশের দিকে
বিধির বিচার চেয়ে?

আমি তা পারি না। যা পারি কেবল
সে-ই কবিতায় জাগে
আমার বিবেক, আমার বারুদ
বিস্ফোরণের আগে।

ভগবান সব শোক ভুলিয়ে দেন

জয় গোস্বামী

আকাশ ভরা শোক
রাবার দিয়ে ঘসে
মুছবেন ঈশ্বর—
বগটুই গ্রাম থেকে
বলো তো মেঘরাশি
কেমন দেখাচ্ছে?
মানুষ মাংসকে
জ্যান্ত পোড়াও যদি
যেমন দেখতে হয়
তেমন, ঠিক তেমনই

মাংস পোড়ার দাগ
মেঘ থেকে সরাবে
ভগবানের হাত
কয়েক বছর পর
আর কেউ ভাববে না
দু-হাজার বাইশে
একুশে মার্চ রাতে
কারা মরল কোথায়—
ক-জন মরল? ক-জন?
মরল ঠিক কীভাবে?
সে-রাতের ঘটনা
আমি, আমার মতো
সব গৃহস্থেরা
কেউ মনে রাখব না
সবাই হাসিমুখে
যাব, আসব, যাব
আগুন-লাগা বাড়ির
পাশ দিয়ে, কাছ দিয়ে
কিছুই হয়নি যেন
সব তো স্বাভাবিক
সূর্য আর চাঁদ
ডুববে, উঠবে
দিন মাস সপ্তাহ
গড়িয়ে যাবে দ্রুত
আজকে কি আর কেউ
সাতষট্টি সালের
সাঁইবাড়ির কথা
ভাবছে বসে বসে?

সময়, ভাই সময়
সে এক আজব জিনিস
সে-নদী সব খায়
মনের ওপর পলি
ফেলতে ফেলতে চলে...
বগটুই গ্রামের
আগুন ভুলে যাব
সবাই, আমরা সবাই...
কেবল কবিতায়
শোয়ানো থাকবে
সাদা কাপড় ঢাকা
আটটি মৃতদেহ

জ্বলে যায় চোখের আকাশ

উৎসর্গ : নিহত কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

এত ছাই কোত্থেকে আসে?
ঢেকে যায় দৃষ্টি মাটির আকাশ
সমুদ্রের কঙ্কালের ওপর দাঁড়ায়
পৃথিবীর কালো কালো নৌকা শুধু
বৈঠা ও দাঁড়সমেত লম্বা ফাঁপা হাড় দিয়ে
তৈরি
পাথর যুগ থেকে পুড়ে যাচ্ছে হাড়
চাঁদের তলায় শাদা আর ফোঁপরা হচ্ছে
প্রতিদিন
নিষ্ঠুরতার আদিম সাক্ষী সে
ধবধবে আগুনে পুড়তে পুড়তে দেখছে
নৌকোর চোখের ধার দিয়ে ধার দিয়ে
কেমন ঝুলে থাকে ধবধবে বরফ আর ঘেন্না
দু'এক ফোঁটা জল শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল
শুধু
চকমকি হয়ে জ্বলে ওঠে মুহূর্তে
সরু ছুরির মতো চোখের আকাশ
ক্ষত খুলে দেখায় আর বলে ধোঁয়া উড়ুক
এবার
খুলে যাক আগুনের ধারালো ডানা
যখন ছাই এসে ঢেকে দিচ্ছে শ্বাসনালী
জলের ওপর দিয়ে পানির ওপর দিয়ে
ঘুরে যাক তবে এ গ্রহের সমস্ত নৌকো
ঈগলের বাঁকানো ঠোঁটের মতো কালো
নৌবহর
চিৎকার করুক তাদের অভিশাপ ও প্রার্থনা
রাব্বা! রাব্বা! আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি
না!

খামোখা

আর্যতীর্থ

হাথরস হাঁসখালি
বালিকা চোখের বালি
যত দোষ সবই জেনো কিশোরীর।
সকলই গরলি ভেল
চরকায় ভুল তেল
আহা প্রেম হয় নাকি নি-শরীর?
কত যে দুষ্টু ছেলে,
এই দেশ জুড়ে মেলে,
খলবল করে দেহে হরমোন
কিশোরী করেছে ভুল,
তাই ফোটে গণ-হুল
খামোখা তোমরা বলো ধর্ষণ।

শাসকেরা সব জানে,
বাতাস বলেছে কানে,
কিশোরীটি ছিলো নাকি পোয়াতি,
প্রেম কত ছিলো মেপে,
কাগজেরা দেবে ছেপে,
মাসোহারা পায় সব দোয়াতই।
যারা সেটা পায়না,
তাদেরই তো বায়না,
হায়না দাগায় মিঠে ছেলেদের,
চেনা জমি কর্ষণ
কেন হবে ধর্ষণ,
এমন ঘটনা রোজ মেলে ঢের।

সঠিক ছাতার তলে,
চলে এসো দলে দলে,
ঘাঁটাবে না কোনোকালে পুলিশে,
রেপ করো, নেই চাপ,
জেনে যাবে মেয়ের বাপ
আত্মজা-শব-বাহী কুলি সে।
দলের পতাকা নিলে,
পড়বে না মুশকিলে
গ্যাংরেপ হলে হোক, সব মাফ,
দেখালে মোহন রূপ,
বিলকুল হয়ে চুপ,
শ্মশানে পোড়াবে মেয়ের শব বাপ।

গণতন্ত্রের জয়,
কানে গেলে লাগে ভয়,
কার কোল খালি করে অভিশাপ।
আমাদের ভাগ্যতে,
পারি শুধু ভাগ হতে,
শিরদাঁড়া বেচে দিয়ে নেই চাপ।

শাসকেরও নেই তাই অনুতাপ...

(সংগৃহীত)

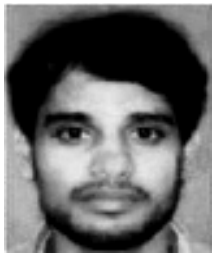

শহীদ বরুণ বিশ্বাস (১৯৭২-২০১২)

আনিস খান (১৯৯৩-২০২২)

বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ

(১৭৭২—১৮৩৪)

খ্যাতনামা ব্রিটিশ কবি, সমালোচক, দার্শনিক ও প্রকৃতির পূজারী। বন্ধুবর খ্যাতনামা কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের অনন্যপর্ব রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম উদ্‌গাতা। শৈশবে পিতাকে হারান। তারপর বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা। স্কুল জীবনে 'ফ্রস্ট এট মিডনাইটে'র মত কবিতা লেখেন। তিনি দাস প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন এবং 'প্যান্টিসোক্রেসি' সাম্যধর্মী আন্দোলনে যোগ দেন। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এবং পরবর্তিতে ব্যর্থ বিবাহ জীবন তাঁর মানসিক সমস্যাকে বাড়িয়ে দেয়। 'দ্য ওয়াচম্যান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বেশ কিছুদিন জার্মানিতে থাকেন। পরে ইংল্যাণ্ডে ফিরে আসেন এবং শেষে ইংল্যাণ্ডে হ্রদ অঞ্চলে প্রাকৃতিক নিসর্গের কোলে থিতু হন। একদিকে অক্সফোর্ড সাহিত্য আন্দোলনে যুক্ত হন এবং 'ওপাস ম্যাক্সিমাম' এর মত দর্শনের আকর গ্রন্থ প্রকাশ করেন, অন্যদিকে উন্মাদনা এবং নেশায় আসক্তি বেড়ে চলে। অসুস্থ হয়ে লন্ডনে মারা যান। তাঁর 'দ্য রাইজ অফ দ্য এনসিয়েন্ট মারিনার', 'কুবলাই খাঁন অর এ ভিসন ইন আ ড্রিম', 'খ্রীষ্টাবেল', 'ফ্রস্ট এট মিডনাইট' কাব্যগ্রন্থগুলি স্বনামধন্য। তিনি দর্শনের জগতে একেশ্বরবাদী এবং রাজনৈতিক চিন্তায় সাম্যবাদী ছিলেন। ফরাসী বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর সার্ধদ্বিশত জন্ম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ফিয়োদর মিখাইলোভিচ দস্তইয়েভস্কি

(১৮২১—১৮৮১)

১৮৫৯এর ২২ ডিসেম্বর, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের পিটারপল কারাদুর্গের বধ্যভূমিতে সার সার দাঁড় করানো হয়েছে বেশ কয়েকজন রাজবিদ্রোহী বুদ্ধিজীবীদের। জারের নির্দেশ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্দুকের গুলি তাদের মাথা ফুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। জীবন-মৃত্যুর মাঝে আর কয়েকমুহূর্তের ব্যবধান মাত্র। চারিদিকে বধ্যভূমির নিরবতা। হঠাৎই সেই নিরবতা ভেদ করে কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। এসেছে নতুন আদেশ জারের। মৃত্যুদণ্ড পরিবর্তিত হয়েছে নানা মেয়াদের সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে। ঐ রাজবিদ্রোহীদের মধ্যে ছিলেন রুশ তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ফিয়োদর দস্তইয়েভস্কি। সাইবেরিয়ার বন্দী শিবিরে চারবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি। এখানেই শেষ নয় এরপরে আরো পাঁচবছর জারের সেনাবাহিনীতে তাঁকে কর্মদণ্ড দেওয়া হয়।

নির্বাসন দণ্ড ভোগ করে ফিরে আসার পর তাঁর মনোজগতের বেশ পরিবর্তন হয়। আর সেই পরিবর্তনের ভাবনা রূপ পায় তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'ক্রাইম এ্যণ্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬)-এ। এরপর 'ইডিয়ট'। তারপর 'ডিমনস', 'নোটস ফ্রম আণ্ডারগ্রাউণ্ড' এবং আরো বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্প। তবে এগুলির অনেক আগেই সাহিত্যরসিকরা চমকে উঠেছিলেন তাঁর 'পুওর ফোক' উপন্যাস পাঠ করে। তাদের মনে হয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে এক নতুন গোগোলের আবির্ভাব হল। তবে সাহিত্য সমালোচকদের অধিকাংশই তাঁর 'ব্রাদার্স করমাজভ' (১৮৮০)-কেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত করেন।

তবে এতবড় এক ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবন মোটেই সুশৃঙ্খল ধারায় চলেনি। প্রায়ই পরিবার বা অন্যান্য সম্পর্কের টানাপোড়েনে প্রবল যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। সেইসঙ্গে মদ্যপান ও জুয়ার প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তি তাঁকে প্রবলভাবে বিধ্বস্ত করতো। হয়তো বা জিনিয়াসদের এটাই পরিণতি হয়। তাছাড়া তিনি মৃগী রোগেও ভুগতেন।

তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি ইঞ্জিনিয়ার হোন। সাফল্যের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে তিনি একটি নামকরা কোম্পানিতে ড্রাফট্‌সম্যান পদে যোগ দেন। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে চাকরিতে ইস্তফা দেন তিনি। বলেছিলেন নিজেকে কবি বলে মনে হতো কখনোই ইঞ্জিনিয়ার বলে নিজেকে মেনে নিতে পারিনি। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে রইল শ্রদ্ধাঞ্জলি।

চার্লস পিঁয়েরে বোদলেয়ার

(১৮২১—১৮৬৭)

বিশিষ্ট ফরাসী কবি, প্রাবন্ধিক ও শিল্প সমালোচক। কাব্যে ছড়া ও ছন্দে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর কাব্যে রোমান্টিসিজম উদ্ভূত এক দূর অনাগত ভাবজগতের এক্সটিসিজম অনুভব করা যায়। পাশাপাশি তাঁর কাব্যে আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। 'দ্য ফ্লাইয়ার্স অফ এভিল' তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। প্যারিসে জন্ম। আমলা পিতা তাঁর মায়ের চাইতে ৩৪ বছরের বড় ছিলেন। বাল্যে পিতার মৃত্যু হলে তাঁর মা পুনর্বিবাহ করেন। এই ঘটনাগুলি বোদলেয়ারের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। আইনের স্নাতক হবার পরে কোন স্থায়ী কাজে যুক্ত না হয়ে ভবঘুরে কবির জীবন শুরু করেন। ১৮৪১-এ কলকাতায়

এসেছিলেন। ১৮৪৮-এর ফরাসি বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা একসময় অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত ও নিষিদ্ধ হয়। বিশিষ্ট চিত্রকর এডওয়ার্ড মানের সঙ্গে যৌথভাবে অনেক কাজ করেছেন। তাঁর চিন্তা ও সৃজন ফরাসি ও বিশ্ব সাহিত্য সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা।

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার

(১৮২১—১৮৮০)

বিশিষ্ট ফরাসি ঔপন্যাসিক এবং সাহিত্যের বাস্তববাদের অন্যতম প্রবক্তা। 'মাদাম বোভারি' তাঁর সবচাইতে নামী গ্রন্থ। উত্তর নরমান্ডির রুইতে জন্ম ও পড়াশোনা। পরে প্যারিসে আইন পড়ে আবার রুইতে ফিরে আসেন। মধ্যপ্রাচ্য, গ্রিস সহ দক্ষিণ ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তাঁর রচনাবলী ফরাসি ও বিশ্বসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা।

অরবিন্দ ঘোষ

(১৮৭২—১৯৫১)

''এই যে এত হৈ চৈ হট্টগোল, এত আন্দোলন সব বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে কাঠগড়ায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গত হয়ে যাবেন। কিন্তু সেদিন এই মানুষটিকেই আবার দেশাত্মবোধের কবি রূপে, জাতীয়তাবাদের ঋষিরূপে, মানবতার প্রেমিকরূপে মানুষ তাঁকে মনে রাখবে। তাঁর মৃত্যুর অনেক অনেকদিন বাদেও তাঁর বাণী ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে শুধু ভারতে নয় দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়েও তা পৌঁছে যাবে। তাই বলি ঐ যে মানুষটি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন উনি কেবল আদালতের কাঠগড়ায় নয়, উনি দাঁড়িয়ে আছেন ইতিহাসের উচ্চ কাঠগড়ায়। বাকি বিচার মি লর্ড আপনার।'' এই বলে বক্তব্য শেষ করেছিলেন আসামী পক্ষের কৌসুঁলি ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস।

সেটা ছিল ১৯০৯ সালে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। শুনানি চলছিল আলিপুর আদালতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অত্যন্ত চর্চিত আলিপুর বোমা মামলার। বিচারপতির আসনে মিঃ বিচক্রফ্‌ট যিনি অভিযুক্তের সাথে একইসাথে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন, আসামীর কাঠগড়ায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যতম মেধাবী ও সফল ছাত্র অরবিন্দ ঘোষ। সরকার পক্ষের দুঁদে এ্যাটর্নি মিঃ নর্টন আর অভিযুক্তের পক্ষে তরুণ আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাস (সি. আর. দাস)। যে করেই হোক অভিযুক্তকে ফাঁসিতে ঝোলাতেই হবে এই উদ্দেশ্যে মিঃ নর্টন আসামীকে জঘন্য অপরাধী প্রমাণ করতে চাইছেন, অন্যদিকে সি. আর. দাস তাঁর ক্ষুরধার যুক্তিজালে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে প্রধান সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বোস জেলের মধ্যে হত্যা করেছে। ৬ মে, ১৯০৯ রায় দিলেন বিচারক। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস অভিযুক্ত অরবিন্দ ঘোষকে। যদিও একই মামলায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ ১৯ জন বিপ্লবীর আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সহ নানাবিধ সাজা হয়। কিন্তু আদালতে বাদ-বিবাদ, সাক্ষ্য-প্রমাণ, আরোপ-প্রত্যারোপ, জেলের অসহনীয় জীবনের মধ্য দিয়ে অরবিন্দ চিন্তাজগতের মধ্যে যেন নারায়ণকে প্রত্যক্ষ করলেন। বললেন ''বাসুদেব সর্বমিতি।'' অর্থাৎ সর্বত্র বাসুদেবকে তিনি অনুভব করছেন। তারপর ক্রমশ তিনি অত্যন্ত সক্রিয় সশস্ত্র বিপ্লববাদ থেকে একেবারে নিরাসক্ত আধ্যাত্মবাদে চালিত হলেন। কিন্তু সেসব তো পরের কথা। তার আগে—

জাতীয়তাবাদী রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দের সিভিল সার্জেন পিতা তাঁদের ব্রিটিশ কায়দায় মানুষ করতে চেয়েছিলেন। তাই বাল্যে দার্জিলিঙের লোরেটো স্কুলে, তারপর মাত্র সাতবছর বয়সে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতার সঙ্গে প্রথমে ম্যাঞ্চেস্টারে, পরে লন্ডনের সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি করেন।

আই. সি. এস. পরীক্ষা এড়িয়ে গেলেও অত্যন্ত মেধা ও সাফল্যের সঙ্গে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র জীবন কাটিয়ে ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে প্রথমে অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৯০২ সালে ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও সহচর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে শুরু করেন সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকান্ড। ভগিনী নিবেদিতার প্রভাবে তিনি 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্যদের এক হাতে গীতা ও অন্যহাতে তরবারি দিয়ে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকেন। সে সময় তাঁর মতো তেজস্বী ও ক্ষুরধার বক্তা ভারতীয় নেতাদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। এবং ১৯০৭-র সুরাট অধিবেশনে কট্টরপন্থীদের সমর্থন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লে ও বয়কট আন্দোলন শুরু হলে তিনি বিপুল অর্থের বরোদা রাজ কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মহাবিদ্যালয়—ন্যাশনাল কলেজে সামান্য বেতনের বিনিময়ে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁর সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম' ও 'কর্মযোগীন' পত্রিকায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে যুবসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা পায়। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য একেবারে উঠে পড়ে লাগে। এই সময় ওইসব রাজদ্রোহ মূলক লেখা ও মজফফরপুর কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্রের যোগসাজসে ১৯০৮ সালে গ্রেফতার করে তাঁকে জেলে পোরে। শেষপর্যন্ত প্রমাণাভাবে ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসামান্য সওয়াল জবাবে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু পুনরায় গ্রেফতার হওয়া এড়াতে ঐ দুটি পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনার ভার ভগিনী নিবেদিতার হাতে দিয়ে তিনি ফরাসি প্রভাবিত চন্দননগরে আশ্রয় নেন। পরে

সেখানেও নিরাপদ নয় ভেবে ১৯১০ সালের ১লা এপ্রিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র ছদ্মনামে কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে 'ডুপ্লে' জাহাজে চড়ে ফরাসি উপনিবেশ পন্ডিচেরি রওনা দেন ও ৪ এপ্রিল সেখানে পৌঁছান। তাঁর অনুমান সত্য প্রমাণিত করে তার পর পরই তাঁর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা বার হয়।। কিন্তু তিনি ততদিনে পন্ডিচেরি পৌঁছে যাওয়ায় তা আর কার্যকর হয়না।

এরপর সেখানে তিনি তাঁর অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে ক্রমশ সমস্ত রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। ঘটনাটি ঠিক তখনই ঘটে যখন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর অনুপস্থিতি এক বিশাল ক্ষতি বলে গণ্য হয়েছিল। কিন্তু এরপরেও তিনি ক্রিপস মিশন, স্বায়ত্বশাসনের মত ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। আবার স্বাধীনতার সময় দেশভাগের বিরোধিতা করেন। ক্রমশ তিনি 'দিব্য জীবনের' দিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং লেলে মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে মাত্র তিনদিনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি Life Divine, গীতা ভাষ্য, সাবিত্রীর মতো প্রায় ৩৮টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি পন্ডিচেরিতে 'অরবিন্দ আশ্রম' স্থাপন করেন এবং পরবর্তিতে তাঁর প্রধান সহযোগী মীরা আলফাসা (শ্রীমা) প্রতিষ্ঠিত (১৯২৬) শ্রী অরবিন্দ মিশন আধ্যাত্ববাদ ও যোগচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ উদযাপন।

মার্শেল প্রাউস্ত

(১৮৭১—১৯২২)

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। সাতটি খণ্ডে তাঁর মহাকাব্যিক রচনা 'ইন সার্চ অফ লস্ট টাইম'। ফ্রান্সে জন্ম শিয়ান যুদ্ধের পর এবং প্যারিস কমিউন পতনের লগ্নে। অধ্যয়ন শেষে প্রাউস্ত সাহিত্য কর্মে যুক্ত হন। চিন্তার জগতে ছিলেন উদারতাবাদী। 'দ্য প্রিজনার', 'দ্য ফিউগেটিভ', 'টাইম রিপেইনড', 'ইন দ্য স্যাডো অফ ইয়ং গার্লস ইন ফ্লাওয়ার' ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হাঁপানিতে ভুগলেও তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন। সাহিত্য জগতে একটি ধারা সৃষ্টি করে গেছেন। তার জন্মের সার্ধ শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা।

রমাপদ চৌধুরী

(১৯২২—২০১৮)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসময়ে অনেক দূরে বাংলা-বিহার (ঝাড়খণ্ড)-ওড়িশার সীমানা ঘেঁষা এক অনামী রেলস্টেশন এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল ছিল কাহিনীর ঘটনাস্থল। কাছাকাছি এক ইঙ্গ-আমেরিকান বন্দী ইতালিয় যুবা বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়েছে নেহাতই ভোলেভালা এক স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে। দোর্দাণ্ড প্রতাপ ইংরাজ সরকার বাহাদুরের এক অতি নগন্য কর্মচারী তিনি। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ধরিয়ে না দিলে এ সরকারি কাজে অবহেলা বলে গণ্য হবে। অথচ এক দেবদূত দর্শন সারল্যে ভরা এই সদ্য যুবাকে আবার ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তুলে দিতে স্টেশন মাস্টারের পরিবারের কারোর মন চায়না। তিনিও কি চান? অথচ পলাতক বন্দীর খোঁজে পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরছে। এরপরও তাঁকে বাড়িতে রাখা রাজদ্রোহিতার সামিল। এমন এক দারুন রোমান্টিক সাসপেন্সে এগিয়ে চলে তাঁর 'স্বজন' এর গল্প। কি নিটোল পেলবতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালকে বাংলার আবহে তিনি কলমের রেখায় এনেছিলেন।

'বনপলাশির পদাবলী', 'দ্বিপের নাম টিয়ারঙ', 'খারিজ', 'বাড়ি বদলে যায়', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', 'প্রথম প্রহর', 'বীজ', 'লালবাই', 'বাহিরি', 'ছাদ' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য উপন্যাস। 'অভিমন্যু', 'এখনই' সহ বেশ কয়েকটি লেখা চলচ্চিত্রায়িত করেছেন মৃণাল সেন, তপন সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট পরিচালকেরা। বাস্তব অথচ সাধারণ কোন বিষয় বা সমস্যা নিয়ে তিনি গল্পের জাল বুনতেন এবং আকৃষ্ট করতেন। মধ্যবিত্তের মনন ও সঙ্কট নিয়ে তাঁর অনেকগুলি রচনা আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্যের অ্যাকাডেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল ইন্টার ন্যাশানাল এ্যাওয়ার্ডে ভূষিত। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ট্র্যাজেডি' তার মাত্র ১৮ বছর বয়সের রচনা। সেই নিরিখে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরেরও অধিক লেখক জীবনে তার লেখার সংখ্যা বিস্ময়কর ভাবে কম। আসলে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পরিমাণের তুলনায় মানকে গুরুত্ব দিতেন অনেক বেশি। দীর্ঘদিন তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার সংগে যুক্ত ছিলেন। ঐ পত্রিকার রবিবাসরীয় তিনিই সম্পাদনা করতেন। একইভাবে তিনি ঋজু ছিলেন সম্পাদনার ক্ষেত্রেও। তাঁর কড়া অভিভাবকত্বে বহু নবীন সাহিত্যিক আজ বঙ্গ সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জন্মের শতবর্ষে রইল বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মৃণাল সেন

(১৯২৩—২০১৮)

বাংলা চলচ্চিত্রের প্রাঙ্গণে নতুন ধারার ছবি তৈরিতে যে তিন কৃতী ভারতীয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারে ভারতকে সম্মানিত করেছেন, তাদের অন্যতম একজন মৃণাল সেন। বাকি দু'জন অবশ্যই সত্যজিৎ রায় এবং ঋত্বিক ঘটক। তিনজনেই সমসাময়িক হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ছিলেন অনন্য। আবার সত্যজিৎ রায় ব্যতিরেকে মৃণাল সেনই ছিলেন একমাত্র ছবি পরিচালক যার ছবি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র উৎসব কান, ভেনিস ও বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল। তাঁর পরিচালিত প্রতিটি ছবিই বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। শুধু বাংলা কেন হিন্দি, ওড়িয়া, তেলেগু ভাষাতেও তিনি ছবি তৈরি করেছেন এবং বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। 'নীল আকাশের নীচে' দিয়ে

তাঁর যে পথচলা শুরু হয় তা 'বাইশে শ্রাবণ', 'আকাশ কুসুম', 'ভুবন সোম', 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা-৭১', 'মৃগয়া', 'কোরাস', 'আকালের সন্ধানে', 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ', 'মহাপৃথিবী', 'অন্তরীন', 'পরশুরাম' (বাংলা) 'মাটির মণিষা' (ওড়িয়া) 'ওকা-উরি-কথা' (তেলেগু) 'জেনেসিস', 'খন্ডহর' (হিন্দি) এ পরিণতি পায়। এছাড়াও আরও বেশ কিছু ছবি তিনি তৈরি করেছেন। বাস্তবের চলমান জীবনকে সমান্তরাল ভঙ্গিতে তিনি তাঁর ক্যামেরায় বন্দী করতেন। চলচ্চিত্রকার হিসাবে নানান সম্মানে তিনি ভূষিত হয়েছেন। যার মধ্যে পদ্মভূষণ (১৯৮৩), Order Des Arts el des Letters (১৯৮৫, ফ্রান্স) Order of Friendship (২০০০, রাশিয়া)। দাদাসাহেব ফালকে (২০০৩) ছাড়াও বহু 'ফিল্মফেয়ার' ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার তিনি পেয়েছেন।

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৮৩) এবং মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দু-দুবার (১৯৯৭ এবং ২০০৪) তিনি জুরি ছিলেন। এর বাইরেও সামাজিক আন্দোলনে তিনি আজীবন সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতামতের জন্য বারবার শাসকদের রোষানলে পড়েছেন।

চলচ্চিত্রের প্রাঙ্গণ ছাড়াও ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ইউপিএ শাসনকালে তিনি ছিলেন রাজ্যসভার মনোনীত সাংসদ। সেই ছোট্ট পরিসরেও সীমিত সামর্থ্যে তিনি এমন প্রান্তিক মানুষদের জন্য কাজ করেছেন যাঁরা হয়তো তাঁর নামই কোনদিন শোনে নি।

বাংলার এই কীর্তিমান মানুষটির জন্ম-শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রোজালিন ইয়ালো

(১৯২১—২০১১)

বিশিষ্ট নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও মেডিকাল ফিজিক্সের গবেষিকা। প্রাণীদেহে হরমোন, ভিটামিনস, এনজাইমস, ড্রাগস, বিষাক্ত পদার্থ অর্থাৎ জৈব রাসায়নিক পদার্থের অনুপাত, বিক্রিয়া প্রভৃতি পরিমাপ করতে, রোগ সনাক্ত করতে তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে কোন পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে রেডিও আইসোটোপ তৈরি করে তার সাহায্যে রেডিও ইমিউনো অ্যাসে (আর.আই.এ.) টেকনিক আবিষ্কারের জন্য ১৯৭৭-এ হিউম্যান ফিজিওলজিতে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটের অসচ্ছল ইহুদি পরিবারে জন্ম। স্কুল পাঠ শেষে হান্টার কলেজে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা। লিঙ্গ বৈষম্যে ও আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক। ইলিয়নয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি। বিজ্ঞানী অ্যারন ইয়ালোর সঙ্গে বিবাহ। বিভিন্ন ল্যাবেরটরিতে গবেষণার চেষ্টা। অবশেষে অবসর নিয়ে ব্রঙ্কস ভেটারেনস হাসপাতালে অস্থায়ী গবেষণাগার তৈরি করে প্রায় পাঁচ দশক ধরে নিরলস গবেষণা এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

(১৯২১—২০০০)

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলায় যে আরেকবার শিল্প সাহিত্যে প্রতিভার বিস্ফোরণ হয় কমলকুমার মজুমদার, জীবনানন্দ দাস, পরিতোষ সেন, নীরদ মজুমদার, গণেশ পাইন, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় প্রমুখদের সৃজনে তাঁরই এক গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বচরিত্র ছিলেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত বা শাঁটুলবাবু। বন্ধুবর সত্যজিতের এই 'সিধু জ্যঠা' ছিলেন পান্তাভাত থেকে বিদেশী সুরা—সব কিছুর এনসাইক্লোপেডিয়া। বাঙালির এক স্বর্ণযুগের প্রতীক শাঁটুলবাবু পণ্ডিতিফলানোর বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় কেবল কৌতূহল ও মজার জন্য বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন। পুরোনো কলকাতার কথা, পুরনো পঞ্জিকা, কালীঘাটের পট, কলকাতার বিভিন্ন রেস্তোরাঁর মেনু কার্ড, কমিক্সে 'মেদিনীপুরের পটচিত্র', 'পুরনো লোকশিল্প', 'পুরনো লিথোগ্রাফ', 'বাঁকুড়ার টেরাকোটা মন্দির'...। বিচিত্র সব বিষয়ে আগ্রহ ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ', 'মাছ আর বাঙালি' ও 'স্থান কাল পাত্র'। ওড়িশার কটকে প্রবাসী শিক্ষিত বাঙালি পরিবারে জন্ম। অর্থনীতিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পরে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানেও তাঁর সৃষ্টিশীলতার সাক্ষর রাখেন। খাঁটি বাঙালি ও কেতাদুরস্ত ইংরেজের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ছিলেন। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

ভিসটাস আরদেসির বালসারা

(১৯২২-২০০৫)

ভি. বালসারা ছিলেন এক অসাধারণ সুরস্রষ্টা। মূলত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কম্পোজার হলেও হিন্দি ও বাংলা সিনেমার গানে, আধুনিক বাংলা গানে, ভজন ও গজলে, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও কবিতায় চমৎকার সব অর্কেস্ট্রেশন করেছেন। বম্বের গুজরাতি পার্সি পরিবারে জন্ম। বাল্য থেকেই সুরের জগতে বিচরণ। ১৯৪২ থেকে ফিল্মের জগতে কাজ শুরু। ১৯৪৭এ এইচ.এম.ভি.র অর্কেস্টা ডিরেক্টর ছিলেন। আর. কে. ফিল্মেও কাজ করেছেন। সুরসাধক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের আহ্বানে ১৯৫৪ থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকা এবং বাংলাকে ভালোবেসে পুরোদস্তুর বাঙালী হয়ে যাওয়া। এই স্মিতভাষী অমায়িক ভদ্রলোক সুরবিস্তারকের অক্রূর দত্ত লেনের গৃহটি একাধারে হয়ে উঠেছিল সঙ্গীতের চর্চা কেন্দ্র ও মিউজিয়াম।

তিনি পিয়ানো, পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ন, হারমোনিয়াম, ইউনিভক্স, মেলোডিকা, জলতরঙ্গ সহ বহু বাদ্যযন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ৩২টি বাংলা ও ১২টি হিদি ফিল্মে বাদ্য রচনা করেছেন, রয়েছে ২০০টির বেশি অ্যালবাম। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা।

এ.পি.ডি.আর.-এর পঞ্চাশ বছর

সত্তর দশকের শুরুতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভিয়েতাম, পূর্ব পাকিস্তান, চিলি বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী শক্তি ও জনবিরোধী রাষ্ট্রের গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ইন্দিরাগান্ধী-সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তানাশাহীর নৃশংস নিপীড়ন যে শক্তিশালী প্রতিবাদী নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলে তার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গে ২৫ জুন ১৯৭২ গড়ে ওঠে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস (এ.পি.ডি.আর.)'। প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতৃত্বে ছিলেন বিশিষ্ট স্থপতি ও নদী বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী দাস ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, বরেন দাম প্রমুখ। কপিল ও তিলোত্তমা ভট্টাচার্যের গৃহে বউবাজারের ১৮ মদন বড়াল লেনে এর কার্যালয় তৈরি হয়।

এ.পি.ডি.আর. এর আন্দোলন

তারপর থেকে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে নাগরিক ও অধিকার রক্ষা নিয়ে কখনও রাজপথে নেমে কখনও আদালতে একের পর এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। বন্দীমুক্তি নিয়ে, TADA MISA UAPA কালাকানুন বাতিলের দাবিতে, উন্নয়নের নামে গরীব মানুষকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে... একের পর এক আন্দোলন। এর মধ্যে অর্চনা গুহ মামলা (১৯৭৭), ভিখারি পাসোয়ান মামলা (১৯৯৩), রিজায়ুর রহমান মামলা (২০০৭), সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি ফেরত দেওয়ার মামলা (২০০৬) প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

বীরাঙ্গনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে সকল বীরাঙ্গনার নাম অলক্ষ্যে থেকে গেছে তাদের কয়েকজন: গীতা কর, গীতা মজুমদার, বিশাখা বৈরাগী, রঞ্জিতা বিশ্বাস, ছায়া হালদার, লক্ষ্মী মণ্ডল, ইরা কর, মঞ্জু বিশ্বাস, শোভা বৈরাগী, সাজেদা চৌধুরী, অনিলা, আরতি প্রমুখ। এদের ত্রিপুরার গোবরা ক্যাম্প থেকে ট্রেনিং দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রণাঙ্গনে পাঠানো হয়েছিল।

আসামের বাংলা ভাষা শহিদ তালিকা

১৯৬১-র ১৯শে মে-র একদিনের একাদশ শহিদেরা

১। কমলা ভট্টাচার্য, ২। শচীন্দ্র নাথ পাল, ৩। সুনীলকুমার সরকার, ৪। বীরেন্দ্র সূত্রধর, ৫। কানাইলাল নিয়োগী, ৬। সুকোমল পুরকায়স্থ, ৭। সত্যেন্দ্র দেব, ৮। চণ্ডীচরণ সূত্রধর, ৯। হীতেশ বিশ্বাস, ১০। কুমুদরঞ্জন দাস, ১১। তরণী দেবনাথ।

১৯৭২ সালের ১৭ই আগস্ট

শহিদ হন করিমঞ্জের যুব ফেডারেশন নেতা

১২। বিজন চক্রবর্তী বাচ্চু

১৯৮৬-র ২১শে জুলাই প্রাণ হারান শহিদ

১৩। দিব্যেন্দু দাস (জিশু), ১৪। জগন্ময় দেব (জগন)।

১৫তম শহিদ হলেন ১৯৯৬-এ বিষ্ণুপুরী মণিপুরি ভাষার ষোড়শী কন্যা

১৫। সুদেষ্ণা সিংহ।

স্মরণিকা

ফাদার স্ট্যান স্বামী

(১৯৩৭-২০২১)

এক মহাজীবনের মঙ্গলময় অভিযাত্রা। তাঁর ভাষায় ধনীর যীশুকে সেবা করার বিলাসী জীবন নয় ভারতের প্রান্তিক গ্রাম অরণ্যের অগণিত নিরাশ্রয় বিপন্ন বুভুক্ষ আর্ত দরিদ্র আদিবাসী, জনজাতি, দলিত, নারী শিশুর কল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করা। যুবা বয়সে যে তামিল ঋজু যুবক সন্ন্যাস নিয়ে রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের জেসুইট শাখার পাদ্রী হিসাবে পরবর্তী ছয় দশক দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব ভারতের পথে প্রান্তরে গরীবের পর্ণকুটিরে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই ফাদার স্ট্যানিস্লাস লুরডুস্বামী বা ফাদার স্ট্যান ছাত্রজীবনে ফিলিপাইনসে সমাজ বিজ্ঞান পড়ার সময়েও গর্জে উঠেছিলেন। পেরুর গুস্তাভো গুটিয়েরেজ, ব্রাজিলের লিয়েনার্দো বফ, উরুগুয়ের হুয়ান লুই সেগুণ্ডো প্রমুখের ধারাস্নাত লাতিন আমেরিকার ধর্মীয় মুক্তিতন্ত্রের বিপ্লবী চার্চের অন্যতম উদ্‌গাতা ব্রাজিলিয় ক্যাথলিক আর্চ বিশপ হেল্ডার কামারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আদিবাসী, দলিত ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য তাঁর আমৃত্যু সংগ্রাম শুরু হয়। মানবতার সঙ্গে ছিল লিউক ৪-এর নাজারেথ ম্যানিফেস্টো, যেখানে প্রভু যীশু দরিদ্র, বন্দি সমস্ত মানুষের মুক্তির জয়গান গেয়েছেন এবং খ্রিস্টান থিয়োলজির তত্ত্ব। তিনি ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম সিডিউল এর সঠিক প্রয়োগকে বারবার তুলে ধরেছেন যেখানে সংবিধান বিবৃত সমানাধিকারের ভারতের কথা বলা হয়েছে। এর লঙ্ঘণগুলিকে তিনি চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরেছেন। ট্রাইবাল অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের প্রস্তাব রেখেছেন। ৭০টির মত বই লিখেছেন। সত্তরের দশকে তিনি তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম ও তাঞ্জোরে দলিতদের মর্যাদা আদায়ের জন্য, কর্ণাটকে কৃষিক্ষেত্রে বেগার মজুরদের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এতদিনকার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যবাদী জমিদার-পুরোহিত-মহাজন-মাফিয়া-রাজনীতিক চক্র এবং তাদের প্রভাবিত রাষ্ট্রের কাছে বাধা পেয়েছেন, বাধা পেয়েছেন চার্চের মধ্যে থেকেও। বারবার কাজের জায়গা বদলাতে হয়েছে। ১৯৭৫-১৯৮৬-তে ছিলেন বেঙ্গালুরুর জেসুইট পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল ইনস্টিটিউট' এর ডিরেক্টর।

কিন্তু শ্রম, লিঙ্গ, বর্ণ ও আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের পথ চলা থামানো যায়নি। ঝাড়খণ্ডে গরীব নিরক্ষর ভূমিপুত্র আদিবাসীদের ঠকিয়ে উৎখাত করে খনি মাফিয়াদের জল জঙ্গল টিলা নদী গ্রাম একের পর এক দখল করার বিরুদ্ধে, তাদের সস্তা ও বেগার শ্রমিক হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতেন, সংগঠিত করতেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন করতেন। প্রিভেনশন অফ ট্রাইবাল ল্যান্ড এলিয়েনেশন আইনের প্রয়োগের দাবি জানিয়েছিলেন। দাবি জানিয়েছিলেন তিন হাজার নির্দোষ আদিবাসী যুবককে বিনা বিচারে বা মিথ্যা মামলায় জেল বন্দি থেকে মুক্তি দিতে। বারবার আদালতেও গেছেন। ফলত তিনি ক্ষমতাসীন শক্তি ও তাদের নীল নক্সার কাছে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন। তাই পার্কিনসনের রোগী বৃদ্ধ অশক্ত শান্তিকামী পরোপকারী এই নিরস্ত্র পাদ্রীকে রাঁচির নিকটবর্তী তাঁর কুটির বা বাগাইচা থেকে এন.আই.এ. হঠাৎ করে গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্রে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মাওবাদী সাজিয়ে এবং ভীমা কোরেগাঁও মামলায় যুক্ত করে (যেখানে তিনি জীবনেও যাননি)। ইউএপিএ ধারায় তালোজিয়া সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে। অভিযোগ অত্যাচার করে, খেতে না দিয়ে, চিকিৎসা না করে তাঁকে হত্যা করা হয়। অলক্ষ্যে অবহেলায় নিভে যায় এক মহাজীবনের জীবনদীপ।

লতা মঙ্গেশকর

(১৯২৯-২০২২)

আসমুদ্র হিমাচলে ভোরে যাঁর সুরেলা কণ্ঠে ঘুম ভাঙে আর যাঁর মায়াবী গানের ঘোরে রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েন সেই সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলেও তাঁর সঙ্গীতের অমরত্ব বহু আগেই ঘটে গেছে। এক বিরল প্রতিভা, অনন্য কণ্ঠ, কঠোর তপস্যা, সংযমী সুশৃঙ্খল দীর্ঘ জীবন, সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা, চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব, প্রবল পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং হার না মানা লড়াই মিলে সফলতা উৎকর্ষ ও সৃজনের এক মহাজাগতিক বিস্ফোরণ।

কত যে গেয়েছেন তার সঠিক হিসাব নেই। এক সময় গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ শীর্ষে ছিলেন যা পরে ভেঙে দেন তাঁরই সহোদরা কিন্নরকণ্ঠী বিস্ময় গায়িকা আশা ভোঁসলে। ৩৬টি ভাষায় গান গেয়েছেন। বাংলা গানের সংখ্যাই প্রায় ২০০। তাঁর কণ্ঠে গাওয়া বেশীরভাগ গান হিট। প্রচুর গান সুপারহিট। প্রায় পাঁচ দশক ধরে বলিউডের ফিল্মগুলি যে জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে তার অন্যতম কারণ ছিল লতাজির গান। বিমল রায়ের 'মধুমতী', কে আসিফের 'মুঘল ই আজম', দেব আনন্দের 'গাইড'... কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব? একেকটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কিংবা ১৯৬৩তে কবি প্রদীপের লেখা সি. রামচন্দ্রের সুর করা 'অ্যায় মেরে বতন কে লোগো' বিখ্যাত গানটি যা চীন-ভারত যুদ্ধের আবহে জাতীয়তাবাদের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। শাহির লুধিয়ানভি, মজরুহ্

সুলতানপুরি, শৈলেন্দ্র, রাজেন্দ্র কৃষ্ণণ, শাকিল বদায়ুনি, হসরত জয়পুরি, রাজা মেহেদি, কাইফি আজমি, গুলজার... সব দিকপাল গীতিকারদের রচনা লতাজির কণ্ঠে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। অনিল বিশ্বাস, শঙ্কর-জয়কিষেণ, শচীন দেব বর্মন, নৌসাদ, শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জয়দেব, সলিল চৌধুরী, গুলাম মহম্মদ, কল্যাণজী-আনন্দজী, রাহুল দেব বর্মন, ও পি নায়ার প্রমুখ নামী সুরকারদের সুর লতাজির নিজস্ব সুর মাধুর্যে ভুবন জয় করেছে। মধুবালা, বৈজয়ন্তী মালা, মালা সিনহা, মীনাকুমারী, ওয়াহিদা রহমান, সাধনা, শর্মিলা ঠাকুর, হেমা মালিনী, রেখা, মমতাজ, শোভনা, তনুজা, নূতন, শ্রীদেবী, ডিম্পল কাপাডিয়া প্রমুখ তিন প্রজন্মের বলিউড নায়িকাদের লিপে লতাজির গান কোটি কোটি মানুষকে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। হেমন্ত কুমার, কিশোর কুমার, এবং ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে লতাজীর ডুয়েট এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

এই শীর্ষ সাফল্যে পৌঁছতে তাঁকে অনেক চড়াই উতরাই অতিক্রম করতে হয়েছে। গোয়ার মাঙ্গেশী গ্রামের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষক ও নাট্য ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত দীননাথ মঙ্গেশকারের এই জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গীত ও অভিনয়ে হাতে খড়ি তাঁর কাছেই। সেইসময় রেডিওতে শুনে কুন্দনলাল সায়গলের ভক্ত হয়ে যাওয়া লতাজীর জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে মাত্র ১৩ বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে। বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তখন থেকেই তাঁর কাঁধে। পিতৃবন্ধু বিনায়ক দামোদরের নবযুগ চিত্রপট কোম্পানিতে মারাঠি ও হিন্দি ছবিতে গান গেয়ে অভিনয় করে সামান্য সুরাহা হল। ১৯৪৫-এ সংস্থাটি বম্বেতে চলে আসায় ১৬ বছর বয়সেই লতাজিকে বম্বে চলে আসতে হয়। ১৯৪৮-এ দ্বিতীয়বার দুর্যোগ বিনায়ক মাষ্টারের মৃত্যুতে। এরপর তাঁর সহায় হয়ে দাঁড়ান সঙ্গীত পরিচালক গুলাম হায়দার। ১৯৪৮-এ তাঁরই সুরে 'মজবুর' ছবিতে গান গেয়ে লতাজীর বলিউডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। ইতিমধ্যে ১৯৪২-এ মারাঠি ছবি 'কিটি হাসাল', ১৯৪৩-এ হিন্দি ছবি 'গাজাভাই'এ এবং আরও কিছু ফিল্মে লতাজির ২৫ টাকা সাম্মানিকের প্লেব্যাক গাওয়া ও ছোটখাটো অভিনয়ের কাজ চলেছে। 'মজবুরে' সাফল্য পেলেও তখনও তাঁর চিকন কলা ও অশুদ্ধ হিন্দি উচ্চারণের জন্য বলিউডের উচ্চমহলে ব্রাত্য ছিলেন। কঠোর জীবন সংগ্রাম ও বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের পাশাপাশি তিনি উর্দু শিক্ষক রেখে উর্দু শিখলেন এবং ওস্তাদ আমানত আলি খাঁন ও পণ্ডিত তুলসীদাস শর্মার কাছে নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখলেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন দীর্ঘ রেওয়াজ। তাঁর গায়কীতে প্রথম দিকে পাকিস্তানের সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রভাব ছিল। এবার নিজস্ব গায়কী রপ্ত করলেন। সুরকার অনিল বিশ্বাস, বসন্ত দেশাইরা তাঁকে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৯-এ 'মহল' সিনেমার 'আয়েগা আনেওয়ালা' গানটি সর্বভারতীয় পরিচিতি দিল। বাকিটা ইতিহাস।

লতাজি কিছু ছবিতে সুরকারের ও সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করেছেন। কিছু ছবি প্রযোজনা করেছেন। নিজস্ব সংস্থা গড়ে ভজন লোকসঙ্গীত গেয়েছেন। গেয়েছেন অসংখ্য কনসার্টে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম ভারতীয় গায়ক হিসাবে লন্ডনের রয়াল অ্যালবার্ট হলে। ক্রীড়ামোদী ছিলেন। ক্রিকেটারদের সাহায্য করেছেন। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সাহায্য করেছেন। পেয়েছেন 'ভারতরত্ন' যা এম. এস. শুভলক্ষ্মী ছাড়া আর কোন ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী পাননি। এছাড়াও 'দাদাসাহেব ফালকে', তিনবার জাতীয় পুরস্কার, 'লেজিয়ঁ দ'নর' সহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। রাজ্যসভার সম্মানিত সাংসদ মনোনীত হয়েছেন। সব মিলিয়ে তিনি নিজেই একটি ধারা, একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তাই তাঁর মৃত্যুতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টি হল। সঙ্গীতপিপাসুদের হাহাকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন এই অকৃতদার অসাধারণ সঙ্গীতসাধিকা তারই গাওয়া করুণ সুরে 'সো যা রাজকুমারী, সো যা—' পাশাপাশি অক্ষয় রইল তাঁর অগুন্তি কালজয়ী সঙ্গীত।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(১৯৩১-২০২২)

বাংলা আধুনিক গানের নক্ষত্র পতন। ''গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু'', ''আকাশের অস্তরাগে'', ''জানিনা ফুরবে কবে এই পথ'', ''ও বক বক বকম বকম পায়রা, '' ''তীর বেঁধা পাখি আর''... তিন প্রজন্মের বাঙালি ভোর থেকে রাত অবধি রেডিও বা গ্রামোফোনে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা কণ্ঠে রাগপ্রধান আধুনিক গানের ঝঙ্কার শুনতে শুনতে বড় হয়েছে। ঢাকুরিয়ার মধ্যবিত্ত পরিবারে গান বাজনার চল ছিল। বাবা-মায়ের কাছে গানের হাতেখড়ি। অল্প বয়সে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা দেখে তাকে সঙ্গীতাচার্য যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে মার্গসঙ্গীতের তালিমের জন্য পাঠানো হয়। এরপর একে একে সন্তোষ কুমার বসু, এটি কানন, চিন্ময় লাহিড়ি। তারপর জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সাহায্যে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁন ও ওস্তাদ মুনাবর আলি খাঁনের কাছে নাড়া বেঁধে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা। এরপর তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ার ধরে নিষ্ঠাভাবে সঙ্গীত সাধনা। মাত্র ১৪ বছর বয়সে বাংলা গান রেকর্ড, ১৭ বছর বয়স থেকে চলচ্চিত্রে প্লে ব্যাক। সেই সময়েই বম্বে থেকে শচীন কর্তার ডাক। কিন্তু গিয়ে উঠতে পারেন নি। গেলেন দু'বছর বাদে। সেখানে থাকলেন মাত্র দু'বছর। তার মধ্যেই ১৭টি চলচ্চিত্রে গান গেয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। কলকাতায় ফিরে ছায়াছবির গান, পুজোর গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কীর্তন, ভজন সব ধরনের গান গেয়েছেন প্রায় পাঁচ দশক। তার মধ্যে চলচ্চিত্রে উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ডুয়েট সুপারহিট। ''তুহু মম মনপ্রাণ হে'', ''এ গানের প্রজাপতি'', ''কেনো এ হৃদয় চঞ্চল হল'', 'এ শুধু গানের দিন'', ''আমি যে

জলসা ঘরে”... কোন জনপ্রিয় গানটি ছেড়ে কোনটির কথা বলা যায়?

জয়জয়ন্তী ও নিশিপদ্ম ছবিতে গানের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পথে নেমেছিলেন। সমর দাসের সঙ্গে ‘স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র’ গড়ে তুলেছিলেন। বাংলা সঙ্গীত আকাদেমির দায়িত্বে ছিলেন। সহশিল্পী ও নবীন শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন, পাশে দাঁড়াতেন। খুব হাসিখুশি মিশুকে ভালো মানুষ ছিলেন। কবি ও সঙ্গীতকার শ্যামল গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের এক কন্যা রয়েছে। তাঁর প্রয়াণে একটি যুগের অবসান হল। ‘‘ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা’’, ‘‘মধু মালতী ডাকে আয়’’, ‘‘এই পথ যদি না শেষ হয়,’’ ‘‘আমাদের ছুটি ছুটি’’, ‘‘চন্দন পালঙ্কে শুয়ে এক একা’’... এই মন কাড়া গানগুলি আর তাঁর কণ্ঠে শোনা যাবে না।

কমলা ভাসিন

(১৯৪৬-২০২১)

ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও নেত্রী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও কবি। নারীবাদী তত্ত্বকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমন্বয় করেছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে যেমন সবর ছিলেন তেমনই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দেহকে লক্ষ্যবস্তু করার বিরুদ্ধেও সরব ছিলেন। অবিভক্ত ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাবে জন্ম। দেশভাগের পর রাজস্থানে বেড়ে ওঠা। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করার পর জার্মানিতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। রাজস্থানে থাকাকালীনই ‘সেবা মন্দির’ সংস্থার মাধ্যমে সমাজসেবায় হাতে খড়ি এবং সমাজকর্মী চিকিৎসক স্বামীর সঙ্গে আলাপ। পরে হিমাচলের ‘জাগোরি’, রাজস্থানের ‘School for Democracy’ সহ দেশ বিদেশের বহু মহিলা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণকর্ত্রী। তিনি ‘One Billion Rising’ সংগঠনের দক্ষিণ এশিয়ার কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। ‘কৌন মে লড়কি হু, মুঝে পাধনা হ্যায়’ তাঁর এই কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে ছিল। পাকিস্তানের নারী আন্দোলন থেকে উঠে আসা ‘আজাদি’ শ্লোগানটি তিনি লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারত ও নেপালে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন যা পরে শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, ছাত্র ও নাগরিক আন্দোলনকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘ফাও’ এর চাকরি ছেড়ে তিনি গ্রামীন ও জনজাতি সমাজের পশ্চাদপর মহিলাদের নিয়ে তৈরি করলেন ‘সংঘাত’। প্রতিবেশী বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রেও কাজ করেছেন। তাঁর অন্যতম গ্রন্থ : ‘Borders and Boundaries’, ‘Women in Indian Partition’, ‘Laughing Matters’, ‘Feminism & its relevance in South Asia.’

গেল ওমবেত

(১৯৪১-২০২১)

পশ্চিম ভারতে এবং জাতীয় স্তরে গভীর শূন্যতা রেখে চলে গেলেন বেদ-ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী দলিত ও নারী মুক্তি আন্দোলনের সংগঠক ও তাত্ত্বিক, বিশিষ্ট আম্বেদকর বিশেষজ্ঞ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী লেখিকা গেল ওমবেত। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটার মিনিয়াপলিসে। উচ্চ শিক্ষা কার্লটন কলেজ ও বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা ও অনুশীলনের কারণে ১৯৬৩ থেকে ভারতে যাতায়াত শুরু। পরে ভারতকে ভালোবেসে নিজভূমি করে নেওয়া। থাকতেন মহারাষ্ট্রের কাসেগাঁওএ স্বামী বামপন্থী শ্রমিক নেতা ভরত পতঙ্কর, শ্বশ্রূমাতা বিশিষ্ট সমাজকর্মী ইন্দুমতি পতঙ্করদের বৃহৎ পরিবারের সাথে। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। সক্রিয়ভাবে মহারাষ্ট্রের সাতারা ও সাংলি জেলায় পল্লী গঠন, সামাজিক সংস্থান ও কৃষক আন্দোলনের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। ছিলেন মুক্তি দল, স্ত্রী মুক্তি সংঘর্ষ চহ্বল, শেতকারী মহিলা আগাদি প্রভৃতির সংগঠক। মহিলাদের কৃষি জমির অধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। মহামান্যা সাবিত্রীবাই জ্যোতিরাও ফুলের আদর্শকে তুলে ধরেছেন। অসংখ্য প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ লিখে গেছেন, পেয়েছেন অনেক পুরস্কার।

তরুণ মজুমদার

(১৯৩১-২০২২)

একই সাথে ভালো ছবি আর জনপ্রিয় ছবি করা খুবই কঠিন। সেটিই ধারাবাহিকভাবে করে গেছেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। তাঁর লক্ষ্য ছিল তাঁর ছবি দেখে সকলেই যেন আরেকটু ভালো মানুষ হয়ে ওঠেন। এই মিষ্ট ও স্বল্পভাষী, আদ্যান্ত বাঙালী ও ভদ্রলোক, চিন্তন-অনুশীলনে আর্দশ বামপন্থী, পাশাপাশি বাণিজ্য সফল চলচ্চিত্র পরিচালক তাঁর প্রতিটি ফিল্মে সুন্দর সহজবোধ্য গল্পের বুনোটের মধ্যেও আদর্শবাদ, মানবতাবাদ, সততা, মূল্যবোধ এবং সাধারণের কথা তুলে ধরেছেন। জন্ম অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলার বগুড়া জেলায় এক স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারে। বাবা-কাকারা ব্রিটিশ জেলে ছিলেন। জ্যাঠামশাইকে ব্রিটিশ পুলিশ ফরিদপুর জেলে হত্যা করে। দেশভাগের পর এপার বাংলায় চলে আসা। কলকাতার ‘সেন্ট পলস্’ ও ‘স্কটিশচার্চ’ কলেজে শিক্ষা। প্রথমে কাননদেবীর ‘শ্রীমতী পিকচার্সে’ যোগ দেন। পরে শচীন ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সাথে যৌথভাবে ‘যান্ত্রিক’ ব্যানারে কাজ করতে থাকেন। এরপর নিজেই চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর পরিচালিত

চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'একটুকু বাসা', 'বালিকা বধূ', 'নিমন্ত্রণ', 'কুহেলি', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'ঠগিনী', 'সংসার সীমান্তে', 'ফুলেশ্বরী', 'গণদেবতা', 'দাদার কীর্তি', 'মেঘমুক্তি', 'চাওয়াপাওয়া', 'কাঁচের স্বর্গ', 'পলাতক', 'ভালোবাসা ভালোবাসা', 'আলো', 'আলোর পিপাসা' প্রভৃতি। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন। জাতীয় পুরস্কার, পদ্মশ্রী সহ অনেক সম্মান পেয়েছেন। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী বিশিষ্ট অভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়।

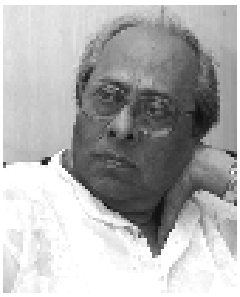

হাসান আজিজুল হক

(১৯৩৭-২০২১)

বাংলা সাহিত্যের অগ্রজ কথাকার। লিখেছেন কম, কিন্তু যা লিখেছেন তা জীবন ঘষে আগুন। বাল্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, দেশভাগ ও দাঙ্গায় তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটে বর্ধমানের কাটোয়ার যবগ্রাম থেকে সপরিবারে চলে যেতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে। দেশভাগের অসারতা ও বিপুল ক্ষতি অপর প্রকৃত বাঙালীদের মত তিনি কখনও মেনে নিতে পারেননি। তাই আমৃত্যু সেই প্রশ্ন তুলে গেছেন। কাঁটাতারের বেড়ার কঠিন নিয়মাকানুন অতিক্রম করে বারবার এসেছেন তাঁর পিতৃপুরুষের ভিটেয়, বাল্যবন্ধু প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে। আর রাঢ়বঙ্গের এক গ্রাম্য গৃহবধূর বয়ানে লিখেছেন অসামান্য উপন্যাস 'আগুনপাখি'। খুলনা ও রাজশাহীতে পড়াশোনা করেছেন। ভাষা আন্দোলনে এবং পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম স্বর ছিলেন। তাই দেশ তাঁকে 'একুশে পদক' এবং সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'স্বাধীনতা' পুরস্কার প্রদান করে। তিনি আনন্দ পুরস্কারও পেয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার'টিও অলঙ্কৃত করেছেন।

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'আমৃত্যু আজীবন', 'জীবন ঘষে আগুন', 'পাতালে হাসপাতালে', 'আমরা অপেক্ষা করছি', 'বিধবাদের কথা', 'শকুন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'অপ্রকাশের ভার', 'মা মেয়ের সংসার', 'ফিরে যাই ফিরে আসি', 'উকি দিয়ে দিগন্ত' প্রভৃতি তাঁর বলিষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী। তিনি একদিকে যেমন উপমহাদেশে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন, তেমনি চারপাশের সাধারণ মানুষজনের জীবনসংগ্রামের কথা বলেছেন। দার্শনিক গোবিন্দ্রচন্দ্র দেবের 'তত্ত্ববিদ্যা-সার' গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ, 'সক্রেটিস' অণুগ্রন্থ এবং 'কাণ্ডজ্ঞানের দর্শন: আরজ আলি মাতব্বর' প্রবন্ধ দর্শনশাস্ত্রে তাঁর লিখিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসাধারণ কাজ। পাশ্চাত্যের সক্রেটিসের প্রাচ্যের আরজ আলির যুক্তিবাদী দর্শন তিনি সহজ ভাষায় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই কথা শিল্পীর গল্প ও উপন্যাসগুলো বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে।

শাঁওলী মিত্র

(১৯৪৮-২০২২)

নাট্য, অভিনয় ও বাচিক শিল্প জগতের অনন্য প্রতিভাবান শিল্পী শম্ভু মিত্র এবং কিংবদন্তী অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র (ভাদুড়ি)র উপযুক্ত মেধাবী দুহিতা। গণনাট্য ও নব নাট্যের পরিবেশে জন্ম ও বিকশিত হওয়া এবং পরবর্তিতে পারফর্মিং আর্টের এই অনবদ্য ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলা। বাল্যে পারিবারিক বহুরূপী নাট্য দলের অভিনীত রবীন্দ্রনাটকে 'ডাকঘর'-এ অমল চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করে দর্শকদের চমৎকৃত করা। এরপর সীমিত হলেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মর্মগ্রাহী নিপুণ ও বলিষ্ঠ অভিনয় দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন 'পাগলা ঘোড়া', 'রাজা', 'হযবরল', 'পাখি', 'পুতুল খেলা', 'চণ্ডালি', 'লঙ্কাদহন', 'আরো একবার' নাটকে। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো আর গল্পো' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। কলকাতার কয়েকটি নাট্যদলের রেপার্টরি থিয়েটারের প্রযোজনা কালজয়ী নাটক 'গ্যালিলেওর জীবন' নাটকে গ্যালিলেওর কন্যা ভার্জিনিয়ার চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয় স্মরণীয়। পরে নিজে পঞ্চম বৈদিক নাট্যদল তৈরি করে এ যুগের এক মাইলফলক নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ'-এ তাঁর একক অবিস্মরণীয় অভিনয়। সংলাপ, অভিনয়, উচ্চারণ, স্বর প্রয়োগ, শারীরিক বিভঙ্গ, মুদ্রা, মঞ্চ সঞ্চালন এবং বক্তব্যে শাঁওলীর সৃজন প্রতিভার চরম প্রকাশ। এরপর মাত্র কয়েকটি অভিনয় ও নির্দেশনা 'কথা অমৃত সমান', 'বিতত বিতংস', 'একটি রাজনৈতিক হত্যা'। উষা গাঙ্গুলী শাঁওলীকে দিয়ে করান 'সীতাকথা'। সেই সময়েই সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলনে রাষ্ট্রের দমনপীড়নের প্রতিবাদে নাগরিক সমাজের সঙ্গে পথে নামেন এই স্বল্পবাক সংযমী অথচ অসম্ভব প্রতিভাময়ী বলিষ্ঠ অভিনেত্রী। রাজনৈতিক পালাবদলের পর্বে ভারতীয় রেলের শিল্প উপদেষ্টা এবং পালাবদলের পর বাংলা আকাদেমির সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন। রচনা করেন 'Five Lords, Yet None a Protector & Words Sweets Timeless' এবং 'গণনাট্য, নবনাট্য, সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র' দুটি গ্রন্থ। পেয়েছেন সাহিত্য নাটক আকাদেমি, পদ্মশ্রী ও বঙ্গভূষণ সম্মান। অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুকেও চয়ন করে নিলেন, পিতার পথে অন্তরালে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন। রেখে গেলেন একটি শক্তিশালী সৃজনশীল নাট্যধারার অমূল্য সব স্মৃতি।

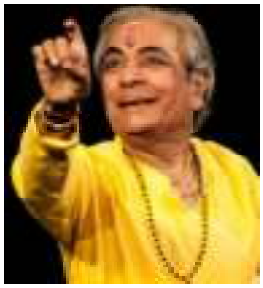

বিরজু মহারাজ

(১৯৩৭-২০২২)

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী। আসল নাম ব্রিজমোহননাথ মিশ্র। একদা লক্ষ্ণৌ এর নবাবী দরবারের আটপুরুষ ধরে কত্থক নৃত্যের

কালকা-বিনন্দিন ঘরানার ধারক বাহক মিশ্র পরিবারে জন্ম। পিতা ও মাতা বিশিষ্ট কত্থক শিল্পী আচ্চান ও মাতাজী মহারাজ। শৈশব থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যের তাল, লয়, ছন্দ, নান্দনিক বিভঙ্গ, মুদ্রা, ঘুঙুর-তবলা- হারমোনিয়ামের সুরে বড় হয়ে ওঠা। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃব্য শম্ভু ও লাচ্ছু মহারাজের কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে নিজেই কত্থকের শিক্ষক হয়ে ওঠেন। কত্থক নৃত্য ছাড়াও হিন্দুস্তানি ধ্রুপদী সঙ্গীতে দক্ষতা ছিল, ভালো ঠুমরি গাইতেন। ভালো তবলা ও ঢোলক বাজাতেন। নিউ দিল্লিতে সঙ্গীত নাটক একাডেমি থেকে অবসরের পর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কলাশ্রম তৈরি করেন। বহু চলচ্চিত্রে কোরিওগ্রাফি ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যজিৎ রায় নির্দেশিত 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', মাধুরি দীক্ষিত অভিনীত 'দেবদাস' ও 'দিল তো পাগল হ্যায়', দীপিকা পাড়ুকোন ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়া অভিনীত 'বাজিরাও মাস্তানি', আলিয়া ভট্ট অভিনীত 'কলঙ্ক।' তাঁর নৃত্য আখ্যানের মধ্যে 'মাখনচোর', 'ফাগবাহার', 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান', নৃত্যনাট্যের মধ্যে 'কৃষ্ণায়ন', 'কথা রঘুনাথ কি', 'শাহ মেহফিল' খ্যাতনামা। তিনি পদ্মবিভূষণ সহ অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

বুদ্ধদেব গুহ

(১৯৩৬-২০২১)

জীবনের প্রথম দিকটা পূর্ব বাংলার রংপুর, জয়পুর হাট, বরিশাল প্রভৃতি জায়গায় কাটানোর অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তাঁর ঋভু গল্পগুলোতে। আর পরবর্তী জীবনে হাজারীবাগ, পালামৌ প্রভৃতি মূলত পূর্ব ভারতের জঙ্গলগুলো ঘোরার অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তার ঋজুদা-রুদ্রর শিকার কাহিনীগুলোতে। প্রকৃতি প্রেমিক লেখক স্মরণীয় তাঁর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীগুলোর জন্যও। পেশায় ছিলেন চাটার্ড অ্যাকাউট্যান্ট। দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার পাশাপাশি হিন্দুস্তানি ধ্রুপদী সঙ্গীত ও টপ্পা গান শিখেছিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চণ্ডীদাস মালের কাছে। ভাল ছবিও আঁকতেন। তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঋতু গুহ আগেই গত হয়েছেন। অসংখ্য জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হলুদ বসন্ত', 'খেলা যখন', 'কোয়েলের কাছে', 'মাধুকরী', 'অবরোহী', 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে', 'বাতিঘর', 'বনবাসর', 'চাপরাশ', 'রাগমালা', 'একটু উষ্ণতার জন্য', 'কোজাগর', 'নগ্ন নির্জন, 'প্রথম প্রবাস', 'বনবিবির বনে' প্রমুখ। তিনি আনন্দ পুরস্কার পান।

গার্ড মূলার

(১৯৪০-২০২১)

জার্মানি ও বায়ার্ন মিউনিখের কিংবদন্তী স্ট্রাইকার, বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার, বিপক্ষের বক্সের ত্রাস, 'বম্বার ডের নেশন'। কমপ্লিট ফুটবলার তো ছিলেনই। বিশেষ পারদর্শী ছিলেন দ্রুত সঠিক জায়গা নেওয়া, ফাইনাল ড্রিবলিং, শ্যুটিং ও হেডিংএ। অসাধারণ দক্ষতা ছিল গোল চেনা ও করার। নিঃশব্দে বক্সে উঠে গোল করে চলে যেতেন। আগ্রাসী গোলদাতা হলেও দুর্দান্ত মানুষ ছিলেন। জার্মানির হয়ে ৬২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল দিয়েছেন ৬৮টি। তারমধ্যে রয়েছে ১৯৭৪-এ বিশ্বকাশ ফাইনালে নেদারল্যাণ্ডসের বিরুদ্ধে গোল। ১৯৭২-এ ইউরো চাম্পিয়ান হয় পশ্চিম জার্মানি। ফাইনালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ৩-০ হারানোর ক্ষেত্রে দুটো গোলই তাঁর। বার্য়ান মিউনিখের হয়ে ১৯৬৪ থেকে ১৯৭৮ অবধি টানা ১৫ বছর খেলেছেন তিনি। শূন্যে ও মাটিতে বল দখলে ছিলেন অদ্বিতীয়। ৬০৫টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে ৫৬৩টি গোল। বুন্দেশলিগায় ৪২৭টি ম্যাচে ৩২৫ গোল। দু'বার জার্মানির বর্ষসেরা ফুটবলার। তাঁর সময়ে বায়ার্ন ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৪ টানা ছ'বার বুন্দেশলিগা জেতে। ১৯৭২-এ ইওরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ান। ১৯৭০-এ মেক্সিকো বিশ্বকাপে ১০ গোল করে সোনার বুট প্রাপ্তি। দুটো বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৩টি গোল। সাতবার বুন্দেশলিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে (১৯৭১-১৯৭২) ৮৫ গোল যার মধ্যে বুন্দেশলিগায় ৪০টি গোল। ১৯৬৯-'৭০ মরশুমে বুন্দেশলিগায় টানা ১৬ ম্যাচে গোল দিয়েছিলেন। ১৯৭৯-'৮১ যুক্তরাষ্ট্রের লডারডেল স্ট্রাইকার্সে খেলে ৮০ ম্যাচে ৪৫টি গোল। ১৯৭০ ও '৭২ দু'বার ইওরোপীয়ান গোল্ডেন শু। ১৯৭০ ব্যলঁ দ্য রিজিয়ন। চারবার জার্মান ডিএফবি কাপ (১৯৬৬, '৬৭, '৬৯, ও '৭১)। তিনবার ইউরোপীয়ান কাপ (১৯৭৪, '৭৫, '৭৬)। একবার উয়েফা উইনার্স কাপ (১৯৬৭), একবার ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ (১৯৭৬)। ২০০৫-এ জার্মান যুব দল নিয়ে কলকাতার আইএফএ শিল্ডে এবং ২০০৯-এ বায়ার্ন মিউনিখ অনুর্ধ্ব-২৩ দল নিয়ে ভারতে এসেছিলেন। একটি সোনালি যুগের অবসান হল।

সুভাষ ভৌমিক

(১৯৫০-২০২২)

আন্তর্জাতিক মানের ভারতীয় ফরোয়ার্ড। বড় ম্যাচ ও কাদা মাঠের রাজা। ময়দানে এমন ডাকাবুকো ও দাপুটে খেলোয়াড় কমই দেখা গেছে। দুরন্ত গতি, সুগঠিত বলশালী দেহ, দুর্দান্ত দৈহিক ভারসাম্য, প্রবল আগ্রাসন, ড্রিবল বা কাট করে বিপক্ষের ডিফেন্সকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে যাওয়ার দক্ষতা, গোলার মত শট তাঁর সময়ে তাঁকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। ১৯৬৮-তে তখনকার পশ্চিম দিনাজপুর জেলা থেকে এসে মাত্র ১৮ বছর বয়সে কলকাতার রাজস্থান ক্লাবে খেলে সাড়া ফেলে দেন। পাটনার শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপে ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাব পাঞ্জাবের লিডার্স ক্লাবকে ৪-২ গোলে তছনছ করে দেন। ১৯৬৯, '৭৩-'৭৫ ও ১৯৭৯-এ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পাঁচ বছর খেলে ৮৩টি গোল ও ১২টি ট্রফি জয়। ১৯৭০-৭২, ৭৬-৭৮ মোহনবাগানের হয়ে ছয় বছর খেলে ৮৪টি গোল, ১৬টি ট্রফি জয়। বাংলার হয়ে সাত বার সন্তোষ ট্রফি খেলে চার বার জয়, '৭০-এ অধিনায়ক, ২৪ গোল। কলকাতা ডার্বিতে ছটা গোল। ভারতের হয়ে ২৪টি ম্যাচে নয় গোল যার মধ্যে ১৯৭১-র মারডেকা ট্রফিতে ফিলিপিন্সের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক। ১৯৭০এর ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ জয়ী, ১৯৭১-এ সিঙ্গাপুরে পেস্তা সুকান কাপে যুগ্মবিজয়ী জাতীয় দলের সদস্য। ১৯৭১-এ জাতীয় দলের সাথে রাশিয়া সফরে যান। ১৯৭৩-এ আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটিকে ৩-১-এ হারানো, ওই বছর ডিসিএম ট্রফির ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার ডক রোগ্যাংকে হারানো, ১৯৭৫-এ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারানো, ১৯৭১-এ রোভার্স কাপ ফাইনালে ভাস্কোকে হারানো, ১৯৭৭-এ ডুরান্ড ফাইনালে জেসিটিকে হারানো প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি অবিস্মরণীয় ম্যাচ। খেলোয়াড় জীবনে বেশ কয়েকবার মেজাজ হারিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন। ১৯৭৯-তেই দ্রুত অবসর নিয়ে নেন।

কোচ হিসাবেও সমান সফল ও বিতর্কিত। ১৯৮৯ সালে ঢাকার প্রেসিডেন্টস কাপে জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান, সালগাঁওকার ও চার্চিল ব্রাদার্সকে কোচিং করিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ১২টি, চার্চিলের হয়ে দুটি ও মোহনবাগানের হয়ে একটি ট্রফি জয়। এর মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে দু'বার ও চার্চিলকে একবার জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ান করেন। বিদেশের মাটিতে জাকার্তায় ২০০৩-এ ইস্টবেঙ্গল আসিয়ান কাপ ও ২০০৪-এ কাঠমাণ্ডুতে সান মিগুয়েল কাপ জয় কোচ হিসাবে তাঁর অনন্য কৃতিত্ব। সফল ফুটবলার ও কোচ পি কে ব্যানার্জির সেরা অস্ত্র পঞ্চপান্ডবের (সুভাষ ভৌমিক, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, মহম্মদ হাবিব ও শ্যাম থাপা) অন্যতম ছিলেন। মাঠের বাইরেও ছিলেন বর্ণময়। কিডনির অসুখে ভুগছিলেন। কোভিডেও আক্রান্ত হন। কিছুটা অগোচরে চলে গেলেন।

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

(১৯৫১-২০২২)

দু'পায়ের সূক্ষ্ম কাজ, দু'ধরনের ড্রিবল, উইথ দ্য বল ও উইদাউট দ্য বল দুরন্ত গতি, নিখুঁত পাশ, ঘন ঘন জায়গা বদল, দুর্দান্ত সব গোল এবং বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল দিয়ে বিপক্ষের কটূক্তি, গা জোয়ারি ও কড়া ট্যাকেলের মধ্যেও যে শান্ত, ভদ্র, শিল্পী উইঙ্গার '৭০ দশকের শুরু থেকে ভারতীয় ফুটবলে অপ্রতিরোধ্য ছিলেন তিনি সুরজিৎ সেনগুপ্ত। পাশাপাশি বড় মাপের মানুষ, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, ক্রীড়া পত্রিকার সম্পাদক। হুগলির চুঁচুড়ার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা। সুরজিতের প্রথম কোচ ব্যান্ডেলের ভোলাদা বা অশ্বিনী বরাট, পরে কলকাতা মাঠে অচ্যুৎ ও প্রদীপ

বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে হুগলি ক্লাব, তারপর এক বছর রবার্ট হাডসন ও দু'বছর খিদিরপুর ক্লাব হয়ে ১৯৭২-'৭৩ এবং ১৯৮১-'৮৩ মোহনবাগান, ১৯৭৪-'৭৯ ইস্টবেঙ্গল ও ১৯৮০তে মহামেডান স্পোর্টিং দলের হয়ে খেলা। মোহনবাগানের হয়ে ৫৪ ও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৯২ গোল ছাড়াও অসংখ্য গোলের ঠিকানা লেখা পাশ। ১৯৭৮-এ ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন।

১৯৭৫ এর শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৫-০ জয়ে প্রথম গোল তাঁর এবং অন্য দুটো গোলের কারিগরও তিনি। সেরকম ১৯৭৮-এ ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের প্রথম গোল সহ মূল কারিগর তিনি। ঝুলিতে ছ'বার করে কলকাতা লিগ ও আইএফএ শিল্ড, তিনবার ডুরান্ড ট্রফি। সন্তোষ ট্রফিতেও দুর্দান্ত পারফর্মেন্স সহ ২৬টি গোল। ১৯৭৬-এ অধিনায়ক ছিলেন। তার মধ্যে ১৯৭৭-এ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ফাইনালে ৩-১ জয়ের তৃতীয় গোল গোলকিপারের কাছে গিয়ে বল নিয়ে মাত্র চারটি পাশ খেলে অবিশ্বাস্য গোল। অবিশ্বাস্য শূন্য ডিগ্রি থেকে করা গোল কলকাতা লিগে কয়েকটা করার পর ১৯৭৯-এ দক্ষিণ কোরিয়া জাতীয় দলের বিরুদ্ধে। ১৯৭৪-এ তেহেরান ও ১৯৭৮-এ ব্যাঙ্ককের এশিয়ান গেমসে, ১৯৭৭-এ প্রেসিডেন্টস কাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। কুয়েতের বিরুদ্ধে তাঁর হীরকদ্যুতি গোল। মারডেকায় তাঁর গতিময় খেলার জন্য নামকরণ হয়ে যায় সমকালীন

দ্রুতগতির ইতালিয় গাড়ি 'আলফা রোমিও'র নামে। ১৯৭৭ ও '৭৮-এ বিদেশী দল পাখতাকো ও আরারাতের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ফুটবল। '৭৮-এ বরদলৈ ফাইনালে তাইল্যাণ্ডের পোর্ট অথরিটির কাছে হারতে বসা ম্যাচে একা দু'গোল দিয়ে জিতিয়ে দেওয়া। তাইতো জার্মানির বুন্দেশলিগায় এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বাহরিন স্পোর্টস ক্লাবে খেলার ডাক পেয়েছিলেন। উদাসীনতায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লাব ফুটবলে কোচ না হলেও খুদে ফুটবলারদের গড়ে তোলার ভূমিকায় যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় ফুটবলের এই অন্যতম সেরা উইঙ্গারের আরও অনেককিছু দেওয়ার আগেই খেলা ছেড়েছিলেন, চলেও গেলেন অসময়ে। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে।

শিবকুমার শর্মা

(১৯৩৮-২০২২)

জম্মু কাশ্মীরের সুরেলা বাদ্যযন্ত্র সন্তুরকে তিনি পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন এবং অসংখ্য অনুষ্ঠানে, অ্যালবামে এবং সিনেমার আবহসঙ্গীতে তাঁর প্রতিভার এবং মনমুগ্ধকর বাদনের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভুবনখ্যাত বংশীবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া ও বিশিষ্ট গিটারিষ্ট ব্রিজভূষণ কাবরাকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬৭তে প্রকাশিত তাঁদের 'কল অফ দ্য ভ্যালি' চিরকালীন সুপারহিট। কাশ্মীর উপত্যকার পাহাড়ি ধুন আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। 'সিলসিলা', 'লামহে', 'চাঁদনি', 'ফাসলে', 'ডর' প্রমুখ জনপ্রিয় সিনেমায় লতাজির কণ্ঠ এবং শিব-হরির বাদ্যের জাদু দর্শক ও শ্রোতাদের মাতিয়েছিল। এছাড়াও শিবকুমার শর্মা ভি. শান্তারামের 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' (১৯৫৫)-তে সুর দিয়েছেন এবং 'গাইড' সিনেমায় (১৯৬৫) আর. ডি. বর্মণের সুরে লতাজির গানে তবলা বাজিয়েছেন। জন্ম জম্মুতে। ছোটবেলা থেকেই পিতা বিশিষ্ট কণ্ঠ ও তবলা শিল্পী উমা দত্ত শর্মার কাছে তবলা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম। তার কাছ থেকেই কাশ্মীরের লোকবাদ্য সন্তুর, যা পারস্য থেকে এসেছিল, শেখা। ধীরে ধীরে তিনি হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সঙ্গীতের আঙিনায় এই অনন্য দর্শন কাশ্মীরি লোকবাদ্য যন্ত্র সন্তুর এবং সুফি ধারার কাশ্মীরি লোকসুরকে স্থায়ী আসনে বসান। তিনি সঙ্গীত নাটক আকাদেমি, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ সহ বহু পুরস্কার পান।

আবদুল গফফার চৌধুরি

(১৯৩৪-২০২২)

দুঃখের মধ্যেও কি অদ্ভুত সমাপতন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক এবং ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসের জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীত 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি.....' এর রচয়িতা চলে গেলেন। ১৯৫১-র ১৯ মে আসামের শিলচরে বাংলা ভাষার অধিকার আন্দোলনের আরেক শহীদ দিবসের দিনে। জন্ম অবিভক্ত বাংলার বরিশাল জেলায়। পিতা ছিলেন জমিদার, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯৪২-র ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেন। গফফার চৌধুরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে যোগ দেন এবং 'জয়বাংলা', 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় যুদ্ধ-সাংবাদিকতার নজির রাখেন। তাঁর ৩৫টি গ্রন্থ রয়েছে। বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, একুশে পদক, বঙ্গবন্ধু পদক, ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার প্রমুখ বহু পুরস্কারে ভূষিত। শেখ মুজিবরের হত্যার উপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'। শেখ মুজিবর হত্যা এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানপন্থী জিয়া সামরিক প্রশাসন ক্ষমতা দখল করলে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানেই থেকে যান। সেখান থেকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কাগজগুলির জন্য লিখতেন। লণ্ডনে 'নতুন দিন' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রিজবিহারী পাণ্ডে

(১৯৪৮-২০২১)

আমৃত্যু এক নিরলস বিপ্লবী যোদ্ধা। জন্ম উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুনে বর্তমান উত্তরাখণ্ডে। পিতা সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। বাল্যে কানপুরে চলে আসেন। সেখানেই শিক্ষা ও সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়া। বাল্যবন্ধু পরবর্তিতে বিপ্লবী নেতা বিনোদ মিশ্রের সঙ্গে ১৯৬৬-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর রিজিওনাল ইঞ্জিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের উত্তাপে তাঁরা গৌতম সেন, ধূর্জটি প্রসাদ বক্সী প্রমুখের সঙ্গে সহযোগী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং শ্রমিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হন। একপর কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে সর্বক্ষণের পার্টি কর্মী হিসাবে গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করতে চলে যান। রাষ্ট্রের ঘেরাও দমনের মধ্যে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন এবং পার্টি পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। হাসিখুশি অমায়িক এই বিপ্লবীর কবিতা-সাহিত্য থেকে কম্পিউটার সায়েন্স, কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞান ছিল। বহু ভাষা জানতেন। ইংরেজি লিবারেশন ও হিন্দি লোক যুদ্ধ পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং জনসংস্কৃতি মঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দিল্লি, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন। ছিলেন সিপিআইএমএল লিবারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সেন্ট্রাল কন্ট্রোল কমিশনের চেয়ারম্যান। রেখে গেছেন সহযোদ্ধা স্ত্রী বিভা গুপ্ত ও দুই কন্যাকে।

বিশেষ স্মরণিকা

নারায়ণী কড়চা

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়

২০১৭-র কলকাতা বইমেলার ইউবিআই অডিটোরিয়ামে দেবসাহিত্য কুটিরের উজ্জ্বল অলংকার শুকতারা নামক মাসিক পত্রিকার ৭০ বছর উপলক্ষ্যে একটি আসর বসেছিলো। মঞ্চ আলো করে উপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা। সেখানে ছিলেন নব্বই অতিক্রান্ত শিশু সাহিত্যিক ও শিল্পী শ্রীনারায়ণ দেবনাথ। তাঁকে সেদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিলো। সংবর্ধনার উত্তরে এই জীবন্ত কিংবদন্তী মানুষটি বললেন, যে তিনি শুধু কমিকস-এর স্রষ্টা বা অঙ্কন শিল্পীই নন তিনি একজন শিশু সাহিত্যিক। সাহিত্য না থাকলে এসব কমিকস্ বা ছবিতে গল্পের পরিধি অনেকটা ফিকে হয়ে যায়।

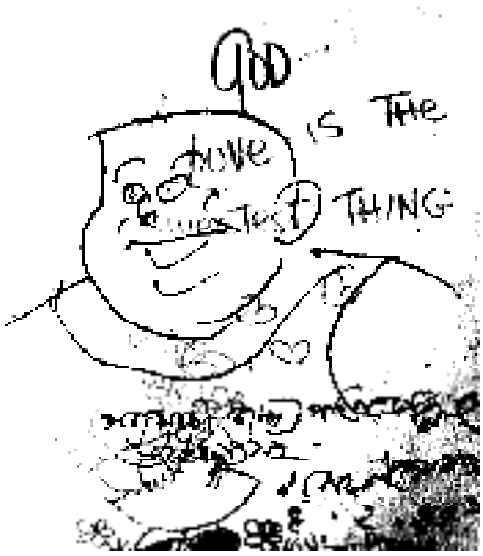

সঠিক বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় নারায়ণ দেবনাথ। ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে লেখা ও আঁকার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আপামর বাঙালির মধ্যে। তার মধ্যে সাহিত্যরস ছিল অনেকটাই। শুধুমাত্র কমিকসে মজার ছবি বা কিছু লেখার মধ্য দিয়ে মন জয় করা যায় না। একপাতা বা দু'পাতার মধ্য দিয়ে একটি মজার গল্পকে ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথ সেই কাজটিই করে গিয়েছেন বেশ কয়েক দশক ধরে। আর তাতেই মজে ছিলেন অন্তত তিনটি প্রজন্মের পাঠকপাঠিকা।

১৯২৫ সালের ২৫ নভেম্বর হাওড়ার শিবপুরে নারায়ণ দেবনাথের জন্ম। পারিবারিক পেশা স্বর্ণকার হলেও তিনি আর্ট কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। কিন্তু শেষ করেননি। পরবর্তীতে তিনি বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। সেসময় দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়ে চলেছে ছোটোদের এক স্বপ্নের পত্রিকা 'শুকতারা'। সেই পত্রিকাতে ১৯৫১-৫২ সালে বোলতা নামক ছদ্মনামে নারায়ণ দেবনাথ শুরু করলেন তাঁর ম্যাজিক। প্রথমে ভোঁদা তারপর হাঁদা এবং এরও পরে হাঁদা ও ভোঁদাকে একসঙ্গে নিয়ে শুরু হলো জয়যাত্রা। দেবসাহিত্য কুটিরের প্রুফ রিডার হরিপদ চক্রবর্তী শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের সঙ্গে দেবসাহিত্য কুটিরের কর্ণধার সুবোধচন্দ্র মজুমদারের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এরপরেই সেই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটল। শুকতারার ফাল্গুন সংখ্যা ১৩৫৮ (ইংরাজি ১৯৫১)-এ প্রথম প্রকাশিত হলো 'ভোঁদার ভোজবাজী'। পরের বছর দ্বিতীয় চরিত্র হাঁদাকে আনলেন বোলতা অর্থাৎ নারায়ণ দেবনাথ। শুরু হলো 'হাঁদার এক্সপেরিমেন্ট'। এরপরেই নারায়ণ দেবনাথের যাদু তুলিতে এলো চমক। সৃষ্টি হল যুগলের মজার গল্প হাঁদা ভোঁদার অ্যাডভেঞ্চারের প্রথম টি 'হাঁদা ভোঁদার ক্রিকেট খেলা'। তারপর ২০১৬ সাল পর্যন্ত যতদিন নারায়ণ দেবনাথের তুলি ও কলম সচল ছিলো একের পর এক কাহিনীর জাল বুনেছেন। প্রত্যেকটি কাহিনীই নতুন এবং নতুন নতুন আঙ্গিকে পরিপুষ্ট। যেমন গল্প তেমন আঁকা। প্রথমে রঙের বৈচিত্র্য ছিল একটু সাধারণ মানের। ধীরে ধীরে তা বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দু'পাতার পরিসরে হাঁদাভোঁদা এমন এমন কাণ্ড করতে শুরু করে যার তালে তালে দিতে থাকেন ৮ থেকে ৮০ বছর বয়সী পাঠকপাঠিকা।

নারায়ণ দেবনাথ সর্বদাই মনে করতেন যে বাঁটুল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একান্ত প্রিয় তাঁর। বাঁটুলকে নিয়ে নানাজনে নানারকম মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাঁটুল যেই হোক না কেন আজও সে সমান রঙিন এ কথা বলাই যায়। হাঁদাভোঁদার কমিকসের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। শুকতারার সম্পাদক চাইলেন আরও কিছু করতে। অগত্যা নারায়ণ দেবনাথ আবার রঙতুলি ধরলেন। শুকতারার ভাদ্র ১৩৭২ সংখ্যায় সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলো বাঁটুল। বলা বাহুল্য, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের মন কেড়ে নিলো। তার যেমন গায়ে শক্তি, তেমনই উদার হৃদয়। সাধারণ মানুষ যে কাজ করতে পারে না সে অনায়াসেই সেই কাজ করে দেয়। যেই বাঁটুল প্রকাশিত হলে শুকতারার ছোটো ছোটো পাঠকপাঠিকারা যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নারায়ণ দেবনাথ তখনও পর্যন্ত ছিলেন মূলত চিত্রশিল্পী

কিন্তু বাঁটুলকে নিয়ে লেখাগুলি প্রকাশের পর দেখা গেল তিনি একজন প্রথমসারির হাসির গল্প লিখিয়ে। অজস্র কৌতুককর চরিত্র, তাঁদের মুখের সংলাপ এবং নিটোল গল্পের ঠাসবুনোট বাঁটুলকে এক অন্য উচ্চতায় উত্তীর্ণ করলো। বাঁটুল কখনো একঘেঁয়ে হয় না। প্রত্যেকটি কাহিনী নতুনত্বের আস্বাদন দেয় আমাদের।

বাঁটুল সমগ্র

নারায়ণ দেবনাথ

জীবনের একটা বড়ো অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি হোস্টেলে থাকবার অভিজ্ঞতা না থাকে। যাঁরা কোনও না কোন সময় হোস্টেলে থেকেছেন তাঁরা নন্টে ফন্টে কেল্টুদা বা সুপারিন্টেন্ডেন্ট হাতিরাম পাতির কার্যকলাপের সঙ্গে খুব সহজেই একান্ত হয়েছেন। আর যাঁরা হোস্টেল জীবন কি তা জানেন না তাঁরা নন্টেফন্টে পড়ে অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারেন হোস্টেল জীবনের হাজারো মজাকে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর ভারতী পত্রিকায় নারায়ণ দেবনাথের নন্টেফন্টের কাহিনীগুলি ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী, অনাবিল মজা এবং পরিবারের সকলের জন্য লেখা---এই ত্রিবেণী সঙ্গমে নন্টেফন্টের জনপ্রিয়তা হয় আকাশছোঁয়া। ছোটো ছোটো নিষ্পাপ দুষ্টুমি এবং কিশোরসুলভ মানসিকতার মেলবন্ধনে নন্টেফন্টে সিরিজের চারমূর্তি খুব সামান্য সময়ের মধ্যে পাঠকমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিলো। প্রায় ৪০ বছর ধরে নন্টেফন্টের জনপ্রিয়তা ছিল অমলিন।

শুকতারার পাতায় নারায়ণ দেবনাথ আরও একটি চরিত্রকে নিয়ে এলেন। তার নাম বাহাদুর বেড়াল। এবার আর মানুষ নয় একটি বেড়াল নায়ক হয়ে দেখা দিলো বইএর পাতায়। মাত্র একপাতা—তারই মধ্যে বাহাদুর এই বেড়ালের অবাক করা সব কাণ্ডকারখানা সে বেশ মজার। বারংবার তাকে জব্দ করবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সে হয় জয়ী। আবার কোথাও কোনও সমস্যা হলে সে এই সমস্যা মেটাতে তৎপরও হয়। উপস্থিত বুদ্ধি এবং পরোপকার—এই দুই এর ভরসায় বাহাদুর বেড়ালের পথ চলা শুরু হয়। কিভাবে স্বল্পপরিসরে বৃহৎ ঘটনার বিন্যাস ঘটানো যায় তা নারায়ণ দেবনাথ এবারেও করে দেখালেন এবং বলা বাহুল্য সফলও হলেন। বাহাদুর বেড়ালকে আপন করে নিতে পাঠকপাঠিকাদের দেরীও হল না। নারায়ণ দেবনাথের লেখার বা কল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট ছিল এই যে যতই খারাপ হোক না কেন শেষে ভালোর জয় অবধারিত। এই বার্তাটা লেখার মধ্যে বরাবর দিয়ে গেছেন। মজার গল্পের পরিমণ্ডলেও ভালো ও সৎ হয়ে ওঠার শিক্ষা তিনি আজীবন মেনেছেন ও মানানোর চেষ্টা করেছেন। সত্যের জয় ও অসত্যের ক্ষয় এই ছিল নারায়ণ দেবনাথের কমিকসের মূলসূত্র। খুব সাধারণ কিছু ঘটনা, আপাত বৈশিষ্ট্যহীন কিছু চরিত্র এবং আটপৌরে জীবনযাত্রা—তার মধ্যে থেকে অনাবিল মজাকে বের করে এনে তা পাঠকপাঠিকার দরবারে উপস্থাপন করা—এই ছিল নারায়ণ দেবনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যখন 'ডানপিটে খাঁদু' আর তার 'কেমিক্যাল দাদু', 'কৌশিক রায়' ইত্যাদি চরিত্র তিনি সৃষ্টি করছেন সেখানেও নারায়ণ দেবনাথ এই সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী ধরে রেখেছেন। দেবসাহিত্য কুটির বা অন্যান্য প্রকাশনী থেকে যখন একের পর এক পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও নারায়ণ দেবনাথ নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। চারপাশে যেসব চরিত্রকে তিনি দেখেছেন তাদের মধ্য থেকেই তুলে এনেছেন গল্পের রসদ। পাঠকরা অনায়াসেই খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের মনকে। এখানেই তিনি জয়ী। বাঁটুল চরিত্রটিকেই যদি ধরা যায় দেখা যাবে তার পায়ে জুতো নেই, আঁটোসাটো ভারি শরীরে কালো হাফ প্যান্ট আর গোলাপি গেঞ্জি। এই সাধারণ পোষাক পরে ব্যাঙ্ক ডাকাত, সন্ত্রাসবাদী কিংবা ভূতপ্রেতকেও সে শায়েস্তা করছে। অর্থাৎ সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েও ইচ্ছাশক্তির জোরে বাঁটুল অসম্ভবকে সম্ভব করে দেয়। তাঁর সাহিত্যে গুরুগম্ভীর জ্ঞানবিতরণ নেই। হালকা চালে আট থেকে আশির মনোরঞ্জন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। নিটোল নিখুঁত বাঙালিয়ানা, পাড়ার নির্ভেজাল আড্ডার নস্টালজিয়া, বিদ্যালয় জীবনের দুষ্টুমি, শিক্ষকদের সঙ্গে মজা, ইত্যাদিকে বিষয় করে গল্প বলেছেন তিনি। দেশাত্মবোধের জাগরণ ঘটেছে রচনায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, চীন ভারত যুদ্ধ এবং আরও কিছু এমন প্রসঙ্গ এসেছে যা ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজের দেশকে চেনাতে সাহায্য করেছে।

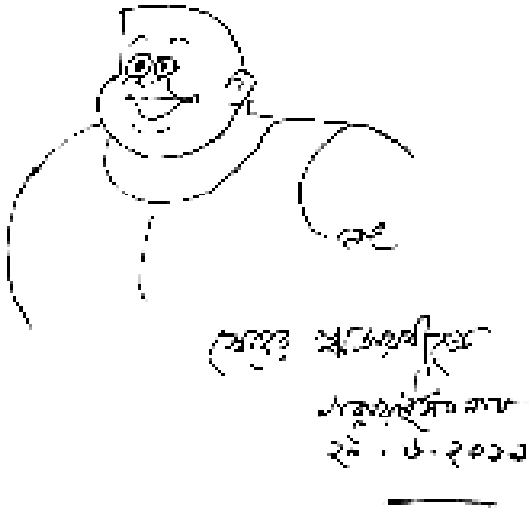

স্বীকৃতি পেয়েছেন পাঠকপাঠিকাদের কাছ থেকে অনেক। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এসেছে অনেক দেরীতে। বঙ্গবিভূষণ, সাহিত্য

একাডেমি এসব পুরস্কার প্রায় নব্বই ছুঁইছুঁই বয়সে পেলেন। পদ্মশ্রী পেলেন জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে। মানুষটি ছিলেন বড়ো মনের। শিশুদের জন্য তাঁর শিবপুরের সেই সাধারণ আটপৌরে বাড়ির দরজা ছিলো সবসময় খোলা। যে মাপের শিল্পী ও সাহিত্যিক ছিলেন তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিলো না। সাধারণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষটি পাঠকদের মাঝে ছিলেন অনেকদিন। সৃষ্টিশীল ছিলেন নব্বই অতিক্রান্ত বয়সে এটুকুই বিশাল প্রাপ্তি। তাঁর বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা বা নন্টেফন্টে নিয়ে একের পর এক সমগ্র বের হয়েছে। অ্যানিমেশনের দুনিয়ায় তিনি যথেষ্ট বিখ্যাত। এখনও বইপাড়ায় তিনি অন্যতম বেস্টসেলার।

২০১৭ সাল থেকে শরীর মাঝেমাঝেই খারাপ হচ্ছিল। মস্তিষ্ক ছিল সচল। মনে পড়ে ২০১৯ সালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হয়েছিল। নিরহংকার সহজ সরল মানুষটিকে দেখে বিস্মিত হয়ে ফেরার সময় বললেন,

'এখন তোমাদের ভালো থাকবার সময়। তোমরা ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো।' শরীর ছিল অসুস্থ। শরীরে নানা উপসর্গ তবুও তো ছিলেন। ২০২২এর ১৮ জানুয়ারি চিরতরে চলে গেলেন পাঠকদের এই অহংকার ও অলংকার। নিয়ে গেলেন ফেলে আসা ছোটোবেলাকে। যতদিন আমাদের বই পড়ার অভ্যাস থাকবে, কমিকসের কদর থাকবে এবং পাঠকরা ফেলে আসা সেই সোনালি সময়কে মনে করবেন নারায়ণ দেবনাথ থাকবেন সকলের মধ্যে।

প্রতিবাদ ও ধিক্কার

- রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের আগ্রাসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন 'ন্যাটো'র প্ররোচনায় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ধ্বংসলীলা, গণহত্যা, নারী শিশু নির্যাতন এবং ব্যাপক পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে
- তাইওয়ানকে নিয়ে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে
- মার্কিন-সৌদি আগ্রাসন কর্তৃক ইয়েমেনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার বিরুদ্ধে
- আফগানিস্তানে তালিবান কর্তৃক সাধারণ মানুষ ও মহিলাদের পীড়ন ও হত্যার বিরুদ্ধে
- মায়নমারে অগণতান্ত্রিকভাবে সামরিক জুন্তার ক্ষমতা দখল ও নাগরিকদের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে
- রাষ্ট্রের ভুল নীতি ও দুর্নীতির কারণে আর্থিকভাবে সঙ্কটগ্রস্ত শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্রের দমন পীড়নের বিরুদ্ধে
- নাগাল্যান্ডের মন জেলায় প্যারা কমান্ডোদের গুলিতে খনি শ্রমিক হত্যার বিরুদ্ধে
- উত্তরপ্রদেশের উন্নাও, প্রয়াগরাজ এবং পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাট, মালদা, হাঁসখালি, পিংলা, পলাশীপাড়া, কাকদ্বীপ, বোলপুর, ময়নাগুড়ি... একের পর এক ভয়াবহ নারী নির্যাতন ও হত্যার বিরুদ্ধে
- বগটুই গণহত্যার প্রতিবাদে। ক্যানিং সহ বিভিন্ন জায়গায় খুনের রাজনীতির বিরুদ্ধে
- আনিস খাঁন, তপন কান্দু, অনুপম দত্ত প্রমুখের খুনের প্রতিবাদে
- উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান সহ বিভিন্ন রাজ্যে দলিত ও আদিবাসী নিগ্রহ ও হত্যার বিরুদ্ধে
- জাহাঙ্গীরপুরী, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে
- ব্যাপক দুর্নীতি, কর্পোরেট ও বৃহৎ পারিবারিক পুঁজি কর্তৃক সমস্ত সম্পদ লুঠ, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি; অন্যদিকে ধর্ম, সাম্প্রদায়িকরা, জাতপাতের বিভাজনের মাধ্যমে সাধারণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া অপচেষ্টার বিরুদ্ধে

বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচকে বাংলা (নীতিআয়োগ ২০২১)

পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র	(২১.৪%)	কাঠ ও কয়লায় রান্না করা পরিবার	(৬১.৬%)
পুরুলিয়ায় দারিদ্র	(৪৯.৭%)	কাঁচা বাড়িতে থাকা পরিবার	(৪৭.২%)
উত্তর দিনাজপুর	(৪২.৮%)	অপুষ্ট পরিবার	(৩৩.৬%)
মালদা	(৩৫.৭%)	শৌচাগার নেই এমন পরিবার	(৩২%)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	(২৮.৩%)	স্কুল শিক্ষায় পিছিয়ে	(১৫.৮%)
বীরভূম	(২৭.৫%)	মায়েদের দুর্বল স্বাস্থ্য	(১৪.৪%)

সুনন্দ সান্যাল : আপসহীন এক পরিবর্তনপন্থি

সনাতন মুর্মূ

পরিবর্তনপন্থি বুদ্ধিজীবীদের তিনি ছিলেন অন্যতম সেনানায়ক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্যে ক্ষমতার মসনদে পৌঁছতে যাঁরা রাজপথ কাঁপিয়েছিলেন 'পরিবর্তন চাই' শ্লোগানকে মূলধন করে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল তাঁদের সামনের সারিতে ছিলেন। 'পরিবর্তন চাই' এই শ্লোগানটি অবশ্য সূত্রবদ্ধ করেছিলেন প্রাক্তন নকশাল নেতা, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শৈবাল মিত্র। তথাকথিত সুশীল সমাজেরও অধ্যাপক সান্যাল ছিলেন অন্যতম মুখ। আত্মমর্যাদা বিকিয়ে পরিবর্তনপন্থি সিংহভাগ বুদ্ধিজীবীদের মত তিনি ক্ষমতার অংশীদার হন নি। একেবারে হন নি বললে সত্যের অপলাপ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় তখত দখলের পর পরিবর্তনপন্থিদের অনেককে ক্ষমতার অংশীদার করেছিলেন। হাজারটা কমিটি তৈরি করে কমিটিতে পদমর্যাদা দিয়েছিলেন। অধ্যাপক সান্যালকে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কমিটির প্রধান উপদেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক সান্যাল যখন দেখলেন তাঁর পরামর্শ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করছেন না তৎক্ষণাৎ তিনি সেই পদে ইস্তফা দিয়ে প্রতিবাদী সত্তা যেমন জিইয়ে রাখলেন একই সঙ্গে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব থেকেও তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। এহেন আপসহীন যোদ্ধার প্রয়াণ ঘটল এ বছর ২৩ মার্চ এই নগর কলকাতার এক হাসপাতালে। অধ্যাপক সান্যাল থাকতেন সল্টলেক করুণাময়ীর এক আবাসনে। তিনি ছিলেন সৎ, নির্ভীক, দায়িত্বশীল ও প্রতিবাদী আপসহীন পরিবর্তনপন্থি নাগরিক।

বহু আন্দোলনের সাক্ষী ও আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক সুনন্দ সান্যালের মৃত্যু শাসকদল তো বটেই বিরোধীদের অগোচরে ঘটে গেল। কেউ কোন অশ্রুপাতও করেননি। এমন কি স্মৃতিচারণও করেননি বিশেষ করে ক্ষমতাপন্থীরা ও ক্ষমতায় অঙ্গীভূত বুদ্ধিজীবীকুল। গণমাধ্যমেও তাঁর প্রয়াণলেখ খুব বেশি নজরে আসে নি বিশেষ করে বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণির দৈনিকগুলিতে। এরকম এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলায় ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ সালে। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে ইংরেজি সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। পড়াতেন বেলুড় কলেজে। অতিথি শিক্ষক হিসাবে তিনি বর্ধমান ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়িয়েছেন। তিনি ইংলন্ডের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিটিই (ডিপ্লোমা ইন টিচিং ইংলিশ) কোর্স করেছিলেন। ইংরেজি ও বাংলায় তিনি বহু মনোগ্রাহী প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছেন। ইংরেজি স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি নিয়মিত কলাম লিখতেন মূলত ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করে ও সেই ভাষা শিখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কী কারিকুলাম হওয়া উচিত তা নিয়ে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক স্টেটসম্যানেও সূচনালগ্ন থেকে লিখতেন। বামফ্রন্ট জমানার তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। এক সময় পরিবর্তনের সপক্ষে কোথাও ভাষণ দিতে গিয়ে শারীরিক নিগ্রহের শিকারও হয়েছিলেন।

অধ্যাপক সান্যাল বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার (কম্যুনিস্ট) (এসইউসিআই (সি))-এর গণসংগঠন 'শিক্ষা বাঁচাও কমিটি'-র সামনের সারিতে থেকে প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করার দাবিতে আন্দোলন করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বামফ্রন্ট সরকার নিয়োজিত কমিটির সদস্য হয়ে (যে কমিটি ইংরেজি তুলে দিয়ে প্রাথমিকে মাতৃভাষায় শিক্ষার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিল) মাতৃভাষায় প্রাথমিকে শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেও পরে বিরোধিতার রাস্তায় গেলেন এটা কি দ্বিচারিতা নয়? তাঁর বক্তব্য ছিল—কমিটি তৈরি হয়েছিল সাত জনকে নিয়ে। যার শীর্ষে ছিলেন অর্থনীতিবিদ ড. অশোক মিত্র। অন্যান্যরা ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, অধ্যাপক গৌরী নাগ (অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজ, পরে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা ও ডি পি আই হয়েছিলেন।), পরমেশ আচার্য (শিক্ষাবিদ), শিক্ষাবিদ অরুণ চৌধুরী, অধ্যাপক জি এস সান্যাল (অধ্যক্ষ খড়্গপুর আই আই টি) ও বসিরহাটের বিধায়ক। নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছিলেন বসিরহাটের বিধায়ক, অধ্যাপক সান্যাল ও অধ্যাপক গৌরী নাগ। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নেন প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার পক্ষে কমিটির সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত মেনে। এরপর থেকে অধ্যাপক সান্যাল শিক্ষা বাঁচাও কমিটির আন্দোলনে যুক্ত হন, ইংরেজি প্রাথমিকে চালু করার দাবিতে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কী এসইউসিআই(সি) দলের সদস্য ছিলেন? উত্তর দেন সেইসময় তিনি কোন দলের সদস্য ছিলেন না। একসময় সিপিআই(এম) দলের সদস্য হয়েছিলেন।

কিন্তু জনগণের দাবিতে যে কোন আন্দোলনে তিনি থেকেছেন বলেও জানিয়েছিলেন। শুধুমাত্র প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নয়, গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলনেও তিনি সরব হয়েছিলেন। বুথ কব্জা বিরোধী আন্দোলনই হোক বা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় দখলের বিরুদ্ধে আন্দোলনই হোক সব কিছুতে তিনি বুঝেছিলেন রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সুশীল সমাজকে সংগঠিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৪০:১ হওয়ার কথা) ঠিক ছিল না। এই অনুপাত কোথাও ১০০-১৫০ জন প্রতি একজন এমনকি ২০০ জন প্রতি একজন। এই সবের বিরুদ্ধেও তিনি সবর হয়েছিলেন। পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১২ সালে সুঁটিয়ায় শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের খুন হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, খুনে মদত দিয়েছিলেন এক পরিবর্তনপন্থি মন্ত্রী। পরিবর্তনের সরকারের প্রতি তাঁর কোনরকম শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তিনি কারণ হিসাবে উদাহরণও দিয়েছিলেন। যেমন রসায়নের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রের কার্টুন কাণ্ডে তাঁকে জেলে ভরা। আরাবুল ইসলামেরর মত অশিক্ষিত দলনেতাকে ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের সভাপতি করা। সিণ্ডিকেট রাজকে বহাল তবিয়তে রেখে দেওয়া, তোলাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। অধ্যাপক সান্যাল সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও সুশীল সমাজের সামনের সারিতে থেকেছেন। পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়াই অধ্যাপক পবিত্র সরকারের রিডার থেকে অধ্যাপক হওয়া এবং পরে রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য হওয়া তিনিই উত্থাপন করেন দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায়। চাপে পড়ে পবিত্রবাবু পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছিলেন সেখান থেকে পিএইচডি শংসাপত্র আনেন। কিন্তু ততদিনে তিনি সরকারি সুযোগসুবিধা যা নেওয়ার সব নিয়েছেন। নিজের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। অধ্যাপক সান্যাল এই তথ্য উদ্ঘাটন করে ওই দৈনিকে দিনের পর দিন প্রতিবেদন লিখেছেন। জীবনের শেষলগ্নে অধ্যাপক সান্যাল নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। কথাবার্তা ঠিকঠাক বলতে পারতেন না। বলা যায় তাঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। তিনি রেখে গেলেন তাঁর একমাত্র পুত্রকে ও অগণিত ছাত্রছাত্রীসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের আন্দোলনে রাজনৈতিক পালাবদলে তিনি শুধু একটি নাম নন, পরিবর্তনের মুখ ছিলেন। শেষ যাত্রায় তিনি আরেকটু সম্মান পেতে পারতেন না কি পরিবর্তনপন্থিদের কাছে?

পথসভায় অন্যদের সঙ্গে সুনন্দ সান্যাল

চলে গেলেন এক টাকার ডাক্তার

জনপ্রিয় চিকিৎসক ডাঃ সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৮-২০২২) কলকাতার আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে প্যাথোলজিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পন্ন করে ইংল্যান্ড থেকে রক্তসংবহনতন্ত্র শাস্ত্রের উপর ডিপ্লোমা করেন। এই গান্ধীবাদী নেতা তাঁর নিবাস বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে ১৯৬৩ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাত্র ১ টাকার ভিজিটে রোগী দেখতেন। তাঁর চেম্বার সবসময়েই রোগীদের জন্য ছিল অবাধ এবং সাধারণ মানুষের কাছে এক টাকার ডাক্তার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সর্বমোট রোগীর সংখ্যায় তিনি রেকর্ড করে গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তোলেন। রোগীর সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ২০২০তে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। তিনি ১৯৮৪তে জাতীয় কংগ্রেসের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন।

পরিবেশ শহীদ তপন দত্ত মামলা

জলাভূমি রক্ষা করতে বালির পরিবেশ কর্মী ও তৃণমূল নেতা তপন দত্ত ২০১১-র ৬ মে খুন হন। তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দত্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী অরূপ রায় সহ বেশ কিছু তৃণমূলকর্মী ও সমাজবিরোধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ, প্রশাসন ও নিম্ন আদালত নিষ্ক্রিয় থাকে ও তপন দত্তের পরিবারের সাথে অসহযোগিতা করে। উল্টে ঘাতকরা হুমকি দিতে থাকে এবং সামাজিক বয়কটের ব্যবস্থা করে। প্রতিমা দেবীরা সংগ্রাম চালিয়ে যান ও হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। ১১ বছর আইনি যুদ্ধের পর হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সমাজ-সচেতক রামমোহন রায়

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। ''বহুদিনের কথা। জলপথে যাত্রা করিয়াছি, দিনরাত্রি জাহাজ চলে। মাঝে মাঝে বন্দরে থামে। বিঘ্ন বিপদসংকুল স্থানেও মাঝে মাঝে জাহাজ দাঁড়ায়। এক-একজন পথপ্রদর্শক বিশেষজ্ঞ উঠিয়া সংকট স্থানটুকু পার করিয়া দেন। তাঁহাকে পাইলট বলে। বিপদময় পথে তাঁহার নির্দেশ না মানিলে বহু অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।'' ভারতের ইতিহাসে বারবার সমস্যা সঙ্কুল পথের হদিস পাওয়া যায় এবং সেই সমস্যা দূরীকরণের জন্য পথ প্রদর্শকেরও আবির্ভাব হয়। মুসলিমযুগ কিছুদিন স্থায়ী হবার পর থেকেই পণ্ডিত মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সাধনাকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিষয়টি অন্যরূপে ধরা দিল। রামানন্দ, রবিদাস, কবীর, দাদু, নানক প্রভৃতি সহজিয়া দলপতি ভক্তিকে প্রধান করে এক নতুন সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটালেন। এরপর ভারতের সংস্কৃতির ওপর এল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা। বিষয়টি আর ধর্মের মধ্যে সংকুচিত রইল না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যার অর্থ পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাজ, শিক্ষা ইত্যাদি ভারতের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ওপর এক নতুন প্রভাব বিস্তার করতে চাইল, এমনই একটা খণ্ড মুহূর্তে রামমোহন রায়ের অবির্ভাব।

জন্মের সাল নিয়ে একটা বিতর্ক চলছিল। কিন্তু তাঁর লেখাকেই যদি আশ্রয় করা যায়, ''আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে আমার পিতা পুনর্বার আহ্বান করিলেন, আমি পুনর্বার তাঁহার স্নেহলাভ করিলাম।'' এই লেখাটি ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ভারতের বাইরে তিব্বত ভ্রমণ করে রাধানগরের বাড়িতে ফিরে আসার পর। রামমোহনের এই উক্তিটিকে প্রামাণ্য ধরলে জন্মসাল ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দকেই মান্যতা দিতে হয়। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মে রামমোহন রায়ের জন্ম খানাকুল ব্লকের রাধানগর গ্রামে।

জন্মবৃত্তান্ত ঃ

রামমোহনের পূর্বপুরুষের কুলপণ্ডিতের উল্লিখিত রায় বংশের আদি পুরুষ ভট্টনারায়ণ, রাজা বল্লাল সেনের সময়ে কুলীন ব্রাহ্মণের একজন হিসেবে বঙ্গদেশে আসেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আজিম ওয়াশাহের অধীনে ইজারাদার ছিলেন বর্ধমান রাজ কীর্তিচন্দ্র রায়। এই কীর্তিচন্দ্রের অধীনে ইজারাদার ছিলেন খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনন্তরাম চৌধুরী। অনন্তরামের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে কীর্তিচন্দ্রের অনুরোধে মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁর মন্ত্রী ভবানন্দ রায়ের পরামর্শে কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভট্টানারায়ণ বংশের চব্বিশতম পুরুষ। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ পরশুরাম নবাবের অধীনে প্রথম চাকুরি গ্রহণ করে 'রায় রায়ান' উপাধি লাভ করেন, তাঁদের কৌলিক উপাধি ছিল 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ নবাব আলিবর্দি খাঁ ও সিরাজদ্দৌলার কর্মচারি ছিলেন। যখন মোগল-সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম পূর্বদেশে অবস্থান করছেন ব্রজবিনোদ তখন সম্রাটের অধীনেও কাজ করেছেন। এই ব্রজবিনোদকে অন্তিম কালে শ্রীরামপুর গঙ্গার তীরে নিয়ে আসা হল। সেখানে দেখা করতে এলেন চাতরা নিবাসী শ্যাম ভট্টাচার্য। শ্যাম ভট্টাচার্য ব্রজবিনোদকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যার সঙ্গে যদি একজন পুত্রের বিবাহ দেন। শ্যাম ভট্টাচার্য শাক্ত, ভঙ্গ কুলীন। তাও ব্রজবিনোদ পুত্রদের মতামত গ্রহণ করলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নিমানন্দ থেকে অন্যান্য পুত্র রামকিশোর, রাধামোহন, গোপীমোহন, রামরাম ও বিষ্ণুরাম রাজি হলেন না। পঞ্চম পুত্র রামকান্ত পিতার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন। শ্যাম ভট্টাচার্যের কন্যা তারিণীদেবীর পানিগ্রহণ করলেন। রামকান্ত রায়ের প্রথম স্ত্রী সুভদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। রামকান্ত ও তারিণীদেবীর তৃতীয় সন্তান রামমোহন। রামকান্ত নিজে ছিলেন '...most respectable man in the district' (বর্ধমান কালেক্টরের পত্র)। তারিণীদেবী পরিবারে পরিচিত ছিলেন 'ফুল ঠাকুরানী' নামে।

রামমোহন রায় ও সাংবাদিকতা ঃ

রামমোহন রায় জীবনের প্রথম ষোলটি বছর রাধানগরে কাটান। সেখানেই তাঁর প্রাথমিক পাঠ। ষোল বয়সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন। পরে রামমোহন কুড়ি বছর বয়সে ঘরে ফেরেন। তিনি এই সময়ে শুধু ভারতীয় প্রদেশই নয়, ভারতের বাইরের দেশও ভ্রমণ করেন। ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ-হিদিন' গ্রন্থে লিখছেন-'আমি পৃথিবীর বহু দূরদেশে গিয়াছি। কখনও সমতল

ভূমিতে, কখনও বা পার্বত্য প্রদেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি'। তাঁর সাংবাদিকতা চিন্তার জন্ম সম্ভবত এই সময়ে।

রামমোহনের যখন আট বছর বয়স, ব্রিটিশ কর্মচারি জেমস অগাস্টাস হিকি 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হওয়ার তারিখ ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি। এরও আগে উইলিয়াম বোলটস্ কলকাতা থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

রামমোহন কলকাতায় এলেন ১৮০১ সালে। এরমধ্যে 'মাদ্রাজ কুরিয়ার', 'বম্বে হেরাল্ড', 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রমুখ ২৪টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ান টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকা জালালপুরে চলে যান। যেখানে দু'বছর অতিবাহিত করেন। সেখান থেকে ফিরে খানাকুল-রাধানগর ঘুরে মুর্শিদাবাদ যান। জন ডিগবির দেওয়ান হিসেবে ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রংপুরে কাটান। ১৮১৫ সাল থেকে রামমোহন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হলেন।

রামমোহন রায় ১৮২১ সাল পর্যন্ত লিখে চলেছেন। ১৮১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে রামমোহনের ৮-১০টি বই প্রকাশিত হয়। ওই বছরের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'। ঠিক এক বছর পর প্রকাশ পায় 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ'। বেঙ্গল গেজেট পত্রিকায় এই লেখাটি ছাপা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে এটিই সংবাদ পত্রে প্রকাশিত রামমোহনের প্রথম লেখা। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক রামমোহনের সঙ্গে বাকিংহামের বন্ধুত্ব ছিল গভীর।

রামমোহনের সঙ্গে একটি পত্রিকা 'দর্পণে'র সম্পর্ক ভাল ছিল না। 'দর্পণ'-এ ১৮১৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল।

'সহমরণ। কলিকাতার শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থুল লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।'

দর্পণের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণেই রামমোহন সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হন। শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিজের পত্রিকা শুরু করেন, পত্রিকাটি ছিল দ্বিভাষিক। এক পৃষ্ঠায় বাংলা অন্য পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ। বাংলায় পত্রিকাটির নাম 'ব্রাহ্মণ সেবধি: ব্রাহ্মণ ও মিশনারী সংবাদ'। ইংরেজিতে-'The Brahminical Magazine-The Missionary and the Brahmin'। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত চতুর্থ সংখ্যা শুধুমাত্র ইংরেজিতে প্রকাশিত। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' বন্ধ হবার পর তাঁকে আর একটি পত্রিকায় যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। পত্রিকাটির নাম 'সম্বাদ কৌমুদী'। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা থেকেই রামমোহনের যুক্ত থাকায় প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ সেবধি' বন্ধ হবার পর আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। 'সম্বাদ কৌমুদী' সম্পর্কে জানতে হয় পরোক্ষভাবে। ক্যালকাটা জার্নাল, এশিয়াটিক জার্নালের মতো ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিকে কৌমুদীর কভারেজ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল সম্বাদ কৌমুদী।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের পর ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল রামমোহন প্রকাশ করেন একটি ফার্সি সাপ্তাহিক 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বর'। বাংলা অর্থ সংবাদ দর্পণ। এই পত্রিকাটি প্রায় এক বছর প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকাটি বন্ধ হবার পর রামমোহন রায়কে বছর ছয়েক কোন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা যায় না। চার বছর পরে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' নামে একটি পত্রিকার সঙ্গে অন্য অনেকের মত সত্বাধিকারী হিসেবে যোগ দেন পরে সেখান থেকেও বেরিয়ে আসেন।

রামমোহন কলকাতা জীবনের ন'বছরে অন্তত পাঁচটি কাগজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কোনটি সাপ্তাহিক, কোনটি মাসিক। সাংবাদিক হিসেবে রামমোহন অবস্থান বিচার করার থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সপক্ষে তাঁর ভূমিকা বিশ্লেষণ জরুরি। এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে প্রথম থেকেই সংবাদপত্রগুলি সোচ্চার। হিকি তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' এর প্রতি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় লিখতেন: "A weekly political and commercial paper open to all parties, but influenced by none"। হেস্টিংসের সময়ে রামমোহনের পত্রিকা প্রকাশে কোন অসুবিধা হয়নি। ১৮২৩ এর ১ মার্চ বাকিংহাম চলে গেলেন। আর ঠিক তার তেরোদিন পরে অ্যাডাম একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন যেটি ৫ই এপ্রিল থেকে কার্যকরী হয়।

এই অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে রামমোহনের অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। যেমন অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে ব্রিটেনের রাজার কাছে রামমোহনের পাঠানো স্মারকলিপি, মীরাৎ-উল-আখ্‌বারের শেষ সংখ্যায় রামমোহনের দীর্ঘ সম্পাদকীয়। প্রেসের স্বাধীনতার পক্ষে রামমোহনের উদ্যোগ বিদেশেও সাড়া ফেলেছিল। কেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন? প্রশ্নটির উত্তরে রামমোহন রায়ের যুক্তিগুলো রাজার কাছে পাঠানো স্মারক লিপি

এবং সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা যৌথ স্মারক লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। এককথায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে মর্যাদা দিতে এবং সর্বসাধারণকে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে রামমোহনের প্রয়াস আধুনিক ও আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

রামমোহন রায় ও শিক্ষা বিস্তার ঃ

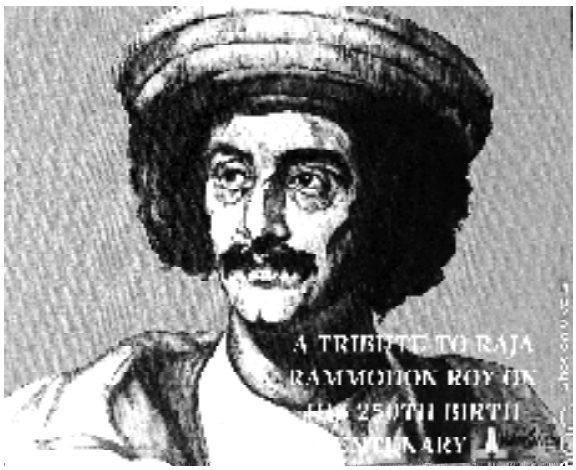

শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিবিধ প্রয়াস লক্ষণীয়। এর মধ্যে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ, বেদান্ত কলেজ স্থাপন, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুল স্থাপন, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য লর্ড আমহার্স্টকে পত্র প্রেরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডাফ সাহেবকে স্কুল স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন।

রামমোহন রায় ও সমাজসংস্কার ঃ

নারীর অধিকার রক্ষায় রামমোহন রায়ের অবদান আজও স্মরণীয়। জননী নয়, জায়া নয়, কন্যা নয়, নারী। নারীদের অধিকার, নারীদের সামাজিক সম্ভ্রম রামমোহনের চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তন্ন তন্ন করে শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান করেছেন নারীর অধিকার রক্ষার রসদ পেতে। আসলে ছোটোবেলা থেকে একরোখা রামমোহন সমাজ সংস্কারের কাজে যেখানে যেখানে বাধা পেয়েছেন সেখান থেকে রক্ষার উপায় শাস্ত্রেই খুঁজেছেন। সময়টা ছিল সামাজিক স্থবিরতার। শাস্ত্রের কথাগুলো বিকৃত করে বা পছন্দমতো সাজিয়ে বলা ছিল রীতি। শিক্ষার হার ছিল নগণ্য। স্বভাবতই সামান্য সেই সময়ে ভারতবর্ষের চিত্র কেমন ছিল রবীন্দ্রনাথের কথায় সুন্দর ফুটে ওঠে। রামমোহন সম্পর্কীয় প্রবন্ধে লিখেছেন ‘‘শত শত বৎসর চলে গেল- ইতিহাসের পরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ। ভারতবর্ষের মনোলোকের চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীরণ হয় না দূর দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন।’’ রামমোহন এমন একটি সময়ে এসে শিক্ষাকে হাতিয়ার করতে চাইলেন। আমরা বৈদিক সাহিত্যে পুরুষতান্ত্রিকতার কথা পাই কিন্তু নারীদের বেঁচে থাকার অধিকারে সেই সময়ে সমাজের হস্তক্ষেপের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অথর্ববেদে প্রথম সহমরণের কথা শোনা যায়। মহাভারতে দেখা যায় কোনও কোনও নারী স্বামীর অনুগামিনী হতেন কিন্তু সবাই হতেন না এবং সে নিয়ে সামাজিক বাধ্যবাধকতাও ছিল না। আর্যদের মধ্যে সহমরণ ছিল না। রামকৃষ্ণ ভান্ডারকরের মতানুযায়ী সহমরণপ্রথা বিদেশী অনার্যদের থেকে এসেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে সহমরণপ্রথার মত কুসংস্কার ছিলই না। রামমোহন নারীমুক্তি নিয়ে যে কটি কথা ভেবেছিলেন তার মধ্যে প্রধান হল সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ। বেঁচে থাকার অধিকার। উনবিংশ শতকের প্রথম অর্ধে রামমোহন কলকাতায় এসে প্রথম অনুভব করেন এই প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা দরকার। জনমত গঠনের জন্য তিনি পুস্তিকা প্রকাশকে বেছে নিলেন। বাংলায় তিনটি ও ইংরাজীতে চারটি গ্রন্থ রচনা করলেন। অবশেষে ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ক আইন পাশ হল। বাঁচলেন অসংখ্য অসহায় নারী। তিনি দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য পাঠানোর উদ্যোগ নেন।

রামমোহন রায় ও ধর্মসংস্কার ঃ

প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। বিতর্কে পরাজিত করেন সমাজের মাথা হিন্দু পণ্ডিত এবং মিশনারীদের। প্রতিষ্ঠা করেন একেশ্বরবাদী সংস্কারমূলক ব্রাহ্ম সমাজ।

তাই রাজা রামমোহন রায় আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর আধুনিক যুক্তিবাদী মনন, অগাধ পাণ্ডিত্য, সমাজচেতনা, ধর্ম শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার এবং একনিষ্ঠ অবিচলিতভাবে তাদের প্রয়োগ এখনও আমাদের উদ্দীপনা জোগায়।

কমবয়সী মেয়েদের বিয়েতেও শীর্ষে বাংলা

(সূত্র: স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ২০২১)

- পশ্চিমবঙ্গে ৪৫ শতাংশ মেয়ের ও ২০ শতাংশের ছেলের ২১ বছরের আগে বিয়ে হয়ে যায়।
- পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ২১ বছর। সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে কম। দেশের গড় ২২.১।
- কেন্দ্র সরকার মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ থেকে ২১ করতে চাইছে।
- দেশের ‘টোটাল ফার্টিলিটি রেট (টি. এফ. আর.)’ অর্থাৎ মহিলাদের মাথাপিছু সন্তানের গড় সংখ্যা এন.এফ.এইচ.এস. পঞ্চম রাউণ্ড রিপোর্টে ২.২ থেকে কমে ২.০ শতাংশে নেমেছে।

জন্মের সার্ধ দ্বিশতবর্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো রামমোহনের জন্মভিটা

রাজীব মৈত্র

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আফশোস ছিল, তেত্রিশ বছর কেটে গেল কিন্তু কেউ কথা রাখল না। মাত্র তেত্রিশ বছর! অথচ এদিকে একাধারে বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত, স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, বহুভাষাবিদ, প্রতিষ্ঠিত রাজকর্মচারি, ইউরোপে ভারতের রাজদূত, পত্রিকা সম্পাদক, সাহিত্যসাধক, সর্বোপরি কৃতী গীতিকার ও সুরকার রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটে একটু প্রাপ্য মর্যাদার অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করে রয়েছে সুদীর্ঘ ১৮৯ বছর! ২২ মে তার জন্মের সার্ধ দ্বিশতবর্ষ চলে গেল। অর্থাৎ ২৫০ তম জন্ম শতবর্ষ। ১৭৭২ সালের ২২ মে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে জন্মেছিলেন এই যুগপুরুষ। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে প্রয়াত হন ১৮৩৩ সালে। সেই বছরটি থেকে গুনতি শুরু করলে ১৮৯ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো জেগে রয়েছে কলকাতা থেকে ৯৫ কিলোমিটার দুরে হুগলির আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা এলাকার রাধানগর গ্রাম। রামমোহনের জন্মভিটেয় আজও চলেনা রেল গাড়ি। কাছাকাছি স্টেশন বলতে ২৫ কিলোমিটার দুরে শিবভূমি তারকেশ্বর। অথচ রাধানগরের বাসিন্দারা আজও গ্রামের মনীষীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন, কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকার তাদের গ্রামের দিকে মুখ তুলে তাকাবে। তাদের আশা, হয়তো রামমোহনের সার্ধ দ্বিশতবর্ষে তার ভগ্ন বসতবাড়িটি কেন্দ্র করে তার নামাঙ্কিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করবে সরকার। বাম জমানায় রাধানগরে স্থানীয় জেলা পরিষদের উদ্যোগে রামমোহনের জন্মভিটে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছিল রামমোহন মিউজিয়াম, সঙ্গে পাঠাগার। সেটি আছে, তবে জৌলুসহীন।

রামমোহনের পৈত্রিক বাড়ি

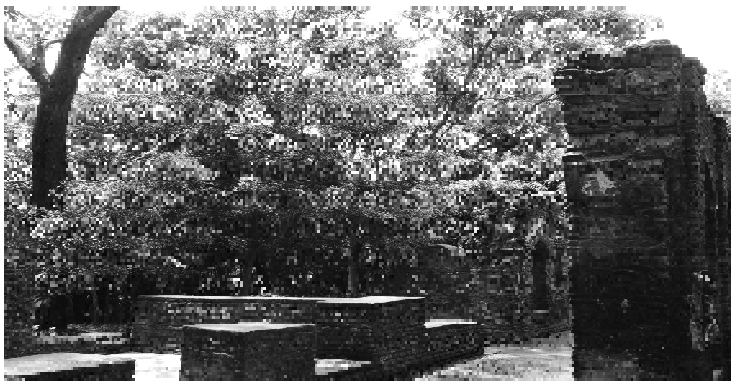

রামমোহনের নিজের তৈরি বাড়ির ভগ্নাবশেষ

গত ৯৯ বছর ধরে রামমোহন চর্চার প্রচার ও প্রসার নিয়ে কাজ করে চলেছে স্থানীয় সংগঠন 'রাধানগর পল্লি সমিতি'। সমিতির বর্তমান কর্ণধার বাসুদেব বসু জানান, রাধানগরে রামমোহনের স্মৃতিকে ভাস্বর করে রাখতে বছর কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব আকারে একটি চিঠি দিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আজও সে চিঠির ন্যূনতম প্রাপ্তি স্বীকার তাঁরা পাননি। তবে মূলত এই সংগঠনের লাগাতার দাবিতেই কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা থেকে রাধানগর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়েছে। তার বাইরে যে শিকড়ের রসে রামমোহনের মতো মনীষী বেড়ে উঠেছেন, সেই রাধানগর আজও কার্যত বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপের মতো টিমটিম করছে। বাসুদেববাবুরা চাইছেন, রাধানগরে একটি আধুনিক বাস টার্মিনাল তৈরি করুক সরকার। টার্মিনালে শোভিত হোক রামমোহনের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। রাধানগরের বাসিন্দারা আরও চান, সেখানে পর্যটকদের থাকার জন্য আবাস তৈরি হোক। রাধানগরে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হোক পর্যটক নিবাস। নিকটবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান দেবানন্দপুর—এই স্থানগুলি নিয়ে এক পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা যেতে পারে। রাধানগর পল্লি সমিতির উদ্যোগে ১০ হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বছর পাঁচেক আগে বাসুদেববাবুরা একটি আবেদন জানিয়েছিলেন। মায়াপুর থেকে রাধানগর পর্যন্ত রেল প্রকল্প চালু করার। বাসুদেববাবু বলেন, 'আক্ষেপের বিষয় হল ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন যে মানুষটি, সেই রামমোহনের স্মরণে রেল প্রকল্প চালুর ব্যাপারে কেন্দ্রের তরফ থেকেও আমরা কোনও সাড়া পাইনি। অথচ ওই রেল লাইন চালু হয়ে গেলেই মায়াপুর রাধাননগর নিয়ে বাংলায় গড়ে উঠতে পারত নতুন এক পর্যটনবৃত্ত তথা রামমোহন সার্কিট।" সম্প্রতি রামমোহনের স্বনির্মিত বসতবাটী, অলকমঞ্জরীদেবীর সতীদাহ স্মারক

বেদী ও সংলগ্ন স্থানকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করায় সমিতির সভ্যরা খুশি।

বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বহু দর্শনীয় স্মারক ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে রাধানগরে। রামমোহনের সমাধি স্মারক, স্মৃতিমন্দির এবং তার ভিটেবাড়ির ভগ্নাবশেষ ও সতীদাহস্থল ছাড়াও আছে আনন্দময়ী মায়ের মন্দির, স্যার ভুপেন্দ্রনাথ বসু পরিবারের বাস্তুভিটা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তার শৈশবে চিকিৎসা করা কবিরাজ রামলোচন গুপ্তের বাস্তুভিটা, বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর মাতুলালয়ের বাস্তুভিটা, শ্রীরাধাবল্লভ জিউয়ের টেরাকোটার প্রাচীন মন্দির, নগেন্দ্র সর্বাধিকারীদের বাস্তুভিটা প্রমুখ। তবে অনেক নাই তালিকার মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছে রামমোহনের স্মৃতিতে গড়ে ওঠা পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির একটি নাগরিক সমিতি। আজকের খেজুরি ডাঙা হয়ে গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেখানে ছিল বঙ্গোপসাগরের উপর বন্দর। যাত্রীবাহী জাহাজ চলত। ১৮৩০ সালে খেজুরি বন্দর থেকেই জাহাজে চড়ে প্রথম বিলেতযাত্রা করেছিলেন রামমোহন। ইতিহাসের সেই উজ্জ্বল পৃষ্ঠাকে স্মরণীয় করে রাখতে ওই সমিতির উদ্যোগে রামমোহনের স্মৃতিতে ভবন নির্মিত হচ্ছে। সেই নির্মাণে রাধানগরে মনীষীর জন্মভিটের মাটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাধানগর থেকে নিজের হাতে মাটি নিয়ে খেজুরিতে গেছিলেন কলকাতার রামমোহন রিমেমবারেন্স সোসাইটির বর্তমান কর্ণধার প্রসূন গঙ্গোপাধ্যায়। লন্ডন শহরে রামমোহনের মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নিয়েছেন প্রসূনবাবু। তিনি বলেন, 'ব্রিস্টলে রামমোহনের মূর্তি আছে, তবে লন্ডনে নেই।

আমি সেখানকার ক্যামডেন কাউন্সিলের (এখানে যেমন পুরসভার বরো অফিস) কাছে মূর্তি বসানোর আবেদন পেশ করেছি। তাঁরা সম্মত হয়েছেন। এই কাজটুকু করতে পারলে রামমোহনের একজন অনুরক্ত হিসাবে নিজেকে ধন্য মনে করব।"

কৃতজ্ঞতা : দৈনিক সংবাদ, আগরতলা

রামমোহন রায় এবং ভারতের নবজাগৃতি: একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান

বাপ্পাদিত্য রায়

"এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে।
যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বান্তরে।"
—রামমোহন রায়

রামমোহন রায়ের জন্ম মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ লগ্নে, পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রি:) জয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থার বাংলা তথা সমগ্র হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের পরে। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের সম্ভবত ২২ মে হুগলি জেলার দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, দারকেশ্বর প্রভৃতি নদনদী বিধৌত অতিউর্বর শস্যশ্যামলা খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামের ধনী ব্রাহ্মণ কুলিন পুরোহিত ও জমিদার রামকান্ত রায়ের দ্বিতীয়া পত্নী তারিণী দেবী বা ফুল ঠাকুরাণীর গর্ভে। রামমোহনের মাতৃকূলও উচ্চবর্ণের হিন্দু-তান্ত্রিক বংশ ছিল। তাঁর পিতৃকূল ছিল বৈষ্ণব মতের। তারিণী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন। আরেকটি কন্যাও জন্মেছিল রামমোহনের আগে। রামকান্ত রায়ের প্রথমা পত্নী সুভদ্রাদেবী নিঃসন্তান ছিলেন। তৃতীয়া পত্নী রাসমণি দেবীর গর্ভে জন্মান রামলোচন। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মার্কিন চিত্রকর রেমব্রান্ড পিলের আঁকা, লন্ডন ১৮৩৩

আবহমান কাল থেকে নিজস্ব পশ্চাৎপর ও আবদ্ধ জীবনপ্রবাহ ও ধর্ম-কুসংস্কারে অভ্যস্ত অথচ প্রকৃতি ভরপুর স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলা এবং ভারতের গ্রামগুলি একদিকে কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত নবাবী শাসন অন্যদিকে দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ে কোম্পানির সরাসরি শোষণে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ক্রমাগত বিদেশী অত্যাচারী মুৎসুদ্দি পুঁজির (Comprador Capital) আক্রমণে প্রথমে পুর্ব ভারতের পরে অন্যত্র অর্থনীতি ছারখার হয়ে যায়। যার ফলে রামমোহনের জন্মলগ্নে ঘটে ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯—৭৩ খ্রিষ্টাব্দ বা ১১৭৬—৮০ বঙ্গাব্দ) যাতে অবিভক্ত বৃহত্তর বাংলার এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা প্রায় দুকোটি মানুষ মারা যান। ব্রিটিশ শাসনে একের পর এক দুর্ভিক্ষ ঘটে চলে।

এরপর লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের ব্রিটিশ বড়লাট বা গর্ভনর জেনারেল হয়ে এসে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এতদিনকার নবাব ও কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী দালাল জমিদারদের বিপুল মুনাফার পরিবর্তে জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় দেশের এতদিনকার স্বাধীন কৃষক হয়ে গেল কোম্পানি ও নবাবীর অধীনস্ত জমিদার-মহাজনদের প্রজা। বেড়ে গেল কোম্পানি ও নবাবী শোষণ ছাড়াও জমিদার এবং তাদের বসানো বিভিন্ন মধ্যসত্বভোগী আদায়কারীদের শোষণ ও অত্যাচার। যার সমষ্টিগত অভিঘাতে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সর্বস্বান্ত ও রক্তশূন্য হয়ে গেল। বিশ্ববন্দিত বস্ত্র ও অন্যান্য কুটির শিল্প হয়ে গেল ধ্বংস। বলপূর্বক

নীল, আফিম, চা ইত্যাদি চাষ করানো শুরু হল। এর বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হল যার মধ্যে শক্তি ও ব্যাপকতায় সর্বাগ্রে ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০ খ্রি:)।

আবার বর্ধমানের মহারাজা সেই সময় সর্বপ্রথম পত্তনি দিয়ে মধ্যসত্বভোগী তালুকদার সৃষ্টি করেন। ওই রাজবাড়িরই প্রধান পুরোহিত রুপান্তরিত নায়েব-তালুকদার ছিলেন রামমোহন পিতা রামাকান্ত রায় যিনি নিজেই প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। এইরকম সময়ে এই রকম এক শ্রেণি অবস্থানে জন্ম রামমোহনের। তাঁর কার্যপরম্পরায় যেমন এই ব্রিটিশ-নবাবী-জমিদারি শাসন প্রণালীতে থেকে পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল, আবার আমৃত্যু উদ্যোগ ছিল এই শাসন প্রণালীকে মানবিক, প্রজারঞ্জক, আধুনিক ও উন্নত করে তোলার। রামমোহন একদিকে যেমন নবাব ও কোম্পানির অধীনে চাকরি করেছেন আবার ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা সংস্কারে সক্রিয় ছিলেন। প্রতিবাদ করেছিলেন সাধারণ মানুষের ও মালঙ্গিদের পক্ষে ক্ষতিকারক লবণ আইন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইনের বিরুদ্ধে। বাংলার বিভিন্ন জেলায় দেওয়ানি সংক্রান্ত কাজ করে বাংলার গ্রাম ও কৃষিজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ে, আগে ও পরে নির্যাতিত কৃষক, কারিগর, সৈনিক প্রমুখদের যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল তা আছড়ে পরে তাঁর মৃত্যুর ২৪ বছর পরে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে।

রামমোহনের আবক্ষ মূর্তি

রামমোহন ছিলেন বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতির (Renaissance) প্রাণপুরুষ যদিও এই নবজাগৃতি ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন কর্তৃক তাদের প্রয়োজনীয় সংস্কারজাত এবং ওই ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত মূলতঃ অনুপস্থিত জমিদার (Absentee Landlords) ও বেনিয়ান শ্রেণির শিক্ষিত ও আলোকিত (Enlightened) অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাশাপাশি রামমোহন ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের (Nationalism) আদিগুরু যদিও এই জাতীয় চেতনা ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন ও অত্যাচারী জমিদারি ব্যবস্থার অন্তর্গত ও সহায়ক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র দলিত, মুসলমান, আদিবাসী, জনজাতি কৃষক-কারিগরদের থেকে বিচ্ছিন্ন। এর মধ্যেও বেশ কয়েক বছর ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, রামগড় (হাজারিবাগ), মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের নবাবী ও কোম্পানির সেরেস্তায় কাজ করে অভিজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল রামমোহন প্রজাহিতে শাসন সংস্কারের বিবিধ প্রস্তাব দেন। সেই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত অনুপস্থিত অত্যাচারী ধনী জমিদার-বেনিয়ারা, যারা ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম ভিত্তি ছিলেন, তাদের ব্রিটিশ পদলেহন ও জয়গানে মুখরিত বৃহৎ অংশটি যেমন ভোগ-বিলাস-নেশা-বিকৃতিতে মত্ত ছিলেন, অন্যদিকে তাদের একটি ক্ষুদ্র 'আলোকিত' অংশ পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং তার মাধ্যমেই পশ্চাদপর ভারতীয় সমাজের সংস্কার চেয়েছিলেন। এঁদের প্রধান হোতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, স্বাধীনচেতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রামমোহন। তিনি মাতৃভাষা বাংলা সহ ইংরিজি ও নবাবী শাসনের সরকারি ভাষা ফারসি বিস্তারে, ধর্মীয় কুসংস্কার কুআচার ও গোঁড়ামি বিরোধিতায়, পৌত্তলিকতার বিপরীতে সর্বধর্ম সমন্বয় করে একেশ্বরবাদী দর্শনের প্রবর্তনে, নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা নিবারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'ল্যান্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি', 'গৌড়ীয় সভা', 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি'। পাশাপাশি তিনি ছিলেন উদারতাবাদী 'ব্রাহ্মসমাজ', 'আত্মীয় সভা' প্রভৃতির এবং দুটি সূচনাকারী সংবাদপত্র 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মিরাত-উল-আখবার'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

রামমোহন শুধুমাত্র মেধাবী, প্রতিভাবান, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, একাগ্র কর্মবীর ছিলেন না তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের চাইতে অনেকগুণ আগুয়ান ও অনেক কিছুর সূচনাকারী। তাঁর সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়ে ওঠেনি। তার চাইতে বলা ভালো এখনকার ধর্ম-জাতপাত-সাম্প্রদায়িকতা-কুআচার-অপসংস্কৃতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকা অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নিম্ন মেধার দুর্নীতিগ্রস্ত লোভী ভোগী লোক ঠকানো দুর্বল চরিত্রের শাসক এবং তাদের বশংবদ বুদ্ধিজীবীরা রামমোহনকে আড়াল করতে চায় যেমনটা রামমোহনের সময় কায়েমি স্বার্থের সমাজ প্রধানরা তাঁর বিরুদ্ধে কলঙ্ক অপবাদ ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা আক্রমণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। অথচ এই আধুনিক মানুষটি এককভাবে তাঁর পিতা, মাতা, আত্মীয়-পরিজন, সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে নির্ভীক ও ধারাবাহিকভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি বুজরুকি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে এবং যুক্তি, গণতন্ত্র ও মানবতার পক্ষে বলে, লিখে, বক্তৃতা দিয়ে, প্রচার চালিয়ে গেছেন আজীবন।

এই যুগাবতার পুরুষের বিদ্যাশিক্ষার সূচনা পিতৃগৃহে শুভঙ্করীর পাঠ অর্থাৎ প্রাথমিক গণিত শিক্ষা দিয়ে। তারপর রামনারায়ণ সর্বাধিকারীর 'মুন্সিচালায়' ফারসি ভাষার প্রাথমিক পাঠ। ফারসি তখন সরকারি ভাষা। মাত্র নয় বছর বয়সে শিক্ষার্জনের জন্য আরবি ফারসি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র পাটনায় তাকে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে মাত্র

আট বছর বয়সে তখনকার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ জমিদারদের প্রথা মেনে তাঁর সাথে একটি বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়। উক্ত বালিকার কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যু হলে শ্রীমতি ও উমা নামক অপর দুই বালিকার সাথে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। পরে উমা দেবীর গর্ভে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ এবং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠপুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম। রমাপ্রসাদ হুগলির ডেপুটি কালেক্টর ও হাইকোর্টের প্রথম বাঙালি বিচারক ছিলেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের উপর বিস্তারিত লেখেন।

পাটনায় শিক্ষাকালীন বালক রামমোহনের ইসলাম ধর্মের বিশেষত সুফি সম্প্রদায় এবং বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যার একেশ্বরবাদ প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে যাকে তিনি সারাজীবন লালিত করেছিলেন এবং পঞ্চবেদ, উপনিষদ, শ্রুতি, স্মৃতি, জৈমিনীসূত্র, যাজ্ঞবল্ক্যর শ্লোক, গীতা, পুরাণ, বেদান্ত প্রভৃতির সহজ ব্যাখ্যা তিনি সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে আরবি-ফারসি শিক্ষা সম্পূর্ণ করায় সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাকে বারাণসী পাঠানো হল। মাত্র ১৪ বছর বয়সের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের যুগে মাত্র ১৬ বছর বয়সে 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী' লিখে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা সহ অসারতার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। এছাড়াও রুমি ও হাফিজের কাব্য, আরবী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁকে নিয়ে সমাজে, গ্রামে, গৃহে মাতব্বর ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি ঘুরতে ঘুরতে দুর্গম হিমালয় লঙ্ঘন করে তিব্বতে পৌঁছে সেখানে দু'বছর অধিষ্ঠান করেন। সেখানে বিশদে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পাশাপাশি মঠ ও লামাতন্ত্রের কায়েমি স্বার্থ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা করেন। ফলে তাঁর জীবন সংশয় উপস্থিত হয়। কয়েকজন কোমলহৃদয়া তিব্বতী নারীর সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করে কোনক্রমে ফিরে আসতে পারেন। তিনি নারীজাতির প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সারা জীবন তাদের অধিকার নিয়ে কাজ করে গেছেন।

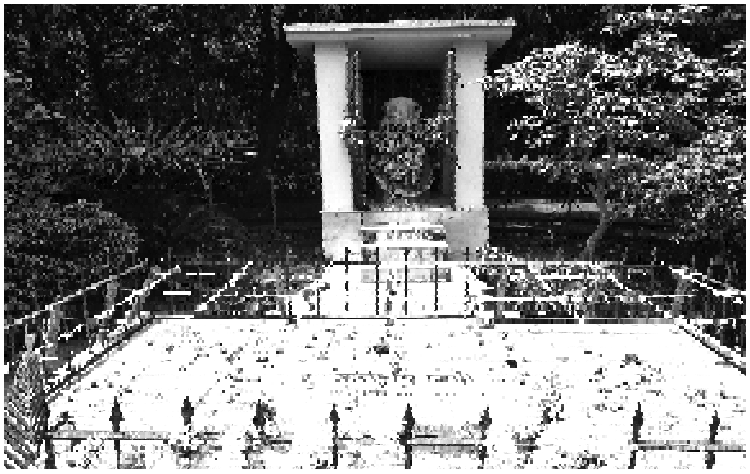

রঘুনাথপুর শ্মশানে রামমোহনের নিজ বাটির উদ্যান

এরপর কয়েকটি রাজ্য ঘুরে ১৭৯২-তে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ নিয়ে গোঁড়া পরিবারের সাথে বিরোধ, সমাজের মাতব্বরদের সাথে দ্বন্দ্ব এবং সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের কারণে ১৭৯৭-এ কলকাতায় তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে চলে আসেন। কিন্তু তাঁর নিজ জন্মভূমিতে থাকার জেদ থেকে তাঁর পরিবার ও সমাজ তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। রাধানগরের রঘুনাথপুর শ্মশানে তিনি ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে নিজগৃহ নির্মাণ করেন যেখানে তাঁর পরিবার থাকত এবং তিনি গ্রামে এলে সেখানেই থাকতেন। জমিদারির আয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় তিনি ব্রিটিশদের কাছে মহাজনী ব্যবসা করে আয় শুরু করেন। এইসময় উইলিয়াম কেরি, হরিহরানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও তিনি মিলে 'মহানির্বাণতন্ত্র' নামক একেশ্বরবাদী (Uniterian) ধর্মতত্ত্বের উপর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৭৯৯-এ আবার বেরিয়ে পড়ে পাটনা, বারাণসী প্রভৃতি ভ্রমণ করেন এবং ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আরও বিশদে অধ্যয়ন করেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের মুক্তচিন্তা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্রীক গণিতবিদ ইউক্লিড ও দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কাজও তাঁকে আকৃষ্ট করে। বহু ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তন্ত্রশাস্ত্র ও জৈনধর্ম নিয়েও অধ্যয়ন করেন। খরচ চালানোর জন্য বারাণসীর ব্রিটিশ কমিশনারের অফিসে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে করণিকের কাজ করেন। ১৮০৩ ও '০৪-এ ঢাকা-জালালপুর (ফরিদপুর) ও মুর্শিদাবাদে কোম্পানির প্রতিনিধি টমাস উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং ওই সময়েই আরবি ভূমিকায় ফারসিতে লেখা 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন' (জ্ঞানের সন্ধান) রচনা করে একেশ্বরবাদ প্রচার করতে থাকেন।

এরপর কোম্পানির কালেক্টর প্রগতিশীল জন ডিগবির সহকারি হিসাবে ১৮০৫ থেকে ১৮১৪ অবধি ঢাকা, ভাগলপুর ও রংপুরে কর্মরত ছিলেন এবং দেশের ভূসম্পর্ক, কৃষি ও কর ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঐ সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু হলে তার তিন পত্নীর মধ্যম পত্নী অলকমঞ্জরী দেবীকে সহমরণে বাধ্য করা হয়। রামমোহন অনেক চেষ্টা করেও প্রতিহত করতে না পেরে সতীদাহ প্রথা বন্ধের উদ্যোগ শুরু করেন। ১৮১৫-তে ভূটান রাজার অনুরোধে কোচবিহার-ভূটান সীমান্ত বিরোধ মেটানোর দায়িত্ব পালন করেন। ঐ বছরেই তাঁর কলকাতার মানিকতলার বাড়িতে দার্শনিক আলোচনার ও তর্কের কেন্দ্র 'আত্মীয় সভা' (বন্ধু সম্মেলন) স্থাপিত হয়ে বিদ্বোৎ সমাজে আলোড়ন তৈরি হয়। লেখেন বাংলা ভাষার প্রথম গদ্য 'বেদান্তসার'।

১৮১৬ তে লেখেন 'কেনোপনিষৎ' ও 'ঈশোপনিষৎ' এবং এই দুটি ও 'বেদান্তসারে'-র ইংরাজি অনুবাদ করেন। ওই বছরেই

হেদুয়ার কাছে শুঁড়িপাড়ায় একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। যার ছাত্র সংখ্যা ছিল ১০০। ১৮১৭-তে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ার প্রমুখের সাথে 'ক্যালকাটা বুক সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি বাংলা ও ইংরেজিতে ভূগোল গ্রন্থ ও একটি মহাকাশবিজ্ঞান গ্রন্থ 'খগোল' লিখে দেন। তিনি জাতি ও ধর্মচ্যুত হয়েছেন এই অভিযোগে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা তাঁর মায়ের সহযোগিতায় তাঁকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার মোকদ্দমা রুজু করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইডে ইস্টকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা আজ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলা ও ইংরেজিতে 'কঠোপনিষৎ' ও 'মান্ডুক্যোপনিষৎ' অনুবাদ করেন। রামমোহনের অসাধারণ কৃতিত্ব সনাতন হিন্দু ধর্মের কঠোর উচ্চবর্ণের পুরুষতান্ত্রিক পবিত্র শ্রুতি পরম্পরা ভেঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রকে লিখিতরূপে বিভিন্ন ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজরূপে প্রকাশ করা এবং নারী ও শূদ্রদের ধর্মীয় সমানাধিকারের দাবি তুলে ধরা। তিনি ধর্মকে বিচ্ছিন্ন বিমূর্ততা, বাহুল্য ও জাঁকজমকপূর্ণতা থেকে কর্মমুখর সমাজ জীবনের স্বাভাবিক অংশীদার করে তুলেছিলেন।

অলকমঞ্জরী দেবীর সতীদাহ বেদী

১৮১৮ থেকে রামমোহন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, আলোচনা সভায় সতীদাহ নিবারণের আহ্বান জানালেন। শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে মানুষকে বুঝিয়ে এই প্রথা বন্ধের আর্জি জানান। বিপরীতে সমাজের মাতব্বর পুরোহিত এমনকি পণ্ডিতরা একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ, চরিত্র হনন, এমনকি তাঁকে শারীরিক আক্রমণ শুরু করেন। অবিচল তিনি তখন শাস্ত্র ঘেঁটে শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে রচনা করেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ'। অচিরে পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন। গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ সহজ সরল ভাষায় লিখে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮১৯-এ লেখেন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ।' পরে সহমরণ নিবারণ বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'সহমরণ বিষয়ক' (১৮২৯)। এছাড়াও বিভিন্ন সভা সমিতি পত্রিকায় বক্তৃতা, আলোচনা, বিতর্ক, প্রবন্ধ রচনা চালিয়ে গেছেন।

১৮২০-তে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট থেকে যিশু খ্রিষ্টের বিবিধ উপদেশ সংকলন করে লেখেন 'Precepts of Jesus-Guide to peace and happiness।' ৮২ পাতার বইটি শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির উপর মার্শম্যানের সমালোচনার জবাবে লেখেন 'An Appeal to the Christian Public'। তাঁর একেশ্বরবাদ পাদ্রীদের প্রচলিত ত্রিতত্ত্ব (Trinity) ভাষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের ত্রিরূপ (পিতা, শিশুপুত্র ও পবিত্র আত্মা) ধারণার মূলে আঘাত করেছিল। ১৮২১-এ লেখেন 'Second Appeal to the Christian Public in defence of the Precepts of Jesus'। একেশ্বরবাদী ভাবধারায় ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, পাদরি অ্যাডামস্‌দের নিয়ে তৈরি করেন 'কলিকাতা ইউনিটেরিয়ান কমিটি।' এত বছর পর তাঁর বিরুদ্ধে চলা শরিকি মোকদ্দমাগুলি সুপ্রীম কোর্টে খারিজ হয়ে যায়। তাঁকেই আবার মোকদ্দমাকারী ভ্রাতুষ্পুত্রের চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হয়। ১৮২১-এ রামমোহনের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়ে রাজ্যের ও দেশের সংবাদজগতের ক্ষেত্রে এক মাইলফলক স্থাপিত করে। এরপর অবাংলাভাষী পাঠকদের জন্য তখনকার সরকারি ভাষা ফারসিতে ১৮২২ থেকে বের করতে থাকেন 'মিরাত-উল-আখবার' (জ্ঞানের দর্পণ) পত্রিকা।

১৮২২-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল'। সমাজে বিধবা ও কন্যা সন্তানদের প্রবল বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বামীর ও পিতৃ সম্পত্তিতে তাদের সমান অধিকারের দাবিতে শাস্ত্র ঘেঁটে যুক্তি জাল বেছান। লেখেন 'Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo law of inheritance' যা তাঁর মৃত্যুর ১৩৪ বছর পরে ১৯৫৬-তে আমাদের দেশে কার্যকর হয়। ১৮২৩-এ ব্রিটিশ শাসকদের জারি করা কঠোর প্রেস অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র পাঠান যা পরাধীন ভারতে অধিকার রক্ষায় ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাঁর লেখা খ্রিষ্ট বিরোধী এই অজুহাত দেখিয়ে পাদরিরা যখন কোন প্রেসকে ছাপতে দিচ্ছিল না তখন নিজেই তৈরি করলেন 'ইউনিটেরিয়ান প্রেস' এবং সমগ্র খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন 'Final Appeal to the Christian Public'। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গর্ভনর জেনারেল লর্ড আর্মহার্ষ্টকে দীর্ঘ পত্র দিলেন। ১৮২৪-এ দাক্ষিণাত্যের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কৃষকদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। ১৮২৪-২৫ জুড়ে লিখলেন একের পর এক সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ। ১৮২৬-এ সংস্কৃত ও বাংলায় বেদান্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'বেদান্ত কলেজ' স্থাপন করলেন।

১৮২৮-এ বিভেদধর্মী জুরি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে যে 'কর্মাশিয়াল অ্যান্ড প্যাট্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল তার যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন। জোড়াসাঁকোর ২২৮ আপার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িভাড়া নিয়ে 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করলেন যা 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হল। তাঁর পৌরহিত্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। ব্রাহ্মসমাজের জন্য ব্রহ্ম উপাসনা

সঙ্গীত রচনা করলেন ও সুর দিলেন। রবীন্দ্র ভাষায় এই 'মহা ঋত্বিক' ইসলাম, হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্ম ঘেঁটে তার যাবতীয় অপব্যাখ্যা, পুরোহিত সম্প্রদায় সৃষ্ট নানাবিধ কুআচার ও অনাচার সরিয়ে এক একেশ্বরবাদী বাহুল্যবর্জিত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর এক, নিরাকার, পরম ব্রহ্ম। এর পক্ষে তিনি একের পর এক প্রবন্ধ ও পুস্তক ধর্মশাস্ত্রের যুক্তিজাল বিছিয়ে বিভিন্ন ভাষায় রচনা ও অনুবাদ করেন। পাশাপাশি তিনি 'ইউনিভার্সাল রিলিজিয়নে'র ধারণা পেশ করেন এবং ধর্মাচরণের জোয়াল থেকে সমাজ ও কর্মকে মুক্ত করতে ও মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক গঠনে উদ্যোগী হন। ১৮১৫ থেকে তাঁর মানিকতলা ও সিমলার গৃহে এই উদ্যোগের সাথে শিবপ্রসাদ মিশ্র, গোবিন্দ মাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হলধর বসু, রাজনারায়ণ সেন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি যুক্ত হন। সমসময়ে কবি ও শিক্ষাবিদ লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-'৩১) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলন শুরু করেন।

সতীদাহ নিবারণের বিষয়ে গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের সাথে আলোচনা চালিয়ে তাঁকে বোঝাতে সক্ষম হলেন। ১৮২৯-এ ঐতিহাসিক 'সতীদাহ নিবারণী আইন' পাশ হল। কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিপরীতে মুক্ত বাণিজ্যের, চীন ও ভারতের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা পুস্তিকা 'A View of the Present State and Future Prospects of the Free Trade and Colonization of India'। ১৮৩০-এ চিৎপুরে ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব ভবন তৈরি হল। আলেকজান্ডার ডাফকে সঙ্গে নিয়ে তৈরি করলেন 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন' যা পরবর্তিতে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত হয়।

ব্রিস্টল শহরে রামমোহনের মূর্তি

দিল্লির তৎকালীন মোঘল বাদশা দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-'৩৭) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি বর্দ্ধিত করে ১৮ লক্ষ করার জন্য ইংল্যান্ডের রাজার কাছে তদ্বির করার উদ্দেশ্যে রামমোহনকে উপযুক্ত পাত্র মনে করেন এবং তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বিশেষ দূত হিসাবে ১৮৩০-এ ইংল্যান্ডে পাঠান। রামমোহনের ইংল্যান্ডে যাওয়ার আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ প্রথা পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীলরা 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করে, তহবিল গঠন করে, বহু মানুষের স্বাক্ষর নিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি ফ্রান্সিস বেথির মাধ্যমে ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন পাঠিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে এর বিরুদ্ধে সওয়াল করা। ১৮৩০-র ২১ অক্টোবর সরকারের অনুমতি পেয়ে ১৫ নভেম্বর প্রথমে কলিকাতা থেকে 'ফর্বস্' স্টিমারে খেজুরিতে পৌঁছে, সেখানে এক রাত্রি স্থানীয় পোষ্ট অফিসে কাটিয়ে 'অ্যালবিয়ন' জাহাজে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে ছিলেন পালিত পুত্র রাজারাম বা শেখ বকসু, পাচক রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও ভৃত্য রামহরি দাস। ১৮৩১-র প্রথম দিকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের কেপ টাউনে অবতরণ করেন এবং কাছাকাছি জায়গাগুলি ভ্রমণ করেন। কেপ টাউনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে আর্থিক সাহায্য করেন। ফেরার পথে জাহাজে ওঠার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে তাঁর পা ভেঙ্গে যায় যার জন্য তিনি আমৃত্যু কষ্ট পেয়েছেন।

১৮৩১-র ৮ এপ্রিল লিভারপুল বন্দরে পৌঁছে নতুন চালু হওয়া ট্রেনে করে ম্যাঞ্চেস্টার শহরে পৌঁছন। সেখানে তাঁকে দেখতে বিপুল জনসমাগম হয়। শ্রমিকদের ভিড় সামলাতে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। তারপর লিভারপুল হয়ে লন্ডনে পৌঁছন। সেই রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে প্রথিতযশা দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম চলে আসেন। দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ইতিহাস ও শিক্ষাবিদ লর্ড মেকলে। রামমোহনের লেখা ও কাজকে পাশ্চাত্যে আগে থাকতেই পরিচিত করেছিলেন তাঁর অনুরাগী সাংবাদিক জেমস বাকিংহাম ও জেমস পেগস। ১৮৩১-র ৫ জুলাই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রামমোহনকে সম্বর্ধনা দেয় এবং তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করে। ১৯ আগস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর ও ২৮ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের হাউস অফ কমনস্ নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহন 'ভারতের রাজস্ব ব্যবস্থা', 'আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি ভাষার ব্যবহার', 'ভারতীয়দের বিচার ব্যবস্থায় উচ্চপদে নিয়োগ', 'ভারতীয় জনগণের অবস্থা' প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং সওয়াল করেন। এরপর তিনি ফ্রান্স ভ্রমণের আবেদন জানান। তিনি পাশপোর্ট প্রথা তুলে

দেওয়ার ও আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রপুঞ্জ জাতীয় সংস্থার প্রস্তাব দিয়ে ইন্ডিয়া বোর্ড সেক্রেটারির কাছে চিঠি লেখেন। ১৮৩২ এর ১৮ জুন নতুন জুরি বিলে রামমোহনের অনেকগুলি দাবি গৃহীত হয়। রামমোহন ইউরোপীয়ানদের ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুপারিশ করে লেখেন 'Remarks on settlement in India by Europeans'। তিনি মনে করতেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক একাধিপত্য অপশাসনের কারণ। তাই তিনি এই একাধিপত্য ভেঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের কথা বলেছেন। ভারতে ইউরোপীদের স্থায়ীভাবে থাকার কথা বলেছেন। ভারতকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মত স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের ধারণা দিয়েছেন। ইংল্যান্ডে রামমোহনের আগমনে রেভারেণ্ড ডি. ডেভিশন প্রমুখ 'ইউনিটেরিয়ান' খ্রিস্টধর্মের প্রবক্তারা খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। বিশিষ্ট অভিনেত্রী ফ্যানি কেম্বল, সমাজসেবী মিস কিডেল, মিস কাসেল প্রমুখেরা রামমোহনের চিন্তাধারার অনুরাগী হয়ে ওঠেন। বিশিষ্ট দার্শনিক রবার্ট ওয়েনের সাথে রামমোহনের তর্ক যুদ্ধ হয়েছিল। সখ্য গড়ে উঠেছিল বিশিষ্ট পণ্ডিত উইলিয়াম রস্কো, সংবাদপত্র সম্পাদক জন বাউরিং প্রমুখের সাথে। তাঁর যুক্তিবাদী দর্শন ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন তোলে।

ব্রিস্টল শহরে রামমোহনের সমাধি

১৮৩২-র সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ফ্রান্স পৌঁছলেন। বিশিষ্ট দার্শনিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদরা তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। রাজা লুই ফিলিপ, কবি টমাস ম্যুর প্রমুখের সাথে সাক্ষাত হয় এবং তাঁর সম্মানে বেশ কয়েকটি ভোজসভার আয়োজন হয়। তাঁর পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, উন্নত চিন্তাভাবনায় এই আধুনিক মেধাবী মানুষটি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের গুণীজনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেন। ১৯৩৩-এ ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। ওই বছর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাঁর লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' প্রকাশিত হয়। ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ চালুর 'ধর্মসভা'র আবেদন বাতিল হয়ে যায়। সার্থক হয় রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের। তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগমথিত সওয়াল এই মহান জয় এনে দেয়। ওই বছরেই ইষ্ট ইন্ডিয়া বিল-এর সংস্কার অনুমোদিত হয় যাতে ব্রিটিশ সংসদে সাধারণ নাগরিকদের ভোটদান সুনিশ্চিত হয়। ভারতের বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধির দৌত্যও সফল হয়। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ বাদশার বার্ষিক বৃত্তি আরও তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে। এরপর তিনি সুহৃদ ও গুণগ্রাহীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্রাচ্য জ্ঞানের আকর পারস্য ও তুরস্ক ভ্রমণেরও পরিকল্পনা ছিল। অন্যদিকে কলকাতা ও লন্ডনে তাঁর ব্যাঙ্কার ম্যাকিনটোস অ্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে পড়ায় রামমোহন প্রবল অর্থসঙ্কটে পড়েন। তিনি তখন দেশে ফেরা মনস্থ করে ব্রিস্টলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শ্রান্ত অসুস্থ অবস্থায় সেখানে গুণগ্রাহী বন্ধু রেভারেন্ড ডাঃ ল্যান্ট কার্পেন্টারের স্টেপলটন গ্রোভের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী কন্যা মারি কার্পেন্টার এবং রামমোহনের সুহৃদ ডেভিড হেয়ারের ভগিনী তাঁর শুশ্রষা করেন। রামমোহনের সঙ্গে আলাপে মুগ্ধ মারি কার্পেন্টার পরে সমাজসেবার কাজে ভারতে চলে আসেন। তিনি রামমোহনের জীবনী লিখেছিলেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জন বিশপ এস্টলিন রামমোহনের চিকিৎসা শুরু করেন।

১৮৩৩-র ১১ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টল শহরের গণ্যমান্যরা রামমোহনের সম্মানে একটি বড় সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় টানা সাড়ে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে রামমোহন বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চমৎকৃত করেন। কিন্তু এরপর তাঁর অসুস্থতা বেড়ে চলে। জ্বর কিছুতে কমে না। ১৮৩৩-এর ২৭ সেপ্টেম্বর রাত দুটো বেজে পঁচিশে ৬১ বছর বয়সে ভারত-আত্মা, ভারত-পথিক, ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়কারী, দার্শনিক, পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ রামমোহন রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্তে মস্তিষ্কের প্রদাহ বা মেনিনজাইটিস ধরা পড়ে। রামমোহনের দেহকে প্রথমে সমাধিস্থ করা হয়েছিল স্টেপলটন গ্রোভের প্রাঙ্গণে। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে এসে আর্নোজ ভেলে রামমোহনের সমাধি স্থানান্তরিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছতে না পারলেও সেখানে ইউনেটেরিয়ান আন্দোলন এবং দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনে রামমোহনের চিন্তা ও কাজ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

এই সত্য সন্ধানী অগ্রদূতের সম্পর্কে প্রাথমিক অধ্যয়ন করে দেখা গেছে তিনি একটি জীবনে বহু কিছু করেছেন এবং দেশের মধ্যে বহু বিষয়েই ছিলেন পথিকৃত। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের যুগ প্রবর্তক, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার পুণরুদ্ধারকারী আবার আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রবর্তক। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাতাবরণের মধ্যে তিনি ছিলেন আপোষহীন এক ভারতীয় অভিযাত্রী, সমাজ সংস্কারের অগ্রপথিক, শিক্ষায় নব জাগরণের পুরোধা। তিনি বাংলা ভাষার আধুনিক গদ্য রীতি ও ব্যাকরণের স্রষ্টা, নতুন একেশ্বরবাদী মানবিক ব্রাহ্মধর্মের সূচনাকারী, বিচার ব্যবস্থার ভারতীয়করণের হোতা। বাংলার সর্বপ্রথম নারীবাদী পুরুষ যিনি নারীর আধিকার রক্ষায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। সতীদাহ রদ ছাড়াও তিনি বহু বিবাহ, কন্যা বিক্রয়, কন্যা পণ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। স্ত্রী ও কন্যাদের স্বামীর ও পিতার সম্পত্তির অধিকার নিয়ে লড়েছেন। বিধবাদের কষ্ট লাঘবের জন্য ধনভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। কৃষকদের দুর্দশার সমব্যথী ছিলেন। প্রজারঞ্জক ভূমি, রাজস্ব ও কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে প্রস্তাব দেন। কৃষক ও মালঙ্গিদের লবণ আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। কৃষকদের আত্মনির্ভরতার জন্য তাদের জন্য জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলেন। রায়তদের উন্নতি ও উন্নত প্রশাসনের কথা ভেবেছিলেন। কৃষি অর্থনীতি ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভাবনার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রদূত। নাগরিক অধিকার, নির্ভীক সাংবাদিকতা, জাতিপুঞ্জ গঠন প্রভৃতি ধারণাও তিনি দুশো বছর আগে রেখে গেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এই পথিকৃত উদারতাবাদী (Liberal) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে উৎখাত করে স্বাধীনতার কথা বলেননি, বলা হয়তো সম্ভবত ছিল না সেইসময়ে অথবা ধারণাটিই তখন তৈরি হয়নি। কিন্তু কোম্পানির একাধিপত্য ও অপশাসনের বিরুদ্ধে বলেছেন। ভারত-ব্রিটেন সুসম্পর্ক এবং ভারতের আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ও প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়াসী ছিলেন।

এছাড়াও তিনি ছিলেন জ্ঞান পিপাসু, উদারতাবাদী, বিশ্বমানবিক, সাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, পর্যটক, সম্পাদক অনেক কিছুই। রামমোহন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজি, ফরাসি, হিন্দি ও বাংলা এগারটি ভাষায় নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। এই অপ্রমত্ত সত্যসন্ধানী প্রতিটি ধর্মের মূলগ্রন্থগুলি পড়ার জন্য বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার উপর মনোযোগী হন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিন্দাকে মুকুট বলে অলংকৃত করেছিলেন। রামমোহনের পরবর্তী অপর বাঙালী মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অজস্র গুণাবলী ও কৃতিত্বের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর অসামান্য পুরুষকারকে সর্বাপেক্ষা সেরা গুণ হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন সেরকমই 'চারিত্রপূজা' প্রবন্ধে রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। "...নিজের মহত্বে তাঁহার কী অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল!" রমা র‍্যাঁলা থেকে জওহরলাল নেহরু, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রামমোহনের অসাধারণ অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে জানিয়েছেন। লণ্ডনের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি তাঁকে বলেছেন, 'Apostle of the East'। তাই তাঁর জন্মের সার্ধ দ্বিশতবার্ষিকিতে কায়েমী প্রতিষ্ঠান তাঁকে যতই অবজ্ঞা করুক, অশিক্ষা-কুশিক্ষা-কূপমণ্ডুকতা তাঁর মহতী কীর্তি সতীদাহ নিবারণকে শূকরের খোঁয়াড়ে যতই নিক্ষেপ করুক, শিক্ষিত দেশপ্রেমী মানবতাবাদী প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁর অবদান অক্ষয়। আসুন সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের এই গভীর তমসার কালে—তাঁর সৃষ্ট আলোকবর্তিকার প্রজ্জ্বলনে আমরা এগোনোর পথ খুঁজে পাই। তাঁর জন্মের সার্ধ দ্বিশতবর্ষে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

রাধানগরে রামমোহনের পৈতৃক বাড়িটি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে পুনর্গঠিত করেন রামমোহনের দৌহিত্রী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবী। রামমোহনের জন্মবেদীটি স্থাপন করেন ভারতপ্রেমী রেভারেণ্ড জেমস লং। 'রামমোহন স্মৃতি রক্ষা কমিটি'এর বিপরীত দিকে ইংল্যাণ্ডের ব্রিষ্টলের তাঁর সমাধিস্থলের আদলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। সমগ্র প্রাঙ্গণটি ২০২২-এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে। রঘুনাথপুর শ্মশানে রামমোহনের গৃহের ভগ্নাবশেষ, সংশ্লিষ্ট আমবাগান এবং অলকমঞ্জরী দেবীর সতীদাস স্থল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন হুগলী জেলা পরিষদ।

তথ্যসূত্র:

- Raja Rammohan Ray: An Apostle of India Awaking (3 Vol.)—S.K. Sharma
- The life and letters of Raja Rammohan Ray—Sophia Dobson Collet
- Rammohan on Indian Economy—Susovan C. Sarkar
- A Lecture on the Life & Labours of Rammohan Ray—William Adam
- Rammohan Ray: A critical biography—Amiyo Sen
- Biography of Raja Rammohan Ray—D.C. Vyas
- Rammohan Ray: The Era of Socio Economic Reforms—Dr. Sangh Mitra
- Raja Rammohan Ray—S. Golrani & S. Ram
- The Making of Modern India—N.K. Raghaban
- Raja Rammohan Ray—Kalyani Mukherjee
- Selected Works of Raja Rammohan Roy–Ed. Kalidas Nag & Debjyoti Burman
- Autographed letter of Ramaprasad Ray to John Bowring (1852)
- Rammohan Ray and the Process of Modernization in India—Ed. V.C. Joshi
- On Rammohan Ray—R. C. Majumder
- Rammohan Ray 'The Making of Victorian Britain—Lyrn Zastaupil
- The Last Days in English of the Raja Rammohan Ray—Mary Carpenter
- রামমোহন রায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

- ভারতপথিক রামমোহন রায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- রাজা রামমোহন রায়—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- সতী—ডঃ স্বপন বসু
- রামমোহন: বিচিত্র ব্যক্তিত্ব—উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
- রামমোহন রচনাবলী—হরফ প্রকাশনী
- বিশ্বপথিক রামমোহন—ডঃ পরেশচন্দ্র দাস
- রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা—রণজিৎ গুহ
- যুগগুরু রামমোহন—ক্ষিতিমোহন সেন
- আবার রামমোহন—পার্থ চট্টোপাধ্যায়
- রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
- রামমোহন সমীক্ষা—দিলীপ কুমার বিশ্বাস
- 'পান্থজন' পত্রিকা, ভারত-আত্মা রামমোহন সংখ্যা
- অপ্রমত্ত সত্যসন্ধানী—মল্লারিকা সিংহ রায়
- পথিকৃৎ রামমোহন—সুদেব মাল
- ভারতের প্রথম 'লিবারাল'—ছন্দক সেনগুপ্ত
- সার্ধ দ্বিশতবর্ষ রামমোহন রায়: মানবতাবাদের বিশ্বনেতা—অমিত দাস
- ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—অরণি সেন, সম্পাদনা: দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
- প্রথম আলো : দেশ—রামমোহন সংখ্যা, ১৭ মে ২০২২

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : বাসুদেব বসু, সম্পাদক, রাধানগর পল্লী সমিতি

২০২২-র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

উত্তরপ্রদেশ

●১) মোট আসন: ৪০৩, প্রদেয় ভোট: ৬০.৭৯%, জয়ী: বিজেপি জোট

* বিজেপি জোট : ২৭৩ আসন (বিজেপি ২৫৫, আপনা দল (সোনেলাল) ১২, নিষাদ পার্টি ৬)
  প্রাপ্ত ভোট ৪৫% গতবারের চাইতে ৪৮টি আসন কম
* সমাজবাদী জোট: ১২৫ আসন (সমাজবাদী পার্টি ১১১, রাষ্ট্রীয় লোক দল ৮, সুহেলদেব ভারতীয় সমাজপার্টি ৬)
  প্রাপ্ত ভোট ৩৬%, গতবারের চাইতে ৭৩টি আসন বেশি
* জাতীয় কংগ্রেস: ২টি আসন (২% ভোট), গতবারের চাইতে একটি আসন কম
* বহুজন সমাজ পার্টি: ১টি আসন (১৩% ভোট), গতবারের চাইতে ১৩টি আসন কম
* জনসত্ত্বা দল (লোকতান্ত্রিক): ২টি আসন (০.২১% ভোট)
* ভোট প্রাপ্তি: (এ.আই.এম.আই.এম.০.৪১%, আম আদমি পার্টি ০.৩৮%, সিপিআই ০.০৭%)

পাঞ্জাব

●২) মোট আসন: ১১৭, প্রদেয় ভোট: ৭১.৯৫%, জয়ী: আম আদমি পার্টি (এএপি)

* আম আদমি পার্টি: ৯২ আসন (৪২% ভোট), গতবারের চাইতে ৭২টি আসন বেশি
* জাতীয় কংগ্রেস: ১৮ (২৩%), গতবারের চাইতে ৫৯টি আসন কম
* শিরোমণি অকালি দল: ৩ (১৮%), গতবারের চাইতে ১২টি আসন কম
* বহুজন সমাজ পার্টি: ১ (২%), গতবারের চাইতে ১টি আসন বেশি
* ভারতীয় জনতা পার্টি: ২ (৭%), গতবারের চাইতে ১টি আসন কম

উত্তরাখন্ড

●৩) মোট আসন: ৭০, প্রদেয় ভোট: ৬০%, জয়ী: বি.জে.পি.

* বিজেপি: ৪৮ আসন (৪৫%), গতবারের চাইতে ৯টি আসন কম
* কংগ্রেস: ১৮ আসন (৩৮%), গতবারের চাইতে ৭টি আসন বেশি
* বিএসপি: ২ আসন (৫%), গতবারের চাইতে ২টি আসন বেশি
* আপ: কোন আসন পায়নি (৩.৪% ভোট)
* অন্যান্য: কোন আসন পায়নি (৮.৭%ভোট)

জনস্বাস্থ্য

কোভিড-১৯ সংক্রমণ, অতিমারি ও শিশুস্বাস্থ্য

অরুণালোক ভট্টাচার্য্য

কোভিড-১৯ ও শিশুরা, এই আলোচনা করার আগে, দুটো জিনিস বলে নেওয়া দরকার। শিশু বলতে সদ্যোজাত থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ কিনা, শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনকালের প্রারম্ভিক সময়কালকেই গণ্য করা হবে। কোভিড-১৯ এর আলোচনা করতে গেলে, অন্যান্য রোগের সঙ্গে এর মূল বিষয়গত ফারাকটা বুঝতে হবে। কোভিড-১৯ এর আলোচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই জড়িয়ে থাকবে, মহামারির প্রসঙ্গ। প্রথমতঃ আমাদের দেখা অন্যান্য অতিমারি, যেমন ধরা যাক- এইডস অতিমারির সঙ্গে এর চরিত্রগত পার্থক্য আছে। প্রায় একশো বছর আগের ফ্লু অতিমারির সঙ্গে, এর কিছুটা হলেও মিল আছে। দ্বিতীয়তঃ, বুঝতে হবে, আমরা অতিমারির কোন পর্যায়ে এসে, এই আলোচনা করছি। অতিমারির একদম প্রাথমিক অবস্থায় এই ভাইরাসটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝতে পারলাম যে এই ভাইরাস এর সংক্রমণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে যতটা ভয়ানক আকার ধারণ করে, শিশুদের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা নয়। এমনকি নভেল করোনা ভাইরাস এর বিভিন্ন বৈকল্পিক রূপও শিশুদের সংক্রমণের ক্ষেত্রে অতটা তীব্র আকার ধারণ করছে না। অতিমারি শুরু হওয়ার প্রায় আড়াই বছর পরে, আজ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের সেরো-সার্ভে করা হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে, তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ কোভিড এন্টিবডি মজুদ রয়েছে। অথচ পরিসংখ্যান অনুযায়ী অত শিশু তো সংক্রমিতই হয় নি। ভ্যাকসিন নেওয়ার তো প্রশ্নই নেই। তাহলে এই এন্টিবডি এলো কোথা থেকে? তাহলে ধরে নিতে হবে, অধিকাংশ শিশুরাই সংক্রমিত হয়ে গেছে। সে মৃদু উপসর্গ নিয়েই হোক বা উপসর্গবিহীন যাই হোক না কেন।

শিশুদের কোভিড-১৯ সংক্রমণ-আলোচনাটি কয়েকটি শিরোনামে করা যেতে পারে-

১) শিশুদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের উপসর্গ ও লক্ষণ।
২) অতিমারিতে শিশুদের সার্বিক শারীরিক স্বাস্থ্য।
৩) সামাজিক সঙ্কট ও শিশুস্বাস্থ্য।
৪) কোভিড-১৯ ও শিশুদের জীবনদায়ী ভ্যাকসিন।

(১) শিশুদের কোভিড- ১৯ সংক্রমণের উপসর্গ ও লক্ষণ-

ভাগ্যক্রমে শিশুদের উপসর্গগুলি,বড়দের তুলনায় খুবই মৃদু বা অল্প। সাধারণত সর্দি, জ্বর, নাক দিয়ে জল পড়া, হালকা কাশি। উপসর্গগুলি অন্যান্য ভাইরাস সংক্রমণের থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগেই এই ভাইরাস এর যত কারিকুরি। শিশুদের ফুসফুসে সংক্রমণ বা ফুসফুসকে ক্ষতি করার ক্ষমতা তার খুব একটা কিছু নেই। আসলে যে রিসেপ্টরের দরজা খুলে, ভাইরাসটির মনুষ্যকোষে প্রবেশ, সেই ACE রিসেপ্টর গুলির সংখ্যা, শিশুর ফুসফুসে অতি নগণ্য। অবশ্য যদি শিশুটির আগে থেকে কোনো আনুষঙ্গিক রোগ বা কো-মরবিডিটি কিছু থেকে থাকে, সে ক্ষেত্রে সংক্রমণের তীব্রতা বাড়তেই পারে। সে অবশ্য যে কোনো ভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ছাড়াও কিছু কিছু শিশুদের পেট খারাপ এবং হজমজনিত সমস্যা কোভিড-১৯ সংক্রমণের জন্য হতে পারে। যদিও সেই সংক্রমণের তীব্রতা রোটা ভাইরাস বা কলেরা সংক্রমণের মতো অতটা নয়।

এবার একটু পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক-

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে যত মানুষ ওই সময়ের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছেন, তার শতকরা ১.৮ ভাগ ০-থেকে ৫ বছর বয়স্ক শিশু। বাকি ৫ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ৬.২ শতাংশ এবং ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে ১৪.৩ শতাংশ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সংক্রমণের হারও বেড়েছে। ০ থেকে ২৪ বছর বয়স্কদের মধ্যে, মৃত্যুর হার, সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগে মোট মৃত্যুর মাত্রই ০.৫ শতাংশ বা তার থেকেও একটু কম।

তবে কি শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই কম সংক্রমণ প্রবণ? এই প্রশ্নের কোনো চট-জলদি উত্তর দেওয়া মুশিল। শিশুদের শরীরের ACE রিসেপ্টরের ব্যাপারটি আগেই বলেছি। এছাড়াও সংক্রমণ-প্রবণতা অনেকগুলো কারণের উপর নির্ভরশীল। যেমন ধরুন শারীরিক পুষ্টি এবং জন্মগত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। কোন পরিবেশে শিশুটি রয়েছে। বাড়ির বাইরে তার গতিবিধি কিরকম। যে জায়গায় শিশুটি রয়েছে, তার জনঘনত্ব কিরকম। সেখানকার মানুষজনের মধ্যে, কোভিড-১৯ -বিধি মেনে চলার প্রবণতাই বা কিরকম। সেই জায়গায় গোষ্ঠী-সংক্রমণের কি অবস্থা ইত্যাদি।

এ ছাড়াও, অতিমারির যে পর্যায়ে এইসব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, সেই সময়ে, শিশুটির শরীরে এন্টিবডির পরিমাণ কতটা, তার উপরেও তার সংক্রমণের তীব্রতা কিছুটা হলেও পরিবর্তনশীল। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটা জিনিস বলে নেওয়া দরকার যে, নবজাতক অর্থাৎ জন্মের পর থেকে এক মাস সময়কাল পর্যন্ত শিশুদের মধ্যেও কিন্তু কোভিড-১৯ এর জীবাণু পাওয়া গেছে। কিন্তু, তাদের উপসর্গগুলি বয়স্ক-শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় আরও নগন্য। তাহলে প্রশ্ন হলো যে শিশুদের কোভিড-১৯ সংক্রমণে কি আদৌ কোনোরকম জীবনসংশয়মূলক জটিলতা হয় না? হয় বৈকি! খুব বিরল ক্ষেত্রে, কোনও কোনও শিশু মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম নামে একটি রোগে আক্রান্ত হয়। এটিকে ঠিক রোগ না বলে, কিছু উপসর্গের সমাহার বা সিনড্রোম বলাই ভালো। নাম শুনেই মালুম হয় যে

শরীরে বিভিন্ন অর্গান বা যন্ত্রে কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরে এক প্রদাহজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই প্রদাহর জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে, শিশুটির জ্বর, চোখ লাল, গায়ে ঘামাচির মতো রাশ, পেট ব্যাথা, পেট খারাপ, হার্ট এর সমস্যা, রক্তচাপ কমে যাওয়া, এমনকি শকজনিত কারণে জীবনসংশয়ও ঘটতে পারে।

কোভিড এর প্রলম্বিত প্রভাব বা লং কোভিড-১৯ নিয়ে, এখনো চিকিৎসককূল যারপরনাই শঙ্কিত। শিশুদের ক্ষেত্রেও, লং কোভিডের উপসর্গগুলি খুব স্পষ্ট নয়। লং কোভিড আসলে ব্যাপারটি কি? যদিও এর কোন কেতাবি সংজ্ঞা এখনো পর্যন্ত নেই, তবুও বুঝতে গেলে,এর একটা কার্যকরী ধারণা মাথায় রাখতে হবে। প্রলম্বিত কোভিডের উপসর্গগুলিকে, সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ অস্পষ্ট বা আচ্ছন্নময় বোধ বা চেতনা-পরিভাষায় যাকে ব্রেন ফগিং বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ শারীরিক অস্বস্তি, যেমন, গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা,শ্বাসকষ্ট এবং পরিশ্রান্ত বোধ করা। তৃতীয়তঃ মানসিক সমস্যা যেমন, মেজাজ ঠিক না থাকা বা হঠাৎ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়া। উপরিউক্ত উপসর্গগুলি যদি, চার সপ্তাহের বেশি থেকে যায়, তাহলে বলা যেতে পারে যে আক্রান্ত মানুষ টি লং কোভিডে ভুগছেন। সামগ্রিকভাবে, আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা, বড়দের তুলনায় অনেকটাই কম। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুদের ক্ষেত্রে,প্রাথমিক সংক্রমণের চতুর্থ সপ্তাহে, উপসর্গগুলি প্রথম সপ্তাহের তুলনায় অনেকই কম। ৫৬ দিন পরে দেখা যাচ্ছে শতকরা ১.৮ জন সংক্রমিত শিশুর কিছুটা হলেও উপসর্গ থেকে যাচ্ছে। এই শিশুদের আবার এক চতুর্থাংশ পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আর ফেরত আসে নি। বাকি তিন চতুর্থাংশ শিশুরা কিন্তু পুরোপুরিই সুস্থ হয়ে উঠেছিল। কোভিডের কোনও রকম উপসর্গই, তাদের শরীরে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

পরবর্তী প্রশ্ন হলো, কোভিড-১৯ রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে শিশুদের ভূমিকাটি ঠিক কিরকম? বিভিন্ন গবেষণাপত্রে দেখা গেছে যে শিশুদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষমতাও বাড়তে থাকে। এই গবেষণাগুলির শিশুরা মূলতঃ স্কুলকেন্দ্রিক। বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথা বলাই যায় যে, স্কুল কেন্দ্রিক যে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ, সেটা গোষ্ঠী সংক্রমণেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। যেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণের হার বেশি, সেখানে স্কুল কেন্দ্রিক সংক্রমণও বেশি। এটি শিশুদের সংক্রমণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়।

(২) অতিমারিতে শিশুদের সার্বিক শারীরিক স্বাস্থ্য

শিশুদের সার্বিক শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা আলোচনা করার আগে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বক্তব্য জেনে নেওয়াটা জরুরি। শিশুদের সুস্থ রাখার জন্য ও অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে সংস্থাটি কয়েকটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। সেগুলি হল- ১)সুস্থ অভিভাবকত্ব বা প্যারেন্টিং সম্বন্ধীয়। ২)স্বাস্থ্যকর খাবার-দাবার কিরকম হওয়া উচিৎ। ৩) মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া। ৪) নিয়মিত শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা।

ক) সুস্থ অভিভাবকত্ব

লকডাউনে আবদ্ধ উদ্বিগ্ন শিশু এবং যুবকরা নিজেদের সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ভাবতে থাকেন। উদ্বেগ এবং বিরক্তি জন্ম দেয় এক অনিশ্চয়তার। তারা তাদের পরিবারের উপর ভাইরাস-সংক্রমণের কুপ্রভাব নিয়ে ভীত এবং শোকাতুর হয়ে পড়ে।

নিয়মিত শিশুদের সঙ্গে, কোভিড-১৯ সংক্রমণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে। নীরবতা এবং গোপনীয়তা, শিশুদের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে। প্রয়োজনে শিশু-কিশোরদের বয়স এবং মানসিক গঠন অনুযায়ী নিয়মিত কাউন্সেলিং করতে হতে পারে।

প্রতিটি শিশুর সঙ্গে সময় কাটানো প্রয়োজন- প্রতিদিন ন্যূনতম ২০ মিনিট বা তার বেশি।

ভালো কাজের জন্য বাচ্চাদের প্রশংসা করলে, সেটি তাদের মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাজে উৎসাহ ফিরে আসবে। তারা আশ্বস্ত বোধ করবে।

খ) স্বাস্থ্যকর খাবার-দাবার

স্বাস্থ্যকর খাবার বলতে, খাদ্য তালিকায় অন্যান্য খাবারের সঙ্গে, ফলমূল ও তাজা শাকসবজি থাকাটা জরুরি। গোটা শস্য যেমন গম, ভুট্টা এবং চালের মিশ্রণ, মসুর ডাল এবং মটরশুটি, প্রচুর তাজা ফল এবং শাকসবজি। প্রাণীজ খাবার (যেমন মাংস, মাছ, ডিম এবং দুধ) শিশুদের বাড়ন্ত শরীরের জন্য দরকার। গোটা শস্যজাতীয়, যেমন প্রক্রিয়াবিহীন ভুট্টা, বাজরা, ওটস, গম এবং বাদামী চাল-এগুলি মূল্যবান ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার। এগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে। স্ন্যাকসের জন্য দেওয়া যেতে পারে, কাঁচা শাকসবজির স্যালাড, তাজা ফল এবং লবণ ছাড়া বাদাম। খাবারে লবণের পরিমাণ কম রাখাটাই বাঞ্ছনীয়। সারাদিনে খাবারে লবণের পরিমাণ ৫ গ্রামের মধ্যে (এক চা চামচের সমতুল্য) সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। রান্না করার সময় এবং খাবার তৈরি করার সময়, অল্প পরিমাণে লবণ ব্যবহার করতে হবে। লবণাক্ত সস এবং মশলা (যেমন সয়া সস, ফিশ স্টক বা ফিশ সস) ব্যবহার কম করতে হবে। টেবিল থেকে কাঁচা লবণের পাত্রটি সরিয়ে ফেলতে হবে। কম সোডিয়াম যুক্ত খাদ্যসামগ্রী বেছে নিতে হবে। পরিমিত পরিমাণে ফ্যাট এবং তেল ব্যবহার করতে হবে। রান্না করার সময় মাখন, ঘি এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট এর পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর তেল যেমন জলপাই, সয়া, সূর্যমুখী বা কর্নের তেল ব্যবহার করতে হবে। মুরগি এবং মাছের মতো সাদা মাংসযুক্ত প্রাণীজ খাবার দিতে হবে। লাল মাংস বা রেড মিটের তুলনায় এতে চর্বি কম থাকে। কম চর্বিযুক্ত দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য অর্থাৎ কিনা টোনড মিল্ক ব্যবহার করলেই ভালো হয়। তবে আমাদের দেশে, দু-বছর বয়স পর্যন্ত ফুল-ক্রিম বা ফ্যাটযুক্ত দুধ ব্যবহার করা চলতে পারে। প্রক্রিয়াজাত (processed), বেকড এবং ভাজা খাবার এড়িয়ে চললেই ভালো হয়। এতে ট্রান্স-ফ্যাটের আধিক্য। রান্না করার সময় খাবার ভাজার পরিবর্তে ফুটিয়ে বা স্টীম করলে, খাদ্যগুণ অক্ষুন্ন থাকে। চিনি খাওয়া

সীমিত করতে হবে। মিষ্টি এবং চিনিযুক্ত পানীয় যেমন কোল্ড ড্রিংক্স, বোতলজাত ফলের রস, শক্তি-বর্ধক এবং স্পোর্টস ড্রিংকস, প্যাকেটজাত চা এবং কফি এবং স্বাদযুক্ত দুধের পানীয়তে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি দেওয়া থাকে। কুকি, কেক এবং চকোলেটের মতো মিষ্টি স্ন্যাকসের পরিবর্তে তাজা ফল বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ডেজার্ট বা মিষ্টান্নের বিকল্পগুলি বেছে নেওয়ার সময় দেখতে হবে, সেগুলিতে চিনির পরিমাণ কম আছে।

শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। বুকের দুধ শিশুদের অপরিণত পাচন প্রক্রিয়ার জন্য আদর্শ খাবার। এটি নিরাপদ, পরিষ্কার এবং এতে অ্যান্টিবডি রয়েছে যা শৈশবের অনেক অসুখ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। জীবনের প্রথম ৬ মাসে শিশুদের শুধুমাত্র বুকের দুধই খাওয়ানো উচিত, কারণ মায়ের দুধ তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি এবং পানীয় সরবরাহ করে।

৬ মাস বয়স থেকে, বুকের দুধের সঙ্গে পুষ্টিকর-ঘন খাবার শুরু করা দরকার। সেটি বাড়িতে রান্না করা বা তৈরী করা হলে ভালো হয়। এটি বুকের দুধের পরিপূরক। অন্তত ২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের, অন্যান্য খাবারের সঙ্গে, বুকের দুধও খাইয়ে রাখা উচিৎ।

গ) শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের নজরদারি

কোভিডের অবদান হল ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা বাড়িতে বসে কাজ। এক নতুন বাস্তবতা। আর অস্বস্তিকর বেকারত্ব। শিশুদের বাড়িতে বসে অনলাইন পদ্ধতিতে স্কুলের পঠন-পাঠন। পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ। পুরোটাই যেন অনভ্যাসের ফোঁটা। এই ধরনের অভূতপূর্ব জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, ভাইরাস-ভীতি কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিকটজনের মানুষদের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটিয়ে ওঠা, নিঃসন্দেহে আমাদের সকলের জন্যই একটি চ্যালেঞ্জ। সে সবল-চিত্ত বা দুর্বল-চিত্ত যাই হোক না কেন।

এক্ষেত্রে জাতীয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী শোনা এবং মেনে চলা জরুরি। সরকারি টিভি এবং রেডিওর মতো বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যমগুলিকে অনুসরণ করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার সাম্প্রতিক আপ-টু-ডেটগুলো অনুধাবন করতে হবে।

নতুন দৈনন্দিন জীবন যাত্রার একটি রুটিন বানাতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব সেই রুটিন-মাফিক চলার।

* প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠা এবং শুতে যাওয়ার সময়টি ঠিক রাখতে হবে। চেষ্টা করতে হবে, প্রতিদিনই যথাসম্ভব ওই সময় মেনে চলার।

* ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি।

* নিয়মিত সময়ে স্বাস্থ্যকর এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।

* কিছুক্ষণের জন্য হলেও, নিয়মিত শরীর-চর্চা ও ব্যায়াম করতে হবে।

* কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় এবং বিশ্রামের জন্য সময় বরাদ্দ রাখতে হবে।

দৈনন্দিন জীবনের উপভোগ্য উপাদানগুলির জন্য বেশি সময় বরাদ্দ করতে হবে। মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বাড়ায় এমন সংবাদ বা ঘটনার খবর এড়িয়ে চলতে হবে। বারম্বার নিউজফিড দেখার প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে হবে। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে, প্রয়োজনে দিনে একবার বা দু'বার তথ্যানুসন্ধানের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। বরং ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহর করা যেতে পারে, আত্মীয়-পরিজন-বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু হিসাবে। বিশেষ করে, যেখানে লকডাউনের জন্য বাইরে বেরোনোর বিধিনিষেধ রয়েছে। বাড়ির বয়স্কদের নেশার জিনিস সেবনে কিছু স্ব আরোপিত কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করাটা খুব জরুরি। সেটি নিজের এবং বাড়ির অন্যান্য শিশুদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখেও। ধূমপানের অভ্যাস একেবারেই বর্জন করতে হবে। মাত্রাতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবনে রাশ টানতে হবে। ভয়, উদ্বেগ, একঘেয়েমি এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করতে, কোনও অবস্থাতেই মাদক সেবন শুরু করা যাবে না।

স্ক্রীন টাইম শব্দটি ব্যবহৃত হয়, একজন মানুষ সারাদিনে কতক্ষণ সময় টেলিভিশন বা মোবাইল এর পর্দায় সময় অতিবাহিত করছেন সেটি বোঝানোর জন্য। এ ব্যাপারেও বড়দের সচেতন হওয়া দরকার এবং বাড়ির অভিভাবকদের হাতেই থাকবে ছোটদের স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি।

ভিডিও গেমস এবং অন্যান্য অনলাইন খেলাধূলার এক অনন্ত সম্ভাবনা এখন হাতের মুঠোয়।

দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়িতে আবদ্ধ হয়ে থাকলে, তখন এটির অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে। বাচ্চাদের এবং বড়দের দৈনন্দিন রুটিনে অফ-লাইন কার্যকলাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, অনলাইন বিনোদনের সময় ঠিক করতে হবে। সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব কিন্তু বাড়ির বয়স্কদের হাতেই। অনলাইন বিনোদনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, নিঃসন্দেহে শিশুমন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশু এবং কিশোরদের জন্য ডিজিট্যাল বিনোদনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন দেড় থেকে দু'ঘন্টা (অনলাইন ক্লাসের সময় বাদ দিয়ে)।

ঘ) শরীর চর্চা

এক বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

* সমস্ত শিশুরই শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা উচিত। যদিও এই বয়সের শিশুদের কোনও ব্যায়াম নির্দিষ্ট করা নেই, তবু তাদের সারাদিনে কমপক্ষে দু-তিনবার পেটের উপরে উপুড় করে(৩০ মিনিট) শুইয়ে রাখা যেতে পারে।

এক থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

* এই বয়সের সমস্ত শিশুদের দিনে অন্তত ১৮০ মিনিট হাল্কা থেকে মাঝারি- বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরৎ করা উচিত।

পাঁচ থেকে তেরো বছর বয়স পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীদের জন্য

* সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক অন্তত ৬০ মিনিট মাঝারি

থেকে ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করা উচিত। ব্যায়াম এমনই হওয়া উচিত, যা পেশী এবং শরীরের হাড়কে মজবুত করবে। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে তিন থেকে চার দিন, নিয়মিত।

(৩) শিশুস্বাস্থ্যের উপর, সামাজিক সঙ্কটের প্রভাব

নভেম্বর ২০২০তে UNICEF এর আশঙ্কা ছিল, মহামারীকালে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক সঙ্কট উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আরও প্রায় ১৪ কোটি শিশুকে আর্থিকভাবে দরিদ্র করে তুলবে। সঠিক প্রশমন নীতির অভাবে, বিশ্বব্যাপী দরিদ্র পরিবারে বসবাসকারী শিশুদের মোট সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারে প্রায় ৭২ কোটিরও উপরে। এই শিশুদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আফ্রিকা মহাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাসকারী।

অতিমারি নিঃসন্দেহে শিশুদের সার্বিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। কোভিড-১৯ জনিত কারণে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, অন্ততঃ পঞ্চাশ কোটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রী অনলাইন শিক্ষার সুবিধা নিতে অপারগ। বিশ্বের, অনেক স্কুলেই ডিজিটাল শিক্ষায় বিনিয়োগ করার জন্য আর্থিক সঙ্গতিই নেই। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারগুলির দু'বেলা অন্নই জোটে না, ইন্টারনেট তো দূরস্থান। যেখানে প্রযুক্তি বা নীতির ঘাটতি নেই, সেখানে রয়েছে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব বা বাবা-মার সক্রিয় সহযোগিতার অভাব।

কোভিড-১৯ অতিমারি ও শিশুকন্যা

কোভিড-১৯ মহামারিজাত সামগ্রিক আর্থসামজিক সংকট, বেকারত্ব, সামাজিক একাকীত্ব-এগুলি কিছু গার্হস্থ্য সমস্যার জন্ম দেয়। আমাদের দেশে, এতে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয় কিশোরী এবং শিশুকন্যারা। এদের মধ্যে গার্হস্থ্য হিংসা, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, অপুষ্টি, যৌন-নিপীড়নের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী দশকে, প্রায় এক কোটি কন্যাসন্তানের বাল্যবিবাহ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

(৪) কোভিড-১৯: জীবনদায়ী টীকা ও শিশুদের স্বাস্থ্য

কোভিড-১৯ এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে যদিও শিশুদের মৃত্যুর হার খুবই কম, কিন্তু এর পরোক্ষ প্রভাব অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং জীবনরক্ষাকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা যেমন ইমিউনাইজেশন বা টিকাকরণ এবং প্রসবপূর্ব পরিচর্যায় প্রভূত বিঘ্ন ঘটেছে। ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে শিশুমৃত্যুর হার। বিশ্বজুড়ে গত কয়েক দশক ধরে, শিশুস্বাস্থ্যর যে অগ্রগতি ঘটেছে তা এখন বিপরীতমুখী। গর্ভবতী মহিলারা, স্বাস্থ্য পরিষেবা না পাওয়ায় মৃতপ্রসব এবং পূর্বপ্রসবের সংখ্যা বাড়াতে পারে। UNICEF এর আশঙ্কা,আগামী এক বছরে প্রায় দু'লক্ষ অতিরিক্ত মৃতপ্রসব ঘটতে পারে। এই অনভিপ্রেত জীবনহানি রোধ করতে গেলে, খুব দ্রুত প্রসবপূর্ব এবং প্রসবের যত্নের পরিষেবা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সরাসরি মৃত্যু ছাড়াও, অপুষ্টিজনিত কারণেও শিশুদের জীবনসংশয় ঘটছে। পাঁচ বছর বয়সের কম যারা, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ৭০ লক্ষ তীব্র অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে, পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় দেড় কোটি শিশু ভিটামিন এ-এর গুরুত্বপূর্ণ ডোজ থেকে বঞ্চিত হবে। নিশ্চিত ফলস্বরূপ, সেইসব শিশুরা চোখের সমস্যায় ভুগবে। বাড়াবাড়ি হলে, অন্ধত্বও। স্কুলের বিনামূল্যে খাবার প্রদানের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, প্রায় চার কোটি শিশু ওই পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হবে।

কোভিড-১৯ অতিমারি (নভেম্বর ২০২০ অনুযায়ী) নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার কারণে, ২৬টি দেশে হামের টিকাকরণ স্থগিত হয়ে গেছে। যার ফলে, প্রায় এক কোটি শিশুর হামের টিকা না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে বর্তমান হাম এবং হামজাত রোগ—যেমন নিউমোনিয়া, অন্ধত্বের সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করতে পারে। পরিসখ্যানের দিকে চোখ রাখা যাক। ২০১৯ সালে, বিশ্বব্যাপী হাম-আক্রান্ত শিশুরোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট লক্ষ সত্তর হাজার, যা গত তেইশ বছরের নিরিখে সর্বোচ্চ। বিশ্বব্যাপী হাম এবং হাম জনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৬ সালের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ। শুধুমাত্র ২০১৯ সালে হামজনিত রোগে আনুমানিক ২০,৭৫০০ জন প্রাণ হারিয়েছে।

সঙ্কটের মুখে এইচআইভির বিরুদ্ধে লড়াইয়েও কয়েক দশকের দীর্ঘ অগ্রগতি। গত দশকে সদ্যোজাত এবং ছোট শিশুদের মধ্যে নতুন এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা কমে গিয়েছে প্রায় অর্ধেক। কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে, স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যাঘাত ঘটায়, এতদিনের কষ্টার্জিত সুফল প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। নতুন করে শিশুদের এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদি এইচ আই ভি সম্বন্ধীয়, পরিষেবা ছ'মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, আনুমানিক ১ লক্ষ ২৪ হাজার শিশুর নতুন করে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকবে।

অতিমারির অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব এবং একেবারেই নতুন। দ্রুত এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জনস্বাস্থ্যের প্রতি আরও যত্নবান না হলে, মানবসভ্যতার উন্নয়ন কিন্তু বেশ কয়েকবছর পিছিয়ে যাবে। শিশুরাই যে ভবিষ্যতের নাগরিক, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক।

[প্রবন্ধটি কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের পর লেখা।]

সূত্র:

১. ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স-অভিভাবকদের জন্য নির্দেশিকা (২৫শে এপ্রিল, ২০২১ অনুযায়ী)
২. ভারতে শিশুদের উপর কোভিড-১৯ মহামারীর মনোসামাজিক প্রভাব-ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক্স, ১১০৭ ভলিউম ৫৭ - ডিসেম্বর ১৫, ২০২০, বকুল জে পারেখ এবং সামির এইচ দলওয়াই।
৩. পেডিয়াট্রিক বয়সকালে কোভিড- ১৯-এর ব্যবস্থাপনার জন্য ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক প্রোটোকল।
৪. WHO ওয়েবপেজ
৫. কোভিড-১৯ এবং শিশু, ইউনিসেফ ডেটা হাব, মার্চ ২০২০

কোভিড-এর শিক্ষা

ভবানী প্রসাদ সাহু

কোভিড-১৯ অর্থাৎ ২০১৯-এ শুরু হওয়া করোনা ভাইরাস ডিজিজ-এর অতিমারি বিশ্ববাসীকে অভাবিত এক টালমাটাল অবস্থা ও আতঙ্কের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। শুরু হয়েছিল প্রায় আড়াই বছর আগে, ২০১৯-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি চিন-এর হুবেই প্রদেশে। উহান যার রাজধানী। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে সংক্রমণ, মৃত্যু, আর উদ্বেগ। কয়েকদিনের মধ্যেই চিন ছাড়িয়ে ইতালি, ইরান প্রভৃতি দেশ হয়ে আমেরিকা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম মৃত্যু ঘটল চিনের উহান-এ, ৯ জানুয়ারি, ২০২০তে। ২৫ মার্চ, ২০২০-এ বিশ্বের মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ালো ২০৫১৯। আর এখনবধি মৃত্যু ছাড়িয়ে গেছে ৬২ লক্ষ। আক্রান্ত প্রায় ৫১ কোটির বেশি মানুষ।

ভারতে প্রথম রোগী পাওয়া গেল ৩০ জানুয়ারি, ২০২০-তে কেরালায় (উহান থেকে আসা এক মেডিক্যাল ছাত্রী)। অক্টোবরে। ২০২০ তে তা প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ। আমেরিকায় প্রথম রোগী, ২১ জানুয়ারি,২০২০। আর এপ্রিল, ২০২০তেই তা ৬৬ হাজারের বেশি। কয়েকমাসের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস, এমনকি প্রত্যন্ত আন্টার্কটিকাতেও। এই সংক্রমণের ব্যাপ্তি, তার মৃত্যুর ভয়াবহ মিছিল—এ সবের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই তার কারণে বিশ্বজোড়া লকডাউন আর অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক টালমাটাল অবস্থার বিবরণ দেওয়ারও। তা সবারই জানা। শুধু এই অতিমারি থেকে আমরা যে শিক্ষা পেতে পারি বলে মনে হয়েছে সেটি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করা যায়।

প্রথমত, বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর সব মানুষের স্বার্থই একচ্ছত্রে গাঁথা এবং দেশের সীমানা তথা তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ প্রকৃত অর্থে অসার। এইভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে একসাথে মানবজাতি হিসেবে ভাবার এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের শিক্ষা দেয় এই অতিমারি। প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় সীমানা মানুষেরই তৈরি। প্রাচীনকালে এই ধরনের কোন সীমানা ছিল না। কিছু মানুষই শাসন এবং আধিপত্যের স্বার্থে পরবর্তীকালে তা মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর তাকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য দেশপ্রেম, জাতীয়তা ইত্যাদির আরোপ করা হয়েছে। আর এই সীমানাও সতত পরিবর্তশীল।

যেমন ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষ বলতে এখনকার পাকিস্তান বাংলাদেশসহ মায়ানমার শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত এলাকাকে বোঝাত। ইংরেজ শাসক তার স্বার্থে ভারতবর্ষ বলতে এই বিরাট এলাকার সীমানা ঠিক করেছিল। অর্থাৎ তখন অধুনা পাকিস্তানের যে সব মানুষ দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তাঁরা ছিলেন ভারতপ্রেমিক। পরে শাসকগোষ্ঠীরই স্বার্থে দেশবিভাজন হল। এখনকার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের কাছে পাকিস্থানের মানুষদের বিদেশী, এমনকি 'শত্রুস্থানীয়' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও করলো অনেকে। আবার পাকিস্তানের দিক থেকে বিপরীতটা। পৃথিবীর নানা এলাকাতেই তা সত্যি। অথচ মাত্র ৫-৬ হাজার বছর আগে, যখন কোন রাজারাজড়া বা শাসকগোষ্ঠী তথা শ্রেণীবিভাজন ছিল না, তখন এই ধরনের কোন ব্যাপার ছিল না। সব মানুষই স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাণধারণ করতেন। তখন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ছিল, কিন্তু মানুষে মানুষে বৈষম্য ছিল না।

করোনা ভাইরাস দেখালো ওই মানবিক ঐক্যের দিকটিই প্রধান এবং বৈষম্য মানুষের তৈরি করা, কৃত্রিম। সে কোন দেশ-বিদেশ না মেনে, বিশ্ববাসীকে একযোগে আক্রমণ করল। তার কাছে চিনা, আমেরিকান, ভারতীয় ভেদাভেদ বলে কিছু নেই। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা তার কাজটিকে সহজ করে দিল। সে দেখল পৃথিবীর কোন প্রান্তে যদি কিছু মানুষ তাকে বহন করে, তবে অন্য প্রান্তের মানুষও আজ কি কাল আক্রান্ত হতেই পারে। এটি যাতে সে না করতে পারে, তার জন্য মানুষই মানুষে মানুষে যোগাযোগটাই বন্ধ করতে বাধ্য হল,—লকডাউন ঘোষণা করে, কনটেনমেন্ট জোন করে নিজেরা নাকের জলে চোখের জলে হোলো।

তাকে আটকানোর জন্য মানুষ টিকা আবিষ্কার করল। এক্ষেত্রেও ওই বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা দিল। আফ্রিকায় (অক্টোবর, ২০২১ অবধি) শতকরা মাত্র ৫ ভাগ মানুষ টিকা পেয়েছেন। অথচ মালয়েশিয়ায় পেয়েছেন ৮৯ ভাগ, আমেরিকায় ৬৯ ভাগ মানুষ। দশটি দেশ টিকার সিংহভাগ দখল করেছে। অতিমারি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, এর ফলে কিন্তু নতুন করে সংক্রমণের এবং ভাইরাসটির নতুনতর স্ট্রেন তৈরির পথটি খোলা রাখা হচ্ছে। বিশ্ববাসীর শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মানুষের যদি গণপ্রতিরোধ ক্ষমতা (হার্ড ইমিউনিটি) অর্জিত না হয়, তবে আপাতভাবে নিরাপত্তা পাওয়া দেশের মানুষরাও কিন্তু প্রকৃতঅর্থে নিরাপদ নন। তাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বারংবার টিকা নিয়ে বৈষম্যের অবসান করার আবেদন করেছেন।

সমগ্র বিশ্ববাসীর স্বার্থ যে একচ্ছত্রে গাঁথা তা কোভিড অতিমারি এখন দেখালেও, যদিও কিছু মানুষ তথা দেশ ওই দিকে চোখ বুঁজে থাকে। এক্ষেত্রে শুধু বিশ্ব পরিবেশ তথা বাতাসের অক্সিজেনের কথা বলা যায়। অক্সিজেনও কোন দেশ কালের সীমানা মানে না। আমেরিকা চিন বা ইয়োরোপীয় ইউনিয়নের মত শিল্পোন্নত দেশগুলি যথেচ্ছ কারখানা তথা বাবসাবাণিজ্য করবে, বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড ও গ্রিন হাউস গ্যাস ছড়াবে—এটি যেন প্রতিষ্ঠিত সত্য। এর ফলে কিন্তু শুধু ওই দেশগুলির উপরের বাতাস তথা পরিবেশ

বিপর্যয় ঘটছে না, শিল্পে অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলি সহ সারা বিশ্বের পরিবেশই বিপর্যস্ত হচ্ছে। আফ্রিকা সহ এই দেশগুলির বৃক্ষরাজি যে অক্সিজেন ছাড়ছে তাও সারা বিশ্বের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বায়বীয় ভারসাম্য রাখছে। অর্থাৎ যেন তৃতীয় বিশ্বের অক্সিজেন চুরি করে শিল্পোন্নত দেশের মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে।

কোভিড-অতিমারি সমগ্র বিশ্ববাসীর স্বার্থের অভিন্নতা আবারো প্রতিষ্ঠা করল।

দ্বিতীয়ত, কোভিড-অতিমারি থেকে আরো একটি দিক স্পষ্ট হল যে, কোন ঈশ্বর আল্লা গড. দেবদেবী, মন্দির মসজিদ চার্চ, গুরুবাবা পীরবাবা, জ্যোতিষী প্রেত পিশাচ জিন—কেউই মানুষকে বাঁচানোর ও সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা পালন করে না; ভূমিকা পালন করে এই ধরনের ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের বিপরীতে মানুষেরই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত তৎপরতা। মানুষের ওই সব মিথ্যা বিশ্বাস ও তাদের কেন্দ্র করে হাজারো ধর্মানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকাণ্ড যদি সামান্যতম ভূমিকা রাখত, তবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিশ্বজুড়ে লকডাউন করে সে সব বন্ধ রাখতে হত না। এবং দেখা গেল এগুলি বন্ধ করে লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয় নি (আপাত কিছু ক্ষতি হয়েছে ওই সবকে কেন্দ্র করে সরলবিশ্বাসী মানুষদের প্রতারণা করা ধর্ম-জ্যোতিষ ব্যাবসায়ীদের)। কোন জ্যোতিষী বা হস্তরেখাবিদও কোভিড-আক্রান্তের সম্পর্কে কোন ভবিষ্যৎবাণী করেনি বা করতে পারে নি এবং কোন গ্রহরত্ন তাবিজ মাদুলি দিয়ে মানুষকে বাঁচাতে পারে নি (অর্থাৎ কোভিডের 'দোষ কাটাতে' পারে নি)।

২০২০-র বিশ্বজোড়া দীর্ঘস্থায়ী লকডাউনে মন্দির মসজিদ গির্জা তথা সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করা হলেও, খোলা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার যাবতীয় ক্রিয়াকান্ড ও প্রতিষ্ঠান। পোপের প্রার্থনাই হোক বা রামমন্দির প্রতিষ্ঠা হোক,—কেউই করোনা সংক্রমণ ও কোভিডের প্রকোপ সামান্যতম আটকাতে পারে নি, যদিও দাবি করা হয়েছিল ঐ রকমই। একইভাবে গঙ্গাজল থেকে যজ্ঞ, গোমূত্র—নানাকিছু নিয়ে অনেকেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছ্যাবলামো করলেও, সেগুলিও যে অসার তাও প্রমাণিত হয়েছে।

আর এ কারণেই সমাজ-মাধ্যমে সুন্দর কিছু কিছু কথা উঠে এসেছিল যেমন, ''যদি বেঁচে যাও এবারের মত, কেটে যায় মৃত্যুর ভয়। জেনো বিজ্ঞান লড়েছিল একা, মন্দির মসজিদ নয়।'' কিংবা ''ধর্ম এখন ঘুমিয়ে (বা ছুটিতে) আছে, বিজ্ঞান এখন লড়াই (বা ডিউটি) করছে'' ইত্যাদি। প্রকৃত অর্থে এই ধর্ম তার নানা কাজকারবার নিয়ে যদি সত্যিই স্থায়ীভাবে ঘুমিয়ে থাকত, তবে মানবজাতি অনেক উপকৃত হত। কিন্তু কোভিড অতিমারির এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যেমন বহু মানুষ নেয় নি, নেবে না,—তেমনি তার সঙ্গে তাল রেখে, কোভিডের আতঙ্ক কিছুটা কাটতে কাটতেই 'ধর্ম'-ও আড়মোড়া ভেঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে (বা মানুষের বিপদের সময় ছুটিতে পালিয়ে, এখন আবার জাঁকিয়ে বসছে)।

তৃতীয়ত আরেকটি দিক নতুন করে বোঝা গেল যে, আশৈশব শারীরিক শ্রম আর প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে বেড়ে ওঠা-এসবের দ্বারা আমরা আমাদের সুষ্ঠু প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করতে পারি। কিন্তু বর্তমান সমাজের ধনী, স্বচ্ছল, শিক্ষিত মানুষজনদের মধ্যে শারীরিক শ্রমের প্রতি রয়েছে এক ধরনের তাচ্ছিল্য ও অনীহা; অন্যদিকে আধুনিকতার নামে প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতাও। এর প্রতিফলন ঘটেছে কোভিড আক্রমণেও।

যেমন আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও ইয়োরপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি, ব্রাজিল এগুলিতে উচ্চ আয়ের ও উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষ বেশি। এসব দেশের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২.৫ ভাগ। কিন্তু কোভিড-এর রোগীর সংখ্যা এসব দেশে সারা বিশ্বের কোভিড রোগীর ৫০ ভাগ। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কমবেশি তাই। এখন পৃথিবীতে মৃত্যুর তৃতীয় বৃহত্তম কারণ কোভিড-১৯। এর আগে আছে হৃদরোগ ও স্ট্রোক,-যে দুটিও মূলত শারীরিক শ্রমবিমুখ, প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন ধনী ও স্বচ্ছলদের রোগ। ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা গেল শহুরে সচ্ছল কায়িক শ্রম না করা মানুষরা বেশি আক্রান্ত হয়েছেন।

কোভিড-১৯ রোগটির প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ছোটবেলা থেকে শারীরিক শ্রমে অভ্যস্থ এবং ধুলো কাদা খোলা হাওয়ায় বেড়ে ওঠা মানুষজনেরা তুলনায় অনেক কমই আক্রান্ত হয়েছেন। এর কারণ এইভাবে শৈশব থেকে যদি বহু বিচিত্র ভাইরাস ও জীবাণুর সংস্পর্শে শরীর আসে, তবে সেগুলির বিরুদ্ধে শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং মেমরি লিম্ফোসাইটের মত কোষে তা 'স্মৃতি' হিসেবে জমা থাকে। পরবর্তী কালে ওই ধরনের জীবাণু বা ভাইরাস শরীরে ঢুকলে তাকে ধ্বংস করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই পেটভরা খাবার তথা পুষ্টি, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগের মত সহ-অসুস্থতা (কোমর্বিডিটি) না থাকা (এসব রোগ সৃষ্টির পেছনেও কাজ করে শারীরিক শ্রম না করার পাশাপাশি,— শাকসব্জি কচুঘেঁচুর মত সস্তা খাবারের পরিবর্তে দামি ফাস্টফুড বা উচ্চ ক্যালোরির খাবার খাওয়া ইত্যাদি)— এগুলিও ভূমিকা পালন করে। ছোট বেলা থেকে আতুপুতু হয়ে বেড়ে ওঠাদের মধ্যে বহু বিচিত্র জীবাণু বা ভাইরাসের সম্মুখীন হওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ার কাজ অনেকটাই কম হয়। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষজন আক্রান্ত হন দারিদ্রের কারণে উপযুক্ত পেটভরা পাঁচমেশালি খাবার না খেতে পেলে, খোলামেলা জায়গার পরিবর্তে ঘিঞ্জি স্যাঁৎসেঁতে আলোহাওয়াহীন পরিবেশে থাকতে বাধ্য হলে। এঁদের মৃত্যুর প্রধান কারণ তাই হয়ে দাঁড়ায় যক্ষা, ডায়েরিয়া, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ—এসবের মত গরীবি রোগ।

আর এইভাবেই কোভিড আমাদের দেখাল শ্রম ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে বেড়ে ওঠার গুরুত্ব। আর কান টানলে মাথা টানার মত উঠে আসে সুস্থ প্রকৃতি ও পরিবেশের কথা, প্রকৃতিকে জয় করে ধ্বংস করে নয়, প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার আদর্শ সন্তান হিসেবে এই বিশ্বে বেঁচে থাকার গুরুত্ব।

কোভিড অতিমারির পরিবেশে আমরা আরও একটি শিক্ষা পাই আমাদের মানসিকতা সম্পর্কে। আমরা দেখলাম মাত্রাছাড়া আতঙ্ক নয়, যুক্তিগ্রাহ্য সতর্কতাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। আতঙ্ক

আমাদের যুক্তিবুদ্ধি গুলিয়ে দেয়, হিংস্র করে তোলে, মিথ্যা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারে ডুবিয়ে দেওয়ার কাজ করে। তাই দেখা যায় অহেতুক অতি আতঙ্কিত মানুষজন নিজের প্রতিবেশী ও আত্মীয় বন্ধুদেরও কিভাবে অস্পৃশ্য (প্রায় শত্রুস্থানীয়) হিসেবে গণ্য করে বসে। হাসপাতালে কাজ করলেই সে যেন কোভিডের ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে। তাই এমন স্বাস্থ্যকর্মীকে ঘরছাড়া, পাড়াছাড়া করতেও অনেকে দ্বিধা করেনি, যা তারা অন্যসময়ে হয়তো ভাবতেও পারে না। এমনকি যেহেতু চিনে প্রথম ভাইরাসটি চিহ্নিত হয়, তাই চিনাদের মত দেখতে অর্থাৎ মঙ্গোলীয় ধাঁচের মানুষজনের উপর ঘৃণ্য অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছে, হাস্যকর ভাবে ভাবা হয়েছে এটিই যেন নিজেদের তথা দেশবাসীকে বাঁচানোর একটি উপায়। আতঙ্কিত অবস্থায় গোমূত্র, তুলসিতলার মাটি, করোনাদেবীর পুজো বা করোনা-অসুর বধের যজ্ঞ, ইত্যাদি হাজারো হাবিজাবি কুসংস্কারের জন্ম দিয়ে তাতে অসহায় আশ্রয় পাওয়ার অলীক আশা করেছে। এর ফায়দা লুটেছে কিছু ধর্মব্যবসায়ী ও ধর্মীয় রাজনীতি করা ধান্দাবাজেরা। এইভাবে ফায়দা লুটছে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও, কখনো তার অপ্রয়োজনীয় ওষুধের নামে, কখনো বা টিকার নামে।

কোভিড অতিমারি আমাদের এমনই নানাদিকে সচেতন করেছে। এসব থেকে শিক্ষা পেয়ে আমরা যদি যথার্থই সচেতন হই, তবে বুঝতে পারবো টিকার চেয়ে প্রকৃতি নিবিড় জীবনশৈলীর গুরুত্ব, শুধু ভিড়ে ঠাসা ও বদ্ধ জায়গায় মাস্ক পরতে হলেও খোলামেলা আলোহাওয়া যুক্ত পরিবেশের গুরুত্ব, কোন অলৌকিক শক্তি বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন টোটকার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মানুষের উপর নির্ভর করার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব। আর এই সচেতনতা থেকেই আমরা বুঝতে পারবো, কিভাবে কোভিড ঘিরে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হল বা করা হল, আর তাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে বিজ্ঞান ও ব্যবসার মেল বন্ধন ঘটিয়ে শুরু হল বিপুল মুনাফা অর্জন।

সবশেষে কোভিডের থেকে এই বিপুল ব্যবসার ব্যাপারেও আমজনতা সচেতনতা ও শিক্ষা পেতে পারে। ধর্মের মুখোশ পরে যেমন ফ্যাসিস্টদের উত্থান ঘটতে পারে, তেমনি দেখা গেল চিকিৎসার মুখোশ পরে সীমাহীন ওষুধ, অক্সিজেন ও টিকার ব্যবসা। আর এ ব্যবসার ভিত্তি তৈরি করার জন্য তৈরি হয়েছিল তীব্র আতঙ্ক। অথচ যক্ষ্মা থেকে ডায়ারিয়া—নানা রোগে কোভিডের থেকেও অনেক বেশি মানুষ মারা যায়— মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। গত বছরের (২০২১) জুলাই মাসের প্রথমার্ধে অক্সফ্যামের দেওয়া একটি হিসেবে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি মিনিটে ক্ষুধার কারণে মৃত্যু হয় ১১ জনের। অথচ তখন কোভিড থেকে মৃত্যু হচ্ছিল ৭ জনের প্রতি মিনিটে। এবং ক্ষুধার জন্য এই মৃত্যু বিরামহীন,—কোভিডের মত সাময়িক দু'এক বছরের জন্য নয়। কিন্তু এই ক্ষুধা আর যক্ষ্মা-ডায়ারিয়াতে মারা যায় বিশ্বের দরিদ্র মানুষেরা, যারা একটুতেই ভয় পেয়ে নিজের সুরক্ষার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করার তথা ব্যবসায়িদের মুনাফা পাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে না। সব মিলিয়ে এসব কারণেই হয়তো ক্ষুধা-যক্ষ্মা-ডায়ারিয়ার মত কারণে নিরন্তর মৃত্যু নিয়ে বিশ্বজোড়া আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়নি, এখনো হচ্ছে না। কিন্তু করা হয়েছে কোভিড-১৯, এবং এর নিত্যনতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে।

আর এর ফলশ্রুতিতে দেখা গেল ফার্মা-ব্যবসা সহ বিশ্বের তাবড় পুঁজিপতি, বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ও মুনাফা কোভিড অতিমারির পরিবেশে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, পাশাপাশি চরমতম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র অসংখ্য মানুষ। ২০২০-র তুমুল মন্দা আর অতিমারির সময় দেখা গেল বিশ্বে ফার্মা-ব্যবসা হয়েছে, ১,২২,৫০০ কোটি ডলারের এবং তার সিংহভাগ এসেছে কোভিডের মোকাবিলার জন্য কার্যকরী, অকার্যকরী, সন্দেহজনক কার্যকারিতার নানাবিধ ওষুধ, নানা ধরনের সরঞ্জাম ও চিকিৎসা সামগ্রী আর টিকার থেকে। ২০২৫-এ এই ফার্মাব্যবসার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে আরো অনেক বেশি-১,৭০,০০০ কোটি ডলারের। আর এই লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যেই হয়তো করোনা ভাইরাসের নতুনতর কিন্তু স্বাভাবিক ভ্যারিয়েন্টের জুজু দেখিয়ে অর্বাচীন আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে; যেমন গত ডিসেম্বরে চলছে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে,-এটি ভয়ংকর নয়, প্রাণঘাতীও নয় প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও। টিকা প্রস্তুত কারকেরা বলছে, আরো টিকা নিন, বুস্টার ডোজ নিন, ৩-৪ বার টিকা নিন ইত্যাদি এবং তা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য বলানো হচ্ছে, বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের দিয়ে। নিছক উদাহরণের জন্য টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা ইংল্যান্ডের অ্যাস্ট্রাজেনেকা-র কথা বলা যায়, যারা জোর গলায় বলছে ওমিক্রন আরো ভয়াবহ, আরো প্রাণঘাতী হতে পারে আর তার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাক্সিনোলজি-র প্রফেসর সারা গিলবার্ট বলেছেন এর জন্য আরো টিকা, মাস্ক, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ওষুধপত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। (টাইমস অফ ইন্ডিয়া; ৭ ডিসেম্বর, ২০২১)

রোগ-অতিমারি-আতঙ্কের সুযোগে সীমাহীন ব্যবসার আঁচ পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের হিসেব থেকেও। একটি হিসেবে দেখা গেছে ২০১৯-এর তুলনায় ২০২০-তে দারিদ্র সীমার নীচে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে শতকরা ২০ ভাগ বেড়েছে, যা আগে ক্রমশ কমছিল। ভারতের শতকরা ৯৭ ভাগ মানুষের আয় এই সময়কালে কমেছে; আট কোটি পরিবার নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে গরিব হয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীর উপর তলার শতকরা একভাগ মানুষ শেয়ার বাজার থেকে আয় করেছে ১১ লক্ষ কোটি ডলার; শুধু আমেরিকার দশজন ব্যবসায়ী আয় করেছে ৫০,০০০ কোটি ডলার। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি, ভারতের ধনীতম ব্যবসায়িটি খাতায় ৯০০ কোটি টাকা রোজগার করেছে আর ভারতে ২৫ শতাংশ পরিবারের আয় ওই সময় মাসিক ৩০০০ টাকা বা তার নীচে নেমে গেছে। আর এ সমস্তই ঘটেছে বিশ্বের শোষণজীবী, চরম পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আইনি সুযোগ দেওয়ার রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে। শুধু তাই নয়, আদতে বেআইনি, কিন্তু একটু ঘুরপথে রাষ্ট্রীয় মদত নেওয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সম্পদ লুঠ করেছে

শিল্পপতিরা। এনারা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বছরের পর বছর তা শোধ না করলে যে অনাদায়ী ঋণ হয়, ২০১৯-২০তে ১২টি প্রধান ভারতীয় সরকারি ব্যাঙ্ক জানিয়েছিল তার পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। আর অতিমারির বছরের তা বেড়ে হয়েছে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা,—কোভিডের সুযোগ নিয়ে শতকরা ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধি ওই জোচ্চুরির। অর্থাৎ ভারতের ১৩৭ কোটি মানুষের দরিদ্রতম মানুষটি থেকে আবাল বৃদ্ধ বণিতার প্রত্যেকের থেকে গড়ে ৪,৮০০ টাকারও বেশি লুট করেছে দেশে ধনীতম ব্যবসায়ীরা এই অতিমারির বছরে, শুধুমাত্র ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিয়ে না দিয়ে। এছাড়া তো আছে ব্যবসায়িক মুনাফা।

পাশাপাশি এই অতিমারির সময়ে আমরা দেখলাম কিভাবে দেশের কৃষকরা দাঁতে দাঁত চেপে দীর্ঘ ৩৭৮ দিনের শান্তিপূর্ণ প্রায় ঐক্যবদ্ধ, লক্ষ্যে স্থির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দর্পিত, স্বৈরতন্ত্রী শাসকের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে নিজেদের দাবি আদায় করে নিতে পারলেন। শোষণজীবী বৈষম্যবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারটি ওই তুলনায় অনেক, অনেক বেশি বৃহৎ হলেও, কোভিড অতিমারি যেমন এই ব্যবস্থার নগ্ন রূপ নতুন করে চোখের সামনে তুলে ধরল, তেমনি দেখিয়ে দিয়ে গেল যে, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে আপাতভাবে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন ওই ব্যবস্থাকে উৎখাত করা সম্ভব। [প্রবন্ধটি কোভিডের তৃতীয় তরঙ্গের পর লেখা।]

জলাতঙ্কের মত সাপের কামড়কেও জাতীয় কর্মসূচিতে নিয়ে আসতে হবে

দয়াল বন্ধু মজুমদার

গত ১০ মার্চ, বেলেঘাটার আই ডি হাসপাতালে একটা প্রশিক্ষণ শিবির হল। আমিও একজন প্রশিক্ষণ প্রাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। কিসের প্রশিক্ষণ? জলাতঙ্ক রোগের প্রশিক্ষণ। এরকম নানান বিষয়েই বিভিন্ন সময়ে, সরকারি ভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, আমার মত সরকারি চাকরিরত ডাক্তারদের। আমি নিজেই জেলায় জেলায় ঘুরে, ডাক্তারবাবুদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি, সাপের কামড়ের উপর।

এই যে জলাতঙ্কের উপর প্রশিক্ষণ হল, এটা কিন্তু জাতীয় কর্মসূচি। এই জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জাতীয় কর্মসূচি ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা ছিল না। যে কোন প্রশিক্ষণই আমাদের জানা বোঝার জন্য উপকারী, সেটা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এই জলাতঙ্ক প্রতিরোধের ব্যাপারেও আমাদের কিছু কিছু ভুল ধারণা ছিল, ভালো করে শিখলাম। তবে কিনা আমার মতে এই প্রশিক্ষণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া খুব জরুরি। এই যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধের প্রধান কাজটা হয়, কামড়ের পর তাড়াতাড়ি সাবান জলে ধুয়ে ফেললে। আসলে টিকা ইঞ্জেকশন ইত্যাদির থেকেও এই ধুয়ে ফেলাটা বেশি জরুরি। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই সাবান জলে ধুয়ে ফেলা ব্যাপারটাই সব থেকে বেশি অবহেলিত হয়। আমরা হাসপাতালে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, কুকুর বিড়াল কামড়ের জায়গাটা ধুয়ে ফেলাটা যে অত্যন্ত জরুরি, এটা সাধারণ মানুষকে বোঝানোই যায় না।

পনের মিনিট ধুতে বললে এমন ভাবে তাকায় যেন ডাক্তারকে পাগল ভাবছে। তাছাড়া কুকুরের কামড় সাধারণত পায়ে হয়। বেশিরভাগ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পা ধোয়ার মত জায়গায় জলের কলটা থাকে না। এখন সব সরকারি হাসপাতালে দামি দামি টিকা, সিরাম ইত্যাদি বিনা মূল্যেই দেওয়া হয়; কিন্তু এই পনের মিনিট ধুয়ে ফেলার ব্যাপারটা আদৌ দেখা হয় না।

কামড়ের জায়গা দ্রুত সাবান জলে ধুয়ে ফেলা, তারপর কামড়ের জায়গায় RIG অর্থাৎ জলাতঙ্কের সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া, এই হল প্রাথমিক কর্তব্য। তারপর দুই হাতের উপরে, কাঁধের পাশে (Deltoid) দুটি টিকা দেওয়া হয়। টিকার নির্দিষ্ট দিন প্রথম টিকার দিন ধরে হিসাব করে লিখে দেওয়া হয়। প্রথম টিকার দিনটিকে শূন্য দিন বা Day Zero বলা হয়। এর পর তিন, সাত, একুশ ও আঠাশ নম্বর দিনগুলিতে একই ভাবে দুটি করে টিকা দেওয়া হয়। জলাতঙ্ক যেহেতু একশ শতাংশ মারণ রোগ, এর প্রতিরোধ ব্যাবস্থা তাই অত্যন্ত জরুরি। উন্নত দেশের মত রাস্তাঘাটে যথেষ্ট কুকুর বেড়ালের (Stray Dog & Cats) ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করে কেবলমাত্র পোষ্য হিসাবে খামারে বা গৃহে লাইসেন্স ও টিকা সহ পোষা উচিত। জলাতঙ্ক হলে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, এজন্যই কামড়ের জায়গা ধুয়ে ফেলা থেকেই খুবই যত্ন নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে।

এবার বলি, এই জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জাতীয় কর্মসূচি ব্যাপারটা আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমরা গত বারো-চোদ্দ বছর লাগাতার ভাবে বলে যাচ্ছি যে, সাপের কামড়-এও হাজার হাজার মানুষ মারা যান। সরকারি হিসেবেই শুধু মাত্র আমাদের দেশে বছরে ৬০ হাজার বেশি মানুষ সাপের কামড়-এ মারা যান। আমরা সমীক্ষা করে দেখিয়েছি যে, এই সাপের কামড়-এ মৃত্যু সংখ্যা আমাদের রাজ্যে বছরে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। এদিকে জলাতঙ্ক রোগে বছরে ২০ হাজার মানুষ মারা যান। এই সংখ্যাটাও হয়ত প্রকৃত তথ্যের চাইতে কম। তবুও আমাদের দেশের নীতি নির্ধারক বড় বড় কর্মকর্তার কাছে সাপের কামড় অবহেলিত থেকে গেছে।

মারণঘাতী জলাতঙ্ক রোগ গুরুত্ব পেয়েছে, খুব ভালো কথা। কিন্তু তার থেকে তিন গুণ বেশি মানুষ মারা যায় যে কারণে, সেই সাপের কামড়কেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত? এখানে উল্লেখ করাটা অপ্রয়োজনীয় নয় যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৯ সালেই সাপের কামড় কে একটি 'Neglected Tropical disease' বলে চিহ্নিত করেছে। সাপের কামড়ে গ্রামের চাষি, মজুর, জেলে এসব প্রান্তিক মানুষেরা বহু সংখ্যায় মারা যান।

আই ডি হাসপাতালে ওই দিন প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডাঃ রায়। উনি আমার পুর্ব পরিচিত। সাপের কামড় নিয়ে কাজের সময়ে উনি আমাদের সাহায্য করেছেন। এই সাপের কামড় কেন এখনও জাতীয় কর্মসূচিতে এলোনা, এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করলেন। মূল কারণ হল, সাপের কামড় নিয়ে প্রকৃত তথ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। হাজার হাজার মানুষ সাপের কামড়ে মারা গেলেও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সে খবর পাচ্ছে না। তাই আমাদের মত কিছু মানুষ হাজার চেঁচামেচি করেও কর্তাদের মাথায় ব্যাপারটা ঢোকাতে পারছি না। কুকুর বা বেড়াল বা বন্য ও অন্য গৃহপালিত পশু কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয়না, হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জলাতঙ্কের প্রতিষেধক ইমিউনো গ্লোবিন ও টিকা আছে যদিও সরবরাহ নিয়ে সমস্যা আছে। কিন্তু জলাতঙ্ক একবার হলে মৃত্যু অবধারিত। কোন ওষুধ নেই। জলাতঙ্কের রোগী সাধারণত কিছুদিন ভুগে মারা যান। বেশিরভাগ রুগীই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে, ক'দিন প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে মারা যান, তাই তাঁদের তথ্য নথিভুক্ত সম্ভব। অন্য দিকে সাপের কামড়-এর রোগী প্রায়ই হাসপাতালে না এসে ওঝা বদ্যির কাছে মারা যান। হাসপাতালে এলেও অনেক সময় রোগীটি যে সাপের কামড়-এ মৃত্যু হয়েছে সেটা নথিভুক্ত করা হয় না। তবুও জলাতঙ্ক রোগে বছরে কুড়ি হাজার আর সাপের কামড়ে বছরে ষাট হাজারের ওপর মৃত্যু হয়, দুটিই সরকারি পরিসংখ্যান। তাই সাপের কামড়কেও জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

কুকুর ও সাপ কামড়ের সমস্যা

গৌতম মৃধা

আমাদের দেশ মূলত উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর দেশ। অনুকূল পরিবেশ, উর্বর সমতল, মিষ্টি জলের সংস্থান, প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য জনসংখ্যা যেমন প্রচুর, পাশাপাশি পশুপাখি সহ অন্যান্য প্রাণীর সংখ্যাও প্রচুর। অরণ্য ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় এবং মানুষ ক্রমশ অরণ্য দখল করে নেওয়ায় বন্য জন্তুরা একদিকে বিপন্ন অপরদিকে মানুষের মুখোমুখি। তাই প্রায়ই হাতির আক্রমণ, বাঘ—চিতাবাঘ-ভালুক-কুমিরের কামড় আঁচড়ের খবর পাওয়া যায়। সর্প দংশনের সংখ্যা বাড়ে। এছাড়া ভারত ধর্মেরও দেশ। অনেকেই গরু, হনুমান প্রভৃতিকে দেবতার বাহন, সাপকে মা মনসার বাহন মনে করেন। এখানকার অধিবাসীরা জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করতে অভ্যস্ত। গৃহে রাস্তাঘাটে যথেষ্ট কুকুর, বেড়াল, গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হনুমান ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। কুকুরের কামড় এবং সাপের কামড় আমাদের দেশের দুটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা।

কুকুরের কামড়ের সমস্যা

প্রতি বছর ভারতে অন্তত ২০,০০০ মানুষ জলাতঙ্ক (Hydrophobia) রোগে মারা যান। সংক্রমিত কুকুর ছাড়াও সংক্রমিত বেড়াল, বেজি, হনুমান, বাঁদর, শেয়াল, নেকড়ে প্রভৃতি উষ্ণ রক্তের প্রাণীর কামড়ে জলাতঙ্ক হতে পারে। বছরে ভারতে অন্তত দেড় কোটি কুকুরের কামড়ের কথা জানা যায়। জলাতঙ্ক মারণঘাতী রোগ, কোন ওষুধ নেই, হলে বাঁচানো যায় না। তবে এর প্রতিষেধক টিকা ও ইমিউনোগ্লোবিন আছে যা দ্রুত ও ঠিকভাবে নিলে জলাতঙ্ককে প্রতিহত করা যায়।

একধরনের র‍্যাবডোভাইরাস (লিসাভাইরাস, টাইপ ওয়ান) এই রোগের কারণ যা সংক্রমিত পশুর লালায় থাকে। এছাড়া স্নায়ুতন্ত্র, মূত্র, লসিকা ও স্তন দুগ্ধে থাকতে পারে। সংক্রমিত পশুর কামড় বা চাটা বা আঁচড় থেকে এই ভাইরাস অন্য পশুর বা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সংক্রমিত কুকুর/বেড়াল/অন্য পশু কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে, আঁচড়ালে ও সেখানে ক্ষত হলে কিংবা থেকে যাওয়া ক্ষতস্থানে চেটে দিলে সেখানকার মাংস পেশি ও কানেকটিভ টিস্যুতে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। তারপর ভাইরাসগুলি প্রান্তিক নার্ভগুলোর মাধ্যমে সুষন্মা কাণ্ড হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তারপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিন থেকে কয়েক বছর, সাধারণত ২০-৬০ দিনের মধ্যে, রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় কয়েক প্রজাতির বাদুড় থেকে জলাতঙ্ক হতে পারে।

প্রথম তিন-চারদিন মাথা ব্যথা, গা ব্যথা, জ্বর, কামড়ের জায়গায় ব্যথা হয়। পরবর্তিতে রোগ ছড়িয়ে পড়লে স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সামান্য শব্দ, স্পর্শ, বাতাসে অথবা জল দেখলে প্রবল অসহিষ্ণুতা ও কাঁপুনি শুরু হয়। মাংসপেশী সংকুচিত ও অবশ হয়, তারপর খিঁচুনি। অজ্ঞান হয়ে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আগেই বলেছি এর কোন চিকিৎসা নেই, তবে প্রতিষেধক টীকা আছে।

জলাতঙ্ক গ্রস্ত কুকুর

কামড়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়। **ক্যাটেগরি এক** হল শুধুমাত্র চাটা যেখানে চামড়া অক্ষত। সেক্ষেত্রে কিছু করার প্রয়োজন নেই।

ক্যাটেগরি দুই যেখানে নখের খোঁচায় বা আঁচড়ে চামড়ায় ছেদ হয়েছে সেখানে ১৫ মিনিট ক্ষতস্থান ভালো করে ধুয়ে দিতে এবং অ্যান্টি রেবিজ ভ্যাক্সিনের ডোজ শুরু করতে হবে। ধোয়ার সময় সাবান দিয়ে ধুলে আরও ভালো। **ক্যাটেগরি তিন** যেখানে এক বা একাধিক কামড়/আঁচড় বা দুইয়ের কারণে ক্ষত সৃষ্টি। সেক্ষেত্রে ভালো করে ক্ষত পরিস্কারের সঙ্গে ক্ষতস্থানে র‍্যাবিজ ইমিউনোগ্লোবিউলিন (৪০ আই.ইউ/প্রতি কেজি দেহের ওজনে) দিতে হবে এবং অ্যান্টি র‍্যাবিজ ভ্যাকসিন চার থেকে পাঁচটি ডোজ নিতে হবে। এক মিলিলিটার ডোজ মাংসপেশীতে ০,৩,৭,১৪ ও ২৮ দিনে। চামড়ার তলায় (Intradermal) দিলে ০.১ মিলি লিটার চারবার (০, ৩, ৭ ও ১৪ দিন) দিলে হয় এবং অনেকটা ভ্যাক্সিন ও অর্থ সাশ্রয় করা যায়। গর্ভবতী মহিলাদেরও দেওয়া হয়।

জলাতঙ্ক রোগী

জলাতঙ্ক নিবারণে বেওয়ারিশ কুকুর বেড়াল নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। উন্নত দেশগুলোর মত কোন নাগরিক নিয়ম মেনে স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতে লাইসেন্স করিয়ে তার ঘরে বা খামারে কুকুর বেড়াল পুষতে পারবেন। তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা ও টিকার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় উদ্যানে বন্যজন্তু থাকবে। এর বাইরে রাস্তাঘাটে স্টেশনে বাজারে যত্র তত্র কুকুর বেড়াল ইত্যাদি থাকতে পারবে না। বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিধন (culling) করতে হবে নতুবা সরকারি বেসরকারি ডগ পাউণ্ডে টিকা দিয়ে বন্ধ্যাত্ব অস্ত্রোপচার করে রাখতে হবে। জলাতঙ্ক রোগ নিয়ন্ত্রণ (Control) করার সঙ্গে সঙ্গে পশুদের মলমূত্র থেকে পরিবেশকেও অনেক পরিচ্ছন্ন রাখা যাবে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে যাতে কুকুরের কামড়ে ঝাড়ফুঁক, থালাপড়া ইত্যাদিতে মূল্যবান সময় নষ্ট না করে দ্রুত নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সাপের কামড়ের সমস্যা

পরিসংখ্যান বলছে মাত্র ৭ শতাংশ সাপের কামড় নথিভুক্ত হয় এবং মাত্র ২২ শতাংশ সাপের কামড় চিকিৎসা করাতে হাসপাতালে আসে। এরপরেও বছরে আমাদের দেশে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান যার মধ্যে ৬৬ শতাংশ কালাচ সাপের কামড়ে। ভারতে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ আছে তার মধ্যে ৬০টির মত বিষধর প্রজাতির। এর মধ্যে আবার ৫০টির মত সামুদ্রিক বিষধর সাপ যাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংস্পর্শ আসা প্রায় অসম্ভব।

গোখরো

সাধারণ মানুষ বিশেষত গ্রামের ও অরণ্যচারী কৃষক, পশুপালক, কাঠুরে, মউলে, পাতা কুড়ানি, মৎস্যজীবী প্রমুখরা মারা যান মূলত 'স্পেকটেকল কোবরা' (গোখরো, খরিশ, গোমো), 'মোনোক্লেড কোবরা' (কেউটে, শামুকভাঙ্গা), 'কিং কোবরা' (শঙ্খচূঁড়), 'কমন ক্রেইট' (কালাচ, কালাচিতি, ডোমনাচিতি, শিয়রচাঁদ, ঘামচাটা), 'ব্র্যাণ্ডেড ক্রেইট' (শাঁখামুটি), 'ব্ল্যাক ক্রেইট, 'ওয়াল'স সিণ্ড ক্রেইট', 'রাসেল'স ভাইপার' (চন্দ্রবোড়া), 'শ স্কেলড ভাইপার' (ফুরশা), 'হাম্বনোস পিট ভাইপার' এই বিষধর সাপগুলোর কামড়ে। এরমধ্যে শঙ্খচূঁড় গভীর জঙ্গলে থাকে সাধারণের সঙ্গে সংস্পর্শ হয় না এবং শাঁখামুটি খুব শান্ত স্বভাবের সাপ কাউকে কামড়েছে শোনা যায় না। দার্জিলিঙ পাহাড়ে 'মাউন্টেন পিট ভাইপার' (গুরবে) নামক

কেউটে

এক বিষধর সাপের কথা শোনা যায়। বর্ষা বন্যা প্লাবনে সাপের কামড় বাড়ে। শীতে কামড়ের সংখ্যা কমে যায়। সাপ কম্পনের মাধ্যমে অনুভব করে। শুনতে পায় না। কম দেখতে পায়।

পশ্চিমবঙ্গের ছটি প্রধান বিষধর সাপের মধ্যে কালাচ, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূঁড় ও শাখামুটি দেহের স্নায়ুতন্ত্র অবশ করে

(Neurotoxic)। এদের মধ্যে গোখরো, কেউটে ও শঙ্খচূড়ের ফণা আছে, আর কালাচ ও শাঁখামুটির ফণা নেই। চন্দ্রবোড়া দেহের রক্ততঞ্চন ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে (Hematoxic), এছাড়াও এরা কিছু মাত্রায় স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ করে। 'গ্রিণ পিট ভাইপার' (গেছো বোড়া) সামান্য মাত্রায় নিউরোটক্সিক। 'ইন্ডিয়ান রক পাইথন' (ময়াল বা অজগর) বিষহীন কিন্তু মাংসপেশী দিয়ে পেঁচিয়ে শিকারকে জাপটে ধরে। 'মনিটর লিজার্ড' (গোসাপ) ও 'চ্যামেলিয়ন' (তক্ষক) এর বিষ নেই, তারা সরীসৃপ কিন্তু সাপ নয়। সামুদ্রিক সাপ হৃদপিণ্ডের

চন্দ্রবোড়া

মাংসপেশীকে অবশ করে (Myotoxic)। ঘরচিতি, দাঁড়াশ, জলঢোড়া, লাউডগা, হেলে, বেতআছড়া, কালনাগিনী প্রভৃতি সাপ বিষহীন। দাঁড়াশ ইঁদুর খেয়ে কৃষকের অনেক উপকার করে। সাপ নিরালায় থাকা (elusive) অন্যকে এড়িয়ে চলা (reclusive) প্রাণী। মানুষের দ্বারা সরাসরি বা দুর্ঘটনাবশত আক্রান্ত হলে বা আক্রমণের পরিস্থিতি হলে কামড়ায়। কেবলমাত্র কালাচ রাতে ঘুমন্ত মানুষের গা বেয়ে উঠে কামড়ায় এবং কামড়ের চিহ্নও পাওয়া যায় না। দেরীতে পেট ব্যথা, বারবার পায়খানার উপসর্গ নিয়ে রোগী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যায়, কামড় ধরা পড়ে না, প্রবল বিষক্রিয়ায় মারা যায়। মাটিতে না শুয়ে খাটে, তক্তপোষে বা মাচায় শুলে ও মশারি ব্যবহার করে ঠিকমত গুঁজে নিলে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। শাঁখামুটি কালাচ সাপ খায়।

নিউরোটক্সিক বিষে কামড়ের স্থানে প্রবল ব্যথা ও ফুলে যাওয়া, চোখ বন্ধ হয়ে আসা, ঝাপসা দেখা, মুখমণ্ডল অবশ হওয়া, কথা জড়িয়ে আসা, শ্বাস কষ্ট, পেট ব্যথা, লালা ঝরা, দেহ অবশ হয়ে যাওয়া, অজ্ঞান হয়ে শেষে মৃত্যু হয়। হেমাটক্সিক বিষে চামড়ার উপর লালচে দাগ হয়, পরবর্তিতে নাক, মুখ প্রভৃতি দৈহিক ছিদ্রগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকে, দেহের মধ্যেও রক্তক্ষরণ হয়, কিডনি সহ অঙ্গগুলো বিকল হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

বিষধর সাপের কামড়ে রোগীর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে রোগীকে বাঁচানো যায়। ওঝা বদ্যি ঝাড়ফুঁক করে দেরীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে আনলে রোগীর বিপদ বাড়ে। যে কোন সাপে কামড়ালেই রোগীকে আশ্বস্ত করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষতস্থান যতটা সম্ভব না নাড়িয়ে হাল্কা স্প্লিন্ট (Splint) সাপোর্ট দিয়ে নিয়ে গেলে ভালো, বাঁধনের কোনো ভূমিকা নেই। বাঁধন দেওয়া থাকলে চিকিৎসা শুরু করার পর আস্তে আস্তে খুলতে হবে। সমস্ত সাপে কামড় দেওয়া রোগীকে একদিন অন্তত হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রাখা উচিত। বিষের লক্ষণ দেখা গেলে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ইঞ্জেকশন অ্যান্টিভেনাস সেরাম (এ.ভি.এস.) দিয়ে দ্রুত

কালাচ

চিকিৎসা শুরু করা উচিত এবং এভিএস এর মাত্রা রোগীর দেহে বিষক্রিয়ার মাত্রার সাথে বাড়াতে কমাতে হবে। এর সঙ্গে সাকশান, অক্সিজেন, ড্রিপ প্রভৃতি এমার্জেন্সি সাপোর্ট দিতে হবে। নিউরোটক্সিক বিষে এট্রোপিন ও নিওস্টিগমিন ইঞ্জেকশন সঠিক ডোজে ব্যবহার করতে হবে। আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্য অ্যাড্রিনালিন এবং লাইফ সাপোর্টযুক্ত অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সাপের কামড় প্রতিরোধে গৃহ এবং গৃহের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ফাটল ও গর্তগুলো বুজিয়ে দিতে হবে। চলার পথে বিশেষত ভোরে, সন্ধ্যায় ও রাতে সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। টর্চ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। ফুল প্যান্ট ও জুতো-মোজা পরে থাকলে অনেক নিরাপদ। ভিয়েতনাম, চিন, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এবং আমাদের কেরল রাজ্যের মত কৃষকদের গামবুট এবং মৎস্যজীবীদের জাল ফেলা ও গোটানোর সময় গ্লাভস ব্যবহার করলে সর্পদংশনের প্রকোপ কমবে। দাঁড়াশ, শাঁখামুটি প্রমুখ সাপ, বেজি প্রভৃতি সংরক্ষণ করলে কালাচ, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়ার বৃদ্ধি কমবে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পর্যাপ্ত উষ্ণতা সহনশীল এভিএস সহ ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের সুষ্ঠ, সরবরাহ রাখতে হবে এবং চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে কলমে সাপের কামড়ের চিকিৎসার তালিম দিতে হবে। অন্যদিকে পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য দপ্তর প্রভৃতির সাহায্যে মানুষকে সচেতন করতে হবে সাপের কামড়ে ঘাবড়ে না গিয়ে ওঝা-বদ্যির কাছে সময় নষ্ট না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসতে। ওঝা-বদ্যিদেরও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সহায়ক হিসাবে নিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে তারা সাপের কামড়ে মানুষকে বুঝিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসবেন এবং গ্রামাঞ্চলে এ.এন.এম., আশা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজে সহায়তা করবেন।

No, COVID has not brought about a Significant Game Change in International Health Co-operation

Claudio Schuftan, People's Health Movement, Ho Chi Minh City, Vietnam

Short lead text : No, it has not taken the pandemic to acknowledge the setbacks in international health cooperation. Its shortcomings and short-sightedness have been with us all along.

Yes, The COVID-19 pandemic has been changing the global health landscape. But I contend it has not been a true game changer in international health cooperation.Take, for instance COVAX, the ACT Accelerator and the Country Readiness and Delivery workstream: Contrary to what WHO, UNICEF and GAVI claim, these three 'vaccines pillars of the access to COVID-19 Tools'. Through the CRD workstream, WHO, UNICEF, and GAVI working together at the global and regional levels were supposed to develop and disseminate adaptable global resources (e.g., guidance, trainings, tools, and communication materials) and coordinate and provide technical assistance to support the implementation of COVID-19 vaccines. By now, we have seen that these resources had a late start, were unsatisfactory in delivering sufficient vaccine doses to countries rendered poor and were of little help to governments and health workers to implement the needed range of strategies to increase the uptake of COVID-19 vaccination.(https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery)

Yes, COVID 19 has significantly reshaped health systems and policies. But not in any major way the manner in which organizations involved in international health cooperation are operating. Proof of this reshaping is that health systems were so taken up by pandemic responses that other vital curative and preventive services suffered. Add to this the burn out of health staff and its consequences still with us today.

Yes, the effects of COVID-19 have set back economic progress in most countries, erasing hard-won gains, including those on the struggle against poverty. But, really, the pandemic has mainly rather aggravated (and exposed) the longstanding structural drivers of health inequalities already present at least since the MDGs (200-2015), as well as in the SDGs (2015 on). The 2030 Agenda has basically put on hold ongoing efforts and gutted progressive policies (e.g. on HIV, TB and malaria) to solve the challenges, inequalities and disparities that have only been laid bare once again by the global COVID-19 pandemic.

In short, I contend it has not taken the pandemic to acknowledge the setbacks of SDGs progress since the SDGs rather already started-off with those challenges, inequalities and disparities and have little to show for at mid-term to 2030.

Given the interest of this 'Swasthya Siksha Unnayan's readership, and to begin with, be cognizant of the fact that, although the SDGs explicitly mention the right to water, to health and to education as universally guaranteed human rights, access to affordable and sufficient food is not given such recognition (see reference below). The right to food is not even mentioned in the SDGs text, i.e., contrary to the international consensus reached during the past 50 years, food is not regarded as a human right in the SDGs document. I do not need to convince the readers of how the pandemic impinges on the right to food, both on what we are seeing so far and on what we can certainly foresee.

The SDGs road map simply assumes that market mechanisms will suffice to secure nutritious and safe food for all. Well, the market, has done its share of damage in the pandemic --you just need to watch your news on TV. One can only question how and why the right to food disappeared from such an important international agreement as the SDGs. To explain this fact, be aware that the full realization of this human right is not favored by the openly adamant US opposition, as well as the dual EU attitude evident during the negotiations of the SDGs.The defense of corporate interests in this attitude can only be suspected. (*No right to food and nutrition in the SDGs: mistake or success?, Jose Luis Vivero Pol, Claudio Schuftan, DOI: 10.1136/bmjgh-2016-000040 Published 7 June 2016*)

I dare say that the fight against malnutrition and the achievement of the United Nations 'Zero Hunger Challenge' (*http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml*) will, therefore, not be guided by the human right to adequate food and nutrition– COVID or not.

This all should not surprise you. Where do we see economic, social and cultural rights of affected populations mentioned in the vast (overwhelming?) COVID black and grey literature and social media? The human rights aspects over-and-over brought up have to do with civil and political rights (resisting vaccination, masks use, lockdowns, school closures…) pounded on

us day-in-day-out. The (false) arguments fall back on people's freedoms being curtailed (?). Have the 'resistors' ever asked themselves where their freedom clashes with others' freedom to be free of COVID? Or with the freedom to have a bed in an ICU overcrowded with unvaccinated resistors?

We are asked how we think we can positively influence the course of events? Well, a lot is already happening with public interest CSOs and social movements taking different actions. West Bengal, India 'Joint Platfarm of Doctors' has submitted good proposals to the Government and the Public.

As relates to the nutrition part of the international cooperation responsibility, I would make a call to influence the development of national legal frameworks that do include the right to food; that further come-up and implement schemes similar to those guaranteeing universal access to health and to education--but for food. Human rights-friendly countries and public interest CSOs are to keep a vigilant attitude so as to defend the agreed minimum standards of the right to food in international negotiations (including trade) and national programs. It will be about de-constructing the dominant narrative of food as a commodity so as to replace it by a human rights narrative placing food squarely as a human right, a commons and a public good.

A caveat here : Extremely important will be the vigilance of the rolling out of the various streams and coalitions coming out of the UN Food Systems Summit (that FIAN and others have serious reservations about mostly in relation to conflict of interest issues). No less important will be the vigilance of the activities of SUN and of One Nutrition since all of these will have activities dubiously labeled as 'nutrition responses in the realm of COVID'.

activities dubiously labeled as 'nutrition responses in the realm of COVID'.

1. **COVAX :** It aims to accelerate the development and manufacturing of COVID-19 vaccines, and guarantee fair and equitable access for every country. **COVAX** is co-led by the coalition for Epidemis Preparedness Innovations (CEPI), GAVI and WHO, with UNICEF as a key delivery partner and PAHO on the procurement agent in the Americas.
2. **ACT Accelaratar :** COVAX is the vaccines pillar of the **Access top COVID-19 Tools (ACT) Acceleratar, The ACT Accelerator** is a ground-breaking global cellaboration to accelerate the development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines.
3. **WHO : World Health Organization**; HQ : Geneva, Switzerland, Founded in 1948
4. **UNICEF : United Nations International Childrens' Emergency Fund**. HQ : New York City, the USA; Founded in 1946
5. **GAVI : Global Alliance for Vaccines & Immunisation**; HQ : Geneva, Switzerland. Founded 2000
6. **PAHO :** The Pan American Health Organisation; HQ : Washington, D.C., the USA. Founded in 1902
7. **MDGs : Millennium Development Goals** (2000-2015)
8. **SDSs : Sustainable Development Goals** (2015-2030)
9. **CSO : A Civil Society Organisation**.
10. **FIAN :** FAIN International is a global human right organization that advocates for the right to adequate food and nutrition. HQ : Heidelberg. Germany; founded in 1986
11. **SUN :** Scaling Up Nutrition (SUN) Movement is a renewal effort to eliminate malnutrition, based on the priniciple that everyone has a right to food and good nutrition. 193 member countries. Hosted by United Nations Office for Project Service (UNOPS) headquartered in Geneva, Switzerland.
12. **One Nutrition :** It is a movement that makes us consider animal health and human health intimately the centre when animals are given antimicrobials for optimal growth not for health.

বৈদ্যুতিক গাড়ি

জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি এবং দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে ভারত সহ সারা বিশ্বে বৈদ্যুতিক গাড়ি নিয়ে চর্চা চললেও বৈদ্যুতিক গাড়ি দাম বেশি ও গাড়ি চার্জ দেওয়ার পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে এই গাড়ি বিক্রি কম। কেন্দ্র সংশোধিত আর্থিক সুবিধা প্রকল্পে (ফেম ২) বাড়তি সুবিধা দেওয়ায় গাড়ি শিল্প ২০২২-এ ১০ লক্ষ গাড়ি বিক্রির আশা করেছে। কারণ বৈদ্যুতিক গাড়ি চালানোর খরচ অনেক কম। দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, চন্ডীগড়, চেন্নাই প্রভৃতি শহরে চার্জিং স্টেশনের ভাল পরিকাঠামো গড়ে উঠছে। বিদেশে এক্ষেত্রে নরওয়ে, জার্মানি প্রভৃতি দেশ অনেক এগিয়ে। আন্তর্জাতিক গাড়ি নির্মাণ সংস্থার মধ্যে টেসলা, ভলভো, অডি, বিএমডব্লিউ, রেনল্ট, ফোর্ড, শেভ্রলে, পোর্শে, নিশান, হণ্ডা, হুন্ডাই প্রভৃতি বৈদ্যুতিক গাড়ির বিভিন্ন মডেল নিয়ে হাজির। ভারতে টাটা, মারুতি, মাহিন্দ্রা প্রভৃতি সংস্থা।

Vaccines , that received Emergency Use Authorisation by WHO

Name of candidate vaccine	Developer	Type of vaccine	No. of doses	Schedule	Route	Target population	Vaccine efficacy
Covaxin **(Booster after 6 months of 2nd Dose)**	Bharat Biotech in collaboration with National institute of Virology, Pune India. (ICMR Institute)	Whole-Virion Inactivated	2	0 , 28 days	IM	≥18 yrs	78-100% after second dose
Covishield in India **Vaxzevria in UK** **(Booster after 6 months of 2nd Dose)**	University of Oxford and AstraZeneca Phase 3 Trial done in India under Serum Institute of India, Pune	Non-Replicating Viral Vector	2	0 , after 12-16 wks	IM	≥18 yrs	70-90% after second dose
Moderna Covid 19 Vaccine (Booster after 5 months of 2nd Dose)	Moderna -an American pharmaceutical in Cambridge, Massachusetts	LNP-encapsulated mRNA	2	0,28 days	IM	≥15 yrs	90% - 14 days after second dose
Pfizer-BioNtech **Trade name in USA-Comirnaty** **Trade name in China - Fosun–BioNTech COVID-19 vaccine** **(Booster after 5 months of 2nd Dose to ≥ 12 yrs)**	BioNTech, a German company developed the vaccine in collaboration with Pfizer, an American company In China, BioNTech is partnered with China-based Fosun Pharma for developing the vaccine	LNP-mRNAs	2	0,28 days	IM	≥5 yrs (vaccine is little Different from that which is given to ≥12 yrs)	90% - 14 days after second dose
Inactivated COVID-19 Vaccine (VeroCell)	Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. (BIBP)	Inactivated whole virion platforms.	2	3-4 wks apart	IM	≥18 yrs	79%
Corona Vac	Developed by Sinopharm's Beijing Institute of Biological Products.	Inactivated whole virion platforms.	2	3-4 wks apart	IM	≥18 yrs	79%
Janssen	Johnson & Johnson	Viral vector vaccine	1		IM	≥18 yrs	
COVOVAX	Serum Institute of India, Pune	Recombinant nanoparticle prefusion spike protein formulated with Matrix-M™ adjuvant.	2	3-4 wks apart	IM	≥18 yrs	90%
NUVAXOVID	NOVAVAX	Recombinant nanoparticle prefusion spike protein formulated with Matrix-M™ adjuvant	2	3-4 wks apart	IM	≥18 yrs	90%

Corbevax	Developed by Texas Children's Hospital Center for Vaccine Development and Baylor College of Medicine in Houston, Texas licensed to Indian biopharmaceutical firm Biological E. Limited (BioE) for development and production	Protein subunit vaccine	2	4 wks	IM	12-14yrs	

Booster / Precaution Dose is giving third dose of COVID Vaccine to an adult person who has received 2 doses of any COVID Vaccine.

There are three reasons why an additional dose to be given:

1. In some people immune response to two doses are not adequate, specially the immunocompromised people. So an additional dose may help to build up the immunity.
2. With time, like any other vaccine immunity, COVID vaccine immunity wanes and is not sufficient to provide adequate protection.. So a third dose will help to maintain a better immune level.
3. If the body is losing immunity then it could come under attack from an emerging variant or if the performance of the vaccines are less or inadequate against some of the variants of concern that have emerged, then a third dose may be recommended.

[Compilation : Snigdha Banerjee]

Monkeypox - Epidemiology and Management

Compiled by Snigdha Banerjee

Monkeypox (MPX) is a viral zoonotic disease with symptoms similar to smallpox, although with less clinical severity.

1. Problem statement

Monkeypox has been reported as endemic in several other central and western African countries such as: Cameroon, Central African Republic, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Liberia, Nigeria, Republic of the Congo, and Sierra Leone. This has been also reported in certain non-endemic countries e.g. USA, UK Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Australia, Canada, Austria, Canary Islands, Israel and Switzerland.

There are four reported cases of monkeypox virus in India till date with one reported death in Kerala came from outside.

2. Epidemiology

Agent

Monkeypox virus (MPXV) is an enveloped double-stranded DNA virus that belongs to the Orthopoxvirus genus of the Poxviridae family.

Host

Natural reservoir is yet unknown. However, certain rodents (including rope squirrels, tree squirrels, Gambian pouched rats, dormice) and non-human primates are known to be naturally susceptible to monkeypox virus.

Incubation period : The incubation period (interval from infection to onset of symptoms) of monkeypox is usually from 6 to 13 days but can range from 5 to 21 days.

Period of communicability : 1-2 days before the rash to until all the scabs fall off/gets subsided.

Mode of transmission :

- Human-to-human transmission is known to occur primarily through large respiratory droplets generally requiring a prolonged close contact. It can also be transmitted through direct contact with body fluids or lesion material, and indirect contact with lesion material, such as through contaminated clothing or linens of an infected person.
- Animal-to-human transmission: may occur by bite or scratch of infected animals like small mammals including rodents (rats, squirrels) and non-human primates (monkeys, apes) or through bush meat preparation.

3. Clinical Features

Monkeypox is usually a self-limited disease with the symptoms lasting from 2 to 4 weeks. The case fatality ratio of monkeypox has historically ranged from 0 to 11% in the general population and has been higher among young children. In recent times, the case fatality ratio has been around 3-6%.

a. Common symptoms and signs

- Prodrome (0-5 days)

  i. Fever
  ii. Lymphadenopathy
  iii. Headache, muscle aches, exhaustion
  iv. Chills and/or sweats
  v. Sore throat and cough

- Skin involvement (rash)

  a. Usually begins within 1-3 days of fever onset, lasting for around 2-4 weeks
  b. Deep-seated, well-circumscribed and often develop umbilication
  c. Lesions are often described as painful until the healing phase when they become itchy (in the crust stage)

b. Complications

- Secondary infections
- Pneumonia, sepsis, encephalitis
- Corneal involvement (may lead to loss of vision)

4. Diagnosis

Samples required

- *Lesion roof
- *Lesion fluid
- *Lesion base scrapings
- *Lesion crust
- Nasopharyngeal swab/Oropharyngeal swab
- Blood
- Urine

Diagnostic modalities

For the confirmation of Monkeypox on the suspected clinical specimens :

a) PCR for Orthopoxvirus genus [Cowpox, Buffalopox, Camelpox, Monkeypox] will be done
b) If specimen will show positivity for the Orthopoxvirus, it would be further confirmed by Monkeypox specific conventional PCR or real time PCR for Monkeypox DNA
c) Additionally, virus isolation and the Next Generation Sequencing of clinical samples (Miniseq and Nextseq) will be used for characterization of the positive clinical specimens

5. Management

- Patient isolation
- Protection of compromised skin and mucous membranes
- Rehydration therapy and Nutritional support
- Symptom alleviation
- Monitoring and treatment of complications

6. Contact tracing

a. Definition of a contact

A contact is defined as a person who, in the period beginning with the onset of the source case's first symptoms, and ending when all scabs have fallen off, has had one or more of the following exposures with a probable or confirmed case of monkey pox:

- face-to-face exposure (including health care workers without appropriate PPE)
- direct physical contact, including sexual contact
- contact with contaminated materials such as clothing or bedding

b. Contact monitoring

a) Contacts should be monitored at least daily for the onset of signs/symptoms for a period of 21 days (as per case definition above) from the last contact with a patient or their contaminated materials during the infectious period. In case of occurrence of fever clinical/lab evaluation is warranted.
b) Asymptomatic contacts should not donate blood, cells, tissue, organs or semen while they are under surveillance.
c) Pre-school children may be excluded from day care, nursery, or other group settings.

d) Health workers who have unprotected exposures to patients with monkeypox or possibly contaminated materials do not need to be excluded from work duty if asymptomatic, but should undergo active surveillance for symptoms for 21 days.

7. Preventive Measures

- Avoid contact with any materials, such as bedding, that has been in contact with a sick person.
- Isolate infected patients from others.
- Practice good hand hygiene after contact with infected animals or humans. For example, washing your hands with soap and water or using an alcohol-based hand sanitizer.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) when caring for patients.
- Use masks and gloves when caring for patients.

Reducing the risk of human-to-human transmission

Surveillance and rapid identification of new cases is critical for outbreak containment. During human monkeypox outbreaks, close contact with infected persons is the most significant risk factor for monkeypox virus infection. Health workers and household members are at a greater risk of infection.

Infection Prevention and Control (IPC)

A combination of standard, contact, and droplet precautions should be applied in all healthcare settings when a patient presents with fever and vesicular/pustular rash. In addition, because of the theoretical risk of airborne transmission of monkeypox virus, airborne precautions should be applied as per risk assessment.

Clinical triage includes early recognition and immediate placement of patient in separate area from other patients (source control). All individuals, including family members, visitors and HCWs should apply standard, contact and droplet precautions.

Patient isolation

Patient should be managed in isolation, precautions should be taken to minimize exposure to surrounding persons, which include placing a surgical mask over the patient's nose and mouth-if tolerable to the patient-and covering any of the patient's exposed skin lesions with a sheet or gown.

Duration of Isolation Procedures

Affected individuals should avoid close contact with immunocompromised persons and pregnant women until all crusts are gone. Isolation precautions should be continued until all lesions have resolved and a fresh layer of skin has formed. [July 2022]

Hippocratic Oath: Classical Version & Modern Version

Hippocratic Oath: Classical Version

I swear by Apollo Physician and Asclepius and Hygieia and Panaceia and all the gods and goddesses, making them my witnesses, that I will fulfill according to my ability and judgment this oath and this covenant:

To hold him who has taught me this art as equal to my parents and to live my life in partnership with him, and if he is in need of money to give him a share of mine, and to regard his offspring as equal to my brothers in male lineage and to teach them this art-if they desire to learn it-without fee and covenant; to give a share of precepts and oral instruction and all the other learning to my sons and to the sons of him who has instructed me and to pupils who have signed the covenant and have taken an oath according to the medical law, but no one else.

I will apply dietetic measures for the benefit of the sick according to my ability and judgment; I will keep them from harm and injustice.

I will neither give a deadly drug to anybody who asked for it, nor will I make a suggestion to this effect. Similarly I will not give to a woman an abortive remedy. In purity and holiness I will guard my life and my art.

I will not use the knife, not even on sufferers from stone, but will withdraw in favor of such men as are engaged in this work.

Whatever houses I may visit, I will come for the benefit of the sick, remaining free of all intentional injustice, of all mischief and in particular of sexual relations with both female and male persons, be they free or slaves.

What I may see or hear in the course of the treatment or even outside of the treatment in regard to the life of men, which on no account one must spread abroad, I will keep to myself, holding such things shameful to be spoken about.

If I fulfill this oath and do not violate it, may it be granted to me to enjoy life and art, being honored with

fame among all men for all time to come; if I transgress it and swear falsely, may the opposite of all this be my lot.

Translation from the Greek by Ludwig Edelstein. From The Hippocratic Oath: Text, Translation, and Interpretation, by Ludwig Edelstein. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1943.

Hippocratic Oath: Modern Version

I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant:

I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow.

I will apply, for the benefit of the sick, all measures [that] are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism.

I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug.

I will not be ashamed to say "I know not," nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery.

I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life; this awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God.

I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems, if I am to care adequately for the sick.

I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure.

I will remember that I remain a member of society, with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm.

If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling and may I long experience the joy of healing those who seek my help.

Written in 1964 by Louis Lasagna, Academic Dean of the School of Medicine at Tufts University of the USA, and used in many medical schools today.

Charaka Shapath: Text in Devanagari with English translation

(Source Wikipedia)

The original text of Charaka Shapath in the Sanskrit language in the Devanagari script. Here the English translation of the same is reproduced below. The text and translation are taken mostly from Charaka Samhita, Shree Galabkuverba Ayurvedic Society, Jamnagar India, 1947, Volume II, pp. 865-871. The original Sanskrit version is also available as an ebook in the portal of the National Institute of Indian Medical Heritage, Hyderabad.[4]

Charaka Shapath: The English translation.

* The teacher then should instruct the disciple in the presence of the sacred fire, brahmanas and physicians.
* (saying) "Thou shalt lead the life of a bachelor (Brahmachari), grow thy hair and beard, speak only the truth, eat no meat, eat only pure articles of food, be free from envy and carry no arms. There shall be nothing that thou oughtest not do at my behest except hating the king or causing another's death or committing an act of great unrighteousness or acts leading to calamity.
* Thou shall dedicate thyself to me and regard me as thy chief. Thou shalt be subject to me and conduct thyself for ever for my welfare and pleasure. Thou shalt serve and dwell with me like a son or a slave or a supplicant. Thou shalt behave and act without arrogance and with care and attention, and with undistracted mind, humility, constant reflection, and with ungrudging obedience. Acting either at my behest or otherwise, thou shalt conduct thyself for the achievement of thy teacher's purpose alone to the best of thy abilities.
* If thou desirest success, wealth and fame as a physician and heaven after death, thou shalt pray for the welfare of all creatures beginning with the cows and brahmanas.
* Day and night, however thou mayest be engaged, thou shalt endeavour for the relief of patients with all thy heart and soul. Thou shalt not desert or injure thy patient even for the sake of thy life or thy living. Thou

shalt not commit adultery even in thought. Even so, thou shalt not covet other's possessions. Thou shalt be modest in thy attire and appearance. Thou shouldst not be a drunkard or a sinful man nor shouldst thou associate with the abettors of crimes. Thou shouldst speak words that are gentle, pure and righteous, pleasing, worthy, true, wholesome and moderate. Thy behaviour must be in consideration of time and place and heedful of past experience. Thou shalt act always with a view to the acquisition of knowledge and the fullness of equipment.

* No persons, who are hated of the king, or who are haters of the king or who are hated of the public, shall receive treatment. Similarly, those that are very unnatural, wicked and miserable character and conduct, those who have not vindicated their honour and those that are on the point of death and similarly women who are unattended by their husbands or guardians shall not receive treatment.
* No offering of meat by a woman without the behest of her husband or guardian shall be accepted by thee. While entering the patient's house, thou shalt be accompanied by a man who is known to the patient and who has his permission to enter and thou shalt be well-clad and bent of head, self-possessed, and conduct thyself after repeated consideration. Thou shalt thus properly make thy entry. Having entered, thy speech, mind, intellect and senses shall be entirely devoted to no other thought than that of being helpful to the patient and things concerning him only. The peculiar customs of the patient's household shall not be made public. Even knowing that the patient's span of life has come to a close, it shall not be mentioned by thee there where if so done it would cause shock to the patient or to others,
* Though of knowledge one should not boast very much of one's knowledge. Most people are offended by boastfulness of even those who are otherwise good and authoritative.
* There is no limit at all to the "Science of Life". So, thou shouldst apply thyself to it with diligence. This is how thou shouldst act. Again thou shouldst learn the skill of practice from another without carping. The entire world is a teacher to the intelligent and the foe to the unintelligent. Hence, knowing this well, thou shouldst listen and act according to the words of instruction of even an unfriendly person, when they are worthy and such as bring fame to you and long life, and are capable of giving you strength and prosperity."
* Thereafter the teacher should say this - "Thou shouldst conduct properly with gods, the sacred fire, the twice-born, the guru, the aged, the adepts and the preceptors. If thou hast conducted thyself well with them, the fire, the fragrances, the tastes, the precious stones, the grains and the gods become well disposed towards thee. If thou shouldst conduct thyself otherwise, they become unfavourable to thee."
* To the teacher that has thus spoken, the disciple should say "Even so". If he behaves as instructed, he deserves to be taught, else, he does not deserve to be taught. The teacher who teaches the worthy disciples will obtain all the auspicious fruits of teaching, those described and even others not described here and obtains all auspicious qualities for himself as well as for his disciples. Thus has been described the method of instruction. [Comp. : S. Banerjee]

● **মাকড়সার কামড় :** ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার, ব্রাউন রেক্লুস স্পাইডার—মাত্র কয়েকটি প্রজাতির মাকড়সার কামড়ে গুরুতর সমস্যা হতে পারে। সাবান ও জল দিয়ে দংশন স্থান ভালো করে ধুতে হবে। ঠাণ্ডা জল বা বরফ দেওয়া যেতে পারে। প্রদাহ দমনকারী মলম লাগানো যেতে পারে। ব্যথার ওষুধের সাথে অ্যান্টি হিস্টামিনিক, অ্যান্টি বায়োটিক প্রভৃতি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। গুরুতর হলে হাসপাতালে ভর্তি।

● **মৌমাছির কামড় :** এক্ষেত্রেও সাবান জল দিয়ে ধুয়ে প্রদাহ দমনকারী মলম লাগানো যেতে পারে। গুরুতর ভাবে বা অনেক মৌমাছি মিলে কামড়ালে অ্যানাফাইলেটিক শক দেখা দিতে পারে। তখন হাসপাতালে এনে জীবনদায়ী পরিষেবা দিতে হবে। ইঞ্জেকশন টিটানাস টক্সয়েডও দিতে হবে।

● **বোলতার কামড় :** দংশনের জায়গায় হুল থাকলে সেটা তোলার চেষ্টা করা, দংশন স্থান ভালো করে জল দিয়ে ধোয়া। মৃদু অ্যাসিড ভিনেগার ব্যবহার করা যেতে পারে। গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করতে হবে।

● **পেডেরুস বিটল (Nainobi Fly)** পোকার সংস্পর্শ : সংস্পর্শ হলে ঘসাঘসি করলে একধরনের টক্সিন বেরিয়ে লম্বাটে ঘা তৈরি করতে পারে। গায়ের মধ্যে টিপে মারা বা ঘসাঘসি না করে সরিয়ে দিয়ে সাবান জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ঘা হলে চিকিৎসা করতে হবে।

সংকলন : গৌতম মৃধা

চড়ুই পাখি

অজন্তা প্রবাহিতা

অনেকদিন বেঙ্গালুরুতে আছি। আকাশে বহুদিন ধরে চড়ুইয়ের দেখা না পেয়ে খুব অবাক হয়ে গেছিলাম। সব্বাইকে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছিলাম। অবশেষে নিম খাওয়া মুখ করে নোয়েল একটা ছবি তুলে পাঠালো, তাও অনেকদিন অপেক্ষা করে একজন চড়ুইয়ের ছবি তুলতে পেরেছিলো। ছবির সাথে একপাতা নালিশও ছিল আমার বিরুদ্ধে, 'তুমি যে কি কাজ দাও না আজকাল? জানো তো গত দশ বছরে চড়ুইয়ের সংখ্যা অনেক কমে গ্যাছে। এখন চট করে ওদের দেখা যায় না।'

অনেকেই ভাবছেন, বাব্বা! চড়ুই নিয়ে আদিখ্যেতা কেন? ওতো যখন তখন দেখা যায়। চড়ুই, শালিক, কাক, কবুতর, টিয়া, ঘুঘু, বুলবুল এদেরতো আমরা নিজেদের প্রতিবেশী বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু, লক্ষ্য করেছি কি আমাদের ঘরোয়া পাখি শালিক, বুলবুল, চড়ুইয়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে।

আমাদের প্রত্যেকেরই ছোটবেলার সাথে চড়ুইয়ের একটা সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল। প্রায় প্রতিটি বাড়ির ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা হতো। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের মতো এরাও বাড়ির একজন হয়ে থাকতো। মা, ঠাকুমার চাল ঝাড়বার সময় ফেলে দেওয়া ধান ও ভাঙা চাল ও খুদ টুকটুক খুঁটে খেয়ে আমাদের আশেপাশেই লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াতো। চড়ুই ও মানুষের সখ্যতা চিরকালের, মানে মানুষ যদি শহর ছেড়ে বনে যায় চড়ুইও সেখানে যাবে। সারা দুনিয়ার লোক চড়ুইকে এমন ভাবে চেনে যে আর কোনো পাখিকে সেভাবে চেনে না। খাবারের প্রাচুর্য্যর ওপরে এদের সংখ্যাটা কমে ও বাড়ে। এদের হাবভাব দেখে এদের ''এন্টারটেইনার''ও বলা যেতে পারে। এরা মোটেও মানুষকে ভয় পায় না। মুদির দোকান, মিষ্টির দোকান, রেশন শপ এসব খাবারের দোকানে বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়ে। চোখের নিমেষে এদের আসা যাওয়া। একটু খেয়াল হারালেই চাল,ডাল, গম চিনির বস্তায় বসে খাদ্যকণা ঠুকরে তোলে। এমনকি গদিতে বা টেবিলে যে চাল ডালের নমুনা সাজানো থাকে মানুষের পাশেই, তা টুক করে তুলে নিয়ে যেতে মুহূর্তও লাগে না। আবার কোণে আধমরা আরশোলা দেখলে তার ঠ্যাং ধরে টানাটানি করতেও ছাড়ে না।

বাড়ির গিন্নিরা এদের বেশ পছন্দ করে কারণ এরা ধেড়ে ইঁদুর বা নেংটি ইঁদুর থেকে কম ক্ষতিকর বলে। আর এরাও সেই ভালোবাসার অ্যাডভান্টেজ নিয়ে গেরোস্তর বাড়ির দেয়ালের গায়ে, কার্নিশে, ছবির পেছনে, স্নান ঘরের ফাটলে-খোঁদলে, খড়ের চালে টালি বা খাপড়ার ফাঁকে, যত কিছু খড়কুটো আবর্জনা জড়ো করে ঘর বানিয়ে ফেলে।

কোথাও বালির ঢিপি দেখতে পেলেই এরা মনের আনন্দে নেচে নেচে বালি স্নান করে নিজেকে পরিষ্কার করে নেয়।

স্বভাববশতঃ পুরুষ চড়াই গান গাইতে খুব ভালোবাসে। কোকিলের মতো গানের গলা নেই, তবু সে গাইবেই। যা অনেক সময় মানুষকে অস্থির করে তোলে সাথে চড়ুই গিন্নিও ভারি বিরক্ত হয়। আবার প্রজননের সময় গলার আওয়াজ একটু সরু হয়ে যায়। সাধারণ চেঁচামেচির চেয়ে একটু তফাৎ। তারসাথে গা ফুলিয়ে, কোমর বেঁকিয়ে ডানা দুটো দুপাশে বেঁকিয়ে লেজ অল্প তুলে নানা রকম কসরত করে স্ত্রী সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে। এরা বছরের যেকোনো

চড়ুই পাখি

সময়েই ডিম পাড়ে। সময়টা নির্ভর করে যেখানে বাস করে তার আবহাওয়ার ওপরে। তবে প্রধানত ডিম পাড়ে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বাসা তৈরি ও বাচ্চা প্রতিপালনে একে অপরকে সাহায্য করে। ডিম ফুটতে ১৪ দিন সময় লাগে। স্ত্রী পাখিই ডিমে তা দেয়। এক্ষেত্রে বলি, পুরুষ চড়াই এক্কেবারে ফ্যামিলি ম্যান। সবরকম ভাবে নিজের স্ত্রীর খেয়াল রাখে।

চড়ুই পাখির এই চিরপরিচিত রূপটা এখন কম দেখা যায় কারণ এরা সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। কারণ শহুরে মানুষের বাসস্থানের আধুনিকীকরণের জন্য এখন ঘুলঘুলি বা টালির চালে ফাঁকফোকরের অভাব ঘটেছে তার সাথে কমেছে গাছের সংখ্যা, এরা নিজের মতো বাসা বেঁধে থাকতে পারছে না। সময় মতো বংশ বৃদ্ধিও হচ্ছে না। ফলস্বরূপ দিনেদিনে এরা সংখ্যায় কমে আসছে। আজকাল সবাই এতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছি সত্যি করে জানি কি, কেমন আছে আমাদের এই প্রতিবেশী বন্ধুরা?

খুব ভালো করে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন আগের মতো ঝাঁক বেঁধে এদের আমাদের আশেপাশে দেখা যায় না।

যে কজনকে আমরা দেখতে পাই তারা সংখ্যায় ভীষণ কম। সবাই মিলে যদি ওদের একটু বাসা বানাবার জায়গা দেই এবং সামান্য খাবার তাহলে হয়তো আবার আমাদের আশেপাশে নেচে বেড়ানো চিরপরিচিত চড়ুই পাখিদের ঝাঁক আবার দেখতে পাবো।

চড়ুইয়ের ছবি : নোয়েল ফোনিং

নদী শাসনের পরম্পরা : সেকাল ও একাল

কল্যাণ রুদ্র

'ঈশ্বর যখন ইউফ্রেটিস নদী খনন করেছিলেন তখনই তিনি সেই বহমান জলস্রোতের তীরে সমৃদ্ধিও স্থাপন করেছিলেন' এমন কথাই ভাবতেন ব্যাবিলনের অধিবাসীরা। ভারতীয়দের চোখে নদী হল পবিত্র ও জীবনদাত্রী যার পলি ও জল এদেশের কৃষির মূল উপাদান। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান বা প্রয়োজনে নদীর জল অপরিহার্য; নদী তাই এদেশে মাতৃরূপে পূজিত হয়। আপাতবিধ্বংসী বন্যাও এখানে বয়ে আনে সৃষ্টির বার্তা। কৃষিজমিতে নতুন পলি ফেলে বন্যার জল নেমে গেলে কৃষকরা চাষ শুরু করতেন, কোনো রাসায়নিক সার ছাড়াই প্রচুর ফলন হত। ব্রিটিশরা আসার পর এদেশের নদীজল-পলির এই আন্তঃসম্পর্কটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা, তারপর উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পর শুরু হলো বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ। ১৯৪৭ সালে সাহেবরা বিদায় নিলেও নদী শাসনের পশ্চিমী প্রকৌশল থেকে গেল; নদীশাসনের দায়িত্ব পড়ল থমসন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বি ই কলেজ বা আই আই টি থেকে পাশ করা পশ্চিমী দর্শনে উদ্বুদ্ধ প্রকৌশলিদের ওপর। শুরু হল নদীশাসনের এক নতুন অধ্যায়।

'উন্নতির দেবালয়'—

বড় বাঁধের লাভক্ষতি নিয়ে পৃথিবীজোড়া বিতর্কের অন্ত নেই। বহু যুগ ধরেই মানুষ চেষ্টা করেছে বর্ষার জল সংরক্ষণ করে শুখা মরশুমে সেচের জন্য ব্যবহার করতে। পরে সংরক্ষিত জল বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালির চাহিদা মেটানো, মৎস চাষ ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে বাঁধগুলি ছিল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় ছোট, পরে বাঁধের আকার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার হুভার বাঁধ আজও নির্মাণ কৌশলের বিস্ময়, বলা হয় ওই বিশাল বাঁধটি চাঁদ থেকে খালি চোখে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী জুড়ে বহুবাঁধ নির্মিত হয়েছে। ২০০৯ সালে নির্মিত চিনের থ্রি গর্জেস ড্যাম বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম জলাধার যা ৪০০০ কোটি ঘনমিটার জল ধারণ করতে পারে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর চোখে বড় বাঁধ ছিল উন্নয়নের প্রতীক। তিনি ভেবেছিলেন, ''বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়''। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ, ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ধাক্কায় জাতীয় অর্থনীতি তখন বিপর্যস্ত। দেশজোড়া খাদ্যসংকট সামাল দিতে আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে গম আসছে কিন্তু সবার ক্ষুধা মিটছে না; সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে হবে আর সেইজন্য চাই সেচ ব্যবস্থার প্রসার। স্বাধীনতার পরেই ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নের ধারা মেনে শুরু হল নদী শাসনের এক নতুন যুগ। টেনিসি প্রকল্পের অনুসরণে তৈরি হল ডি ভি সি, এছাড়াও তৈরি হল ভাকড়া-নাঙ্গাল ও হিরাকুঁদ। দেশজুড়ে বহু নদীর বহমান ধারাকে বন্দি করে তৈরি হল পাঁচ হাজারের বেশি বড় বড় বাঁধ। প্রায় সবার অলক্ষে জলাধারের নিচে তলিয়ে গেল অন্তত চার কোটি মানুষের বাস্তুভিটে। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে জলাধারের নিচে যত জমি তলিয়ে গেছে তার মোট আয়তন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আয়তনের প্রায় সাত গুণ। ভারতে জলাধার নির্মাণের জন্য যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তারা প্রায় সবাই আদিবাসী, বলা যায় তারা তথাকথিত উন্নয়নের বলি হলেন। ১৯৪৮ সালে ওড়িশার হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশে নেহেরু বলেছিলেন, ''আপনাদের দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগ করতে হবে''। ১৯৪৮ সালে নেহেরুর পাশে দাঁড়িয়ে যে আদিবাসী রমনী ডি ভি সি জলাধারের উদ্বোধন করেছিলেন তার কথাও কেউ মনে রাখেনি। নেহেরুর সহকর্মী মোরারজি দেশাই-এর উক্তি আরও নির্মম। ১৯৬১ সালে হিমাচল প্রদেশের বিপাশা নদীর উপর একটি বাঁধের নির্মাণকালে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের বলেছিলেন, ''জলধারাটি নির্মিত হলে আমরা আপনাদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলব। যদি আপনারা চলে যান তো ভাল, অন্যথায় আমরা জলপ্লাবনে আপনাদের ডুবিয়ে দেব।'' শুধু মানুষেরই ক্ষতি হয়েছে এমন নয়, জলাধারের নিচে তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ন বনাঞ্চল, হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র। বাঁধ নির্মাণের পর একদিকে যেমন জলাধারে ক্রমাগত পলি জমেছে, অন্যদিকে ভাটির দিকে নদীখাত ক্রমাগত শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাঁধ থেকে ছাড়া উদ্বৃত্ত জলে ভেসে গেছে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এসব ঘটনা উন্নয়নের রূপকারদের মনে কোন দাগ কাটেনি। দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন লার্জ ড্যাম-এর পূর্বতন প্রেসিডেন্ট থিও ভ্যান রোব্রোইক বলেছিলেন - We need large dams and we are not going to apologize for it. Those in the developed countries, who already have everything put stumbling blocks in our way from the comfort of their electrically lit and air conditioned homes... The Third World is not ready to give up the construction of large dams, as much for water supply and flood control as for power... Hydropower is the cheapest and cleanest source of energy, but environmentalist don't appreciate that. Certainly large dam projects create local resettlement problems, but this should be a matter of local not international concern.

কিন্তু রোব্রোইক-এর উক্তি প্রসঙ্গে অন্য কিছু কথাও বলা প্রয়োজন। প্রথমেই আসা যাক বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে। সব জলাধারের ধারণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সাধারণত জলাধারে তিনটি স্তরে জল রাখা হয়।

নিচের স্তরটির নাম ডেড স্টোরেজ, যেখানে পলি জমে এবং ওই জল ব্যবহার করা যায় না। মধ্যবর্তী স্তরটির নাম লাইভ স্টোরেজ যেখানে সেচের জল সংরক্ষণ করা হয়। জলাধারের একেবারে উপরের স্তরে অতিবৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ জুলাই-অগাস্ট মাসে জলাধার পূর্ণ করে রাখে কারণ সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টি অনিশ্চিৎ - হতে পারে বা নাও হতে পারে। হলে পূর্ণ জলাধার উদ্বৃত্ত জল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন জলাধার থেকে ছাড়া জল আর ভাটি এলাকার বৃষ্টির জল মিশে বড় বন্যা ডেকে আনে; যেমন ঘটেছিল ১৯৭৮ ও ২০০০ সালে। দ্বিতীয় কথা হল একই জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজ করা যায় না। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধার থেকে ক্রমাগত জল ছাড়তে হয় ফলে সেচের জন্য বর্ষার জল শুখা মরশুম পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় না। বর্তমানে ডি ভি সি যে শক্তি উৎপাদন করে তার ৯৫% তাপ-বিদ্যুৎ। উত্তরবঙ্গের তিস্তা প্রকল্পেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে।

একথা আজ সরকারি প্রতিবেদনেও স্বীকার করা হয়েছে যে বাস্তুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি আর এত মানুষের চোখের জলে নির্মিত বড় বাঁধগুলি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। জলাধারে সংরক্ষিত জলের বেশির ভাগই বাষ্পীভূত হয়েছে বা খালের নিচের মাটি টেনে নিয়েছে। মাত্র ৩৮-৪০ শতাংশ জল সেচের কাজে লেগেছে। এই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে মাটির নিচের জলভান্ডার থেকে আর সেচের জলের যোগান দিতে গিয়ে ভূগর্ভ-জলের ভান্ডার আজ অনেক স্থানেই রিক্ত। সম্প্রতি নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা গেছে যে ২০০২-২০০৮ সালের মধ্যে দিল্লি ও পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় ১০৯ ঘন কিমি জল মাটির নিচ থেকে তোলা হয়েছে। নিবন্ধটির লেখকরা বলেছেন, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দিনে ওই এলাকার প্রায় ১১ কোটি মানুষ জলাভাবে বিপন্ন হবেন।

জীবনের শেষ পর্বে বড় বাঁধ নিয়ে নেহেরুর মোহভঙ্গ হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি দপ্তরের বার্ষিক সভায় তিনি বলেছিলেন - আমরা এক লোক দেখানো বৃহদায়তন প্রকল্প নির্মাণের বিপজ্জনক রোগে আক্রান্ত, আমাদের ফিরতে হবে ছোট ছোট প্রকল্পে আর সেই পথেই দেশের বৃহত্তর মঙ্গল। তাঁর সেই অনুধাবন উত্তরসুরীদের প্রভাবিত করে নি; তারপরও তৈরি হয়েছে অনেক বাঁধ। নানা প্রকল্পে টাকার যোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক। আর এই বিপুল ঋণ সুদ সহ শোধ করছে দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই।

উল্লেখ্য, ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সালের মধ্যে ভারতে খাদ্য শস্যের উৎপাদন ধীরে ধীরে পাঁচ কোটি টন থেকে ২৩ কোটি টন অতিক্রম করেছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির কৃতিত্ব কতটা সেচ ব্যবস্থার আর কতটা উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। জানা যায়নি ভূ-জীববৈচিত্রের ক্ষতির পরিমাণ। উল্লেখ্য ওই সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫২২ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১৮৬০ কিলোগ্রাম হয়েছে, কিন্তু উৎপাদন ৩.৫৬ গুণ বাড়াতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ১৭ ও চার গুণ। উল্লেখ্য, কীটনাশকের প্রয়োগ প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বাড়ছে। এত কিছুর পরও হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক এলাকাতেই নিম্নমুখি। সেচসেবিত এলাকা ২.২৬ কোটি হেক্টর থেকে প্রায় ৪.৫৫ গুণ বেড়ে ১০.২৭ কোটি হেক্টর হয়েছে। আরও বলা প্রয়োজন এই সেচ ব্যবস্থা মূলত ভূগর্ভ-জল নির্ভর, বড় জলাধারের অবদান সামান্য বললে অত্যুক্তি হয়। পশ্চিমবঙ্গের মোট কৃষিজমির মাত্র ৩৮ শতাংশ এলাকায় সেচের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু এই ব্যবস্থাও মূলত মাটির নিচের জল নির্ভর ক্ষুদ্র সেচ। বড় জলাধারগুলি থেকে মাত্র তিন শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় বড় বাঁধ

বড় প্রকল্প বাধা পায় কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালিতে, পরে ১৯৮০-এর দশকে নর্মদা ও তেহরি উপত্যকায়। সেই সময় থেকে মুক্তধারা নাটকটি হয়ে ওঠে বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের প্রেরণা ও হাতিয়ার। নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে মুক্তধারা মঞ্চস্থ হয় বহু আন্দোলনের মঞ্চে। সেই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি ক্রমশই আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মুক্তধারা রচিত হয়েছিল ১৯২২ সালে, ঠিক তার আগে ১৯২০-২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন জাপানেও। ইউরোপে তখন যন্ত্রসভ্যতা ও শিল্পায়নের রমরমা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে তৈরি হয়েছিল ২০০টি বড় বাঁধ, রুদ্ধ হয়েছিল বহমান জলস্রোত। ১৯১১ সালের আমেরিকায় একটি বাঁধ ভেঙে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাষ্পশক্তির আবিষ্কার, লৌহ, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার পরিবেশে নানা সংকটের জন্ম দেয়। এমনকি শিল্পবিপ্লবের ঢেউ বদলে দিতে শুরু করে আমাদের দেশের ভৌগোলিক রূপ। গঙ্গার তীরে গড়ে ওঠে বহু কলকারখানা, দূষিত হতে শুরু করে আমাদের জল, বাতাস ও মাটি। এইসব ঘটনা পরম্পরা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছিল আর সেই যন্ত্রণা থেকেই তিনি মুক্তধারা রচনা করেছিলেন।

কিন্তু মুক্তধারার ঘটনা পরম্পরার সাথে এই সময়ের বড় বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের মিল ও অমিল দুইই লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক ডোনাল্ড ওরস্টার তার 'রিভারস অব এম্পায়ার' গ্রন্থে লিখেছেন--জলসম্পদের উপর দখলদারি আসলে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের কৌশল। একথার সত্যতা অনুধাবন করা যায় উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ-এর কথায়, যখন তিনি বলেন ''শিব্‌তরাই-এর প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না, এত দিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিল।'' কিন্তু জল প্রকৃতির দান, সব মানুষের তাতে জন্মগত অধিকার। তাই তো বিশ্বজিৎ প্রশ্ন করেন, ''বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবীরা কমণ্ডলু থেকে যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?'' রাজা যখন উত্তর দেন ''শত্রু

দমনের জন্য" তখন স্পষ্ট বোঝা যায় মুক্তধারাকে রুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তার, এখানেই নাটকটি কালজয়ী হয়ে উঠেছে।

যন্ত্রসভ্যতা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে বশীভূত করার এক অদম্য ইচ্ছা বা ঔদ্ধত্যের জন্ম দেয়। সেই ঔদ্ধত্য ধরা পড়ে দূতের সঙ্গে বিভূতির কথোপকথনে— দূত বলেছিলেন "তারা বিশ্বাসই করতে পারেন না যে দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।" উদ্ধত বিভূতি উত্তর দিয়েছিলেন "দেবতা তাদের শুধু জলই দিয়েছেন আর আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি"। দূত আরও বলেছিলেন—"ক্ষেত শুকিয়ে মারাই কী বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?" বিভূতির প্রত্যুত্তর—"বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি জয়ী হবে এই ছিল উদ্দেশ্য"। প্রকৃতির উপর এই হৃদয়হীন নিপীড়ন রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছিল। ১৯২৪ সালে চিনে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন— We have for over a century been dragged by the prosperous West behind the chariot– chocked by the dust– deafened by the noise– humbled by our helplessness and overwhelmed by the speed. We agreed to acknowledge that this chariot drive was progress– and that progress was civilization. If we ever ventured to ask 'progress for what and progress for whom' it was considered to be ridiculously oriental to entrain such doubts about the absoluteness of the progress. Of late– a voice has come to us biding us to take count of not only the scientific perfection of the chariot but also the depth of ditches lying across the path.

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর কথা; তিনি তার 'ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার' গ্রন্থে লিখেছেন—প্রকৃতিকে আমরা জয় করেছি এমন এক আত্মতৃপ্তি যেন আমাদের গ্রাস না করে, প্রতিটি জয়ের জন্য প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নেবে। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রাথমিক ভাবে কিছু সুবিধা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কালক্রমে নানা কুফল' প্রথম অবস্থায় পাওয়া সুবিধাগুলিকে ধুয়ে মুঝে দেবে। আমরা প্রকৃতির থেকে আলাদা নই, পরন্তু রক্ত, মাংস, মস্তিষ্ক নিয়ে প্রকৃতির অংশ... অন্য প্রাণীদের তুলনায় আমাদের সুবিধা হল আমরা প্রকৃতির নিয়ম অনুধাবন করে তাকে কাজে লাগাতে পারি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বড় বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠলেও মুক্তধারায় বর্ণিত ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে বাস্তবের লক্ষণীয় অমিল আছে। বাঁধ নির্মাণের জন্য যে ভূ-প্রাকৃতিক সুবিধার প্রয়োজন হয় তা হল নদীর দু'পাশে ঢালু পাড় যাতে নদীর উপর আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ করে উজানে পর্যাপ্ত জল সংরক্ষণ করা যায়। এই জন্যই ভারতের সব বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছে পার্বত্য বা তরঙ্গায়িত অঞ্চলে; প্লাবিত হয়েছে আদিবাসী বা ভূমিপুত্র-কন্যাদের গ্রামগুলি, ডুবে গেছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। শুধু সর্দার সরোবর বাঁধের নিচেই তলিয়ে যাচ্ছে ১৪০০০ হেক্টর বনাঞ্চল ও ৩৫৫টি গ্রাম। ১১৩০০ হেক্টর কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ৪০০০ হেক্টর বনাঞ্চল কেটে ফেলা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাট মিলিয়ে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ১০ লক্ষ। ১২২ মিটার উঁচু বাঁধটি নির্মিত হচ্ছে গুজরাতে অথচ প্লাবিত হচ্ছে উজানে অবস্থিত মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। এখানেই বাঁধ নিয়ে বিতর্কের সূচনা। ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাঁধের উজানের আদিবাসী মানুষরা আর সেচের জল ও বিদ্যুৎ ভোগ করেন ভাটির মানুষরা। মুক্তধারা নাটকে কিন্তু এর বিপরীত চিত্রটি চোখে পড়ে। উত্তরকুট পার্বত্য অঞ্চল তরাই জলস্রোত রুদ্ধ করছে। শুকিয়ে মরছে ভাটি এলাকার শিবতরাই। কিন্তু যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাঁরা যে আদিবাসীগোষ্ঠীর তা বোঝা যায় গুরুদেব ও ছেলেদের কথোপকথনে; ছেলেরা যখন বলছে- 'ওদের ধর্ম খারাপ আর ওদের নাক উঁচু নয়' তখন তা নিশ্চিতভাবেই এদেশের জনজাতিদের ইঙ্গিত করে। উচ্চবর্ণের মানুষদের জাত্যাভিমান নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে গুরুর কথায় যখন তিনি ছেলেদের শেখান যে নাক উঁচু হলে জাতও বড় হয় আর তারাই সকলের উপর জয়ী হয়। জনজাতিদের প্রতি স্বঘোষিত উচ্চবর্ণের মানুষদের উন্নাসিকতা ভারতীয় সংস্কৃতির চিরকালীন অসুখ। সুপর্ণখার প্রতি লক্ষণের আচরণেও সেই অসুখই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন নদীর স্রোত অপ্রতিহত ভাবে বয়ে যাক। সেই গতিশীল স্রোতেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবন দর্শন। গঙ্গার বহমান স্রোত কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি লিখেছিলেন— সেই আমাদের পুরানো গঙ্গাতীর এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কী গভীর আনন্দ দিয়েছে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে। আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। (ভানুসিংহের পদাবলী)। কীর্তিনাশা পদ্মা—ধ্বংস আর সৃষ্টি যার নেশা, রবীন্দ্রনাথের চোখে অন্যরূপে ধরা দিয়েছিল। বর্ষার ভরা গঙ্গাকে দেখে তিনি লিখেছিলেন— তাকে মনে করলে আমার কালীমূর্তির কথা মনে হয়— নৃত্য করছে, ভাঙছে এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে ... তীব্র স্রোত যেন চক চকে খড়গের মতো, দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলে ছারখার করে দিয়ে চলেছে। অথচ শুখা মরশুমে সে শীতকালের সরীসৃপ, বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিস্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। (পৃঃ ৩৯৭ রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড ১১, পঃবঃ সরকার)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেখা সেই নদী এখন অনেক বদলে গেছে। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পর ভাঙনের তান্ডব অনেক বেড়েছে- একথা বলছে রাজ্য সেচ দপ্তর। এমনও আশঙ্কা করা হচ্ছে গঙ্গা হয়তো ভবিষ্যতে ফারাক্কা ব্যারেজকে এড়িয়ে নতুন পথ করে নেবে। ব্যারেজের পরিকল্পনার সময় খেয়াল রাখা হয়নি গতিশীল জলের পথ রুদ্ধ করলে কত পলি ব্যারেজের উজানে জমে যাবে। গঙ্গা প্রতি বছর প্রায় ৭৩ কোটি টন পলি বয়ে আনে, গত তিন দশকে পলি জমে নদী খাত এখন অগভীর। নদী নতুন পথ খুঁজছে ভাঙছে গ্রামের পর গ্রাম। ভাঙন-দুর্গত মানুষ আশ্রয়ের খোঁজে দিশেহারা। সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে পালাচ্ছেন ঘর হারা মানুষ। মালদহে লক্ষাধিক মানুষ ওপারের চরে নতুন করে ঘর বেঁধেছেন; তারা

কার্যত রাষ্ট্রহীন কারণ রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার ওই নতুন বসতিকে স্বীকৃতি দেয় নি। গঙ্গার এই ভাঙা-গড়া নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন- পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় থুয়ে আসছে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় লাঠালাঠি, কাটাকাটি। (পৃ. ৩৬৮ রবীন্দ্র রচনাবলী, খন্ড-১১, পঃবঃ সরকার)। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং আনুচ্ছেদে প্রতিটি নাগরিককে জীবনের বা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চরের মানুষদের কাছে সংবিধানের সব প্রতিশ্রুতি অর্থহীন, তাদের জীবনে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব নেই, তাঁরা বেঁচে আছেন এক স্বশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে।

প্রগতি মরীচিকা—

জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কৃষিব্যবস্থার প্রসার, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, শিল্পায়ন, নগর-সভ্যতার বিকাশ প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে ক্রমশ আরও নিবিড় ও জটিল করেছে। একদিকে মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রকৃতির নানা অজানা দিক খুলে দিয়েছে, অন্যদিকে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্পের আঘাত লেগেছে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে। গ্রিনহাউস গ্যাসের প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়ছে, গলছে হিমবাহ, এগিয়ে এসে সাগর গ্রাস করেছে উপকূল, শুকিয়ে যাচ্ছে নদী, বিষিয়ে যাচ্ছে জল, ক্রমশ রিক্ত হয়ে যাচ্ছে হাজার বছর ধরে জমা মাটির নিচের জলভান্ডার, সংকুচিত হচ্ছে বনাঞ্চল, কমে যাচ্ছে জীববৈচিত্র, বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে মাটি, ফুসফুসে ঢুকছে কালো ধোঁয়া - যেন এক আঁধার গ্রাস করছে সভ্যতাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সবুজ বিপ্লবের কথা। স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতের খাদ্য উৎপাদন পাঁচ কোটি টন থেকে ২০ কোটি টন অতিক্রম করেছে; কিন্তু যথেচ্ছ রাসায়নিক সার আর কীটনাশক প্রয়োগের ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। চাষের জমি থেকে কেঁচো, মৌমাছিরা হারিয়ে গেছে; মাটির নিচের জলে ফ্লুরাইড বা আর্সেনিকের বিষ। সেই বিষ ঢুকছে খাদ্যশৃঙ্খলে। বিপন্ন বহু মানুষ। সময় এসেছে ফিরে দেখার- আমরা কোথায় ভুল করেছিলাম। বাঁচাতে হবে আমাদের পৃথিবীকে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন নদীকে তার ছন্দে বয়ে যেতে দিলেই সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল। কিন্তু ওই একবিংশ শতাব্দীতে নদীকে কতদূর মুক্ত রাখা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। এ প্রসঙ্গে ডব্লিউ আই ইংরিশ-এর একটি নিবন্ধ খুবই প্রাসঙ্গিক। ১৯০৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন — আমরা নদীশাসনের অজুহাতে যা কিছু করি তা প্রকারান্তরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা, আমাদের এই কার্যকলাপের একটি সীমা থাকা প্রয়োজন আর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সেই লক্ষণরেখাটি সঠিক ভাবে চিহ্নিত করার মধ্যে। অর্থাৎ নদীর সাথে সহাবস্থানই আমাদের অস্তিত্বের শর্ত। মনে পড়ছে ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনের কথা। ২০০১ সালে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলে ছিলেন আগামী প্রজন্ম যেন আমাদের এই বলে দোষারোপ না করে যে আধুনিক ভারত গড়ে উঠেছিল সবুজ পৃথিবীকে ধ্বংস করে ও এমন নির্দোষ ভূমিপুত্রদের উচ্ছেদ করে যাঁরা এদেশে কয়েক শতাব্দী ধরে বাস করতেন।

মহানন্দা কথা

সৌমিত্র চৌধুরী

সব মানুষের জীবনেই নাকি একটা নদী থাকে। কারোর মনের মধ্যে গঙ্গা। কারো জীবন ঘিরে তিস্তা। আবার অনেক মানুষের নিজস্ব নদী মহানন্দা।

সত্যি মহা আনন্দের নদী মহানন্দা। জল ছল ছল বিশাল নদী। অনেক জেলা ডিঙিয়ে, একাধিক রাজ্য পেরিয়ে, ভিন্ন দেশে গিয়ে শেষে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লম্বা নদীটা।

উৎপত্তি হিমালয় পাহাড়ের দার্জিলিং জেলায়। পাহাড় থেকে নেমে এসে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে সাপের মত এঁকেবেঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে মহানন্দা ঢুকেছে বাংলাদেশে পচাগড়ে। তারপর আবার পশ্চিমবঙ্গ। উত্তর দিনাজপুর জেলা, বিহারের কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কাটিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদা হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বড় একটা বাঁক নিয়েছে। অতঃপর ভিন্ন দেশে গমন। ঢুকে পড়েছে বাংলাদেশে। তারপর, কিছু পথ ২০-২২ কিলোমিটার, পেরিয়ে নবাবগঞ্জের গোদাগাড়ীর কাছে পদ্মায় গিয়ে মিশেছে।

কতটা দীর্ঘ নদী বুঝতেই পারা যাচ্ছে। হিমালয় থেকে নেমে দু'বার বাংলাদেশ গমন। উত্তরবাংলার অনেক জেলার তৃষ্ণা মিটিয়ে বিহারেও গিয়েছে সে নদী। লম্বা চলন তার। দীর্ঘ আঁকাবাঁকা সে নদীর গতিপথ। বিশাল তার ব্যাপ্তি। লম্বায় ৩৬০ কিলোমিটার। বেশির ভাগটাই, মানে ৩২৪ কিলোমিটার, ভারত ভূখণ্ডে বহমান। দৈর্ঘ্যে শুধু যে বিশাল তাই নয়। প্রস্থেও বেশ বড়। সব নিয়ে নদীর বিশাল ব্যাপ্তি, ২০৬০০ স্কোয়ার কিলোমিটার।

নদীর আকার আর ব্যাপ্তির পরিচয় মেলে ব্রিটিশ আমলের সার্ভেয়ার হান্টারের (WW Hunter) লেখনিতে (১৮৭৬)। হান্টার সাহেব লিখেছেন, মহানন্দা অতি বিশাল চওড়া আর খুব গভীর এক নদী। বড় বড় মালবাহী জাহাজ চলত এর বুকে। কত বড় মালবাহী জাহাজ? '৫০০ মন বোঝা টানবার ক্ষমতা থাকত জাহাজগুলোর'। মানে প্রায় ১৯ টন।

এত বড় নদীর এখন কী হাল? সেই বিশাল নদী এখন শুকিয়ে মৃতপ্রায়। শিলিগুড়ি আর মালদা শহরে নর্দমার মত বইছে অতীতের এই বেগবতী নদী।

হান্টারের লেখার দেড়শ বছরে ঘটেছে অনেক ঘটনা। ভারত ভেঙে অন্য দেশ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নদীর তো ভাগ হয়নি। চলেছে

আপন মনে। সর্বাঙ্গে দূষণ আর আবর্জনার স্তূপ। নর্দমার মত স্রোতহীন বইছে অতীতের খুব বড় এক নদী। শীর্ণ নদী শুকিয়ে গিয়ে এখন মৃত্যুশয্যায়। বিশাল নদীখাতে চড়া পড়েছে। মাঝখান দিয়ে একটেরে সুতোর মত সরু জলধারা।

নদীর চরের উপরেই, এপার ওপার জুড়ে, মানুষের বসবাস। জীবন জীবিকার নিত্য দিনের জীবন চর্চা। মানুষ, গরু, শুয়োর, কুকুরের বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশছে। শহরের নিকাশি নালা থেকে যাবতীয় আবর্জনা বেরিয়ে এসে প্রতিনিয়ত নদীতে জমা হচ্ছে। ফলত, নদীটাও এখন নালার নামান্তর।

অথচ ১৯৬০-৭০ সালেও বেশ চওড়া নদী ছিল। বর্ষাকালে শহরে উঠে আসত নদীর জল। শুধু বর্ষায় নয়, শীতেও জল থাকত নদীতে। নৌকা করে মহানন্দা পেরিয়ে 'মালদা কোর্ট স্টেশন'-এ গিয়ে ট্রেন ধরতে হত। তখন স্টেশন বলতে ছিল সেটাই। ১৯৬৪-৬৫ সালে মহানন্দার বুকে পিলার তুলে তৈরি হল ব্রিজ। সেই ব্রিজ পেরিয়ে মালদা থেকে ওল্ড মালদা পৌছানো সহজ হয়। সাঁকো তৈরি হল বটে কিন্তু তার ফলে চড়া পড়তে লাগলো মহানন্দার গভীর বুকে। নদী খাত ভরে উঠতে লাগলো।

মহানন্দা নদী

ব্রিজ তৈরির আগে দুটো মাটির বাঁধ তৈরি হয়েছে শহরে। বর্ষা কালে নদীর জল আটকে শহরটাকে (ইংরেজবাজার) বাঁচানোর উদ্দেশ্যে। শহর বেঁচেছে কিন্তু নদী শুকিয়ে মরতে বসেছে।

একাত্তর সালেও শিলিগুড়ি শহরে দেখেছি মহানন্দা। বেশ চওড়া, বেগবতী এক নদী। নদীর বুকে একটা সেতু ছিল তখন। সেই মহানন্দা সেতু পেরিয়ে ঢুকতে হত শিলিগুড়ির হিল কার্ট রোডে। কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল। যান চলাচলে গতি আনতে আরও একটা ব্রিজ তৈরি করা হল বর্তমান ব্রিজের পাশেই। ফলত, মহানন্দা শুকিয়ে কাঠি হয়ে যেতে আরম্ভ করল। শিলিগুড়ির মহানন্দায় এখন পা ডোবে না।

আর মালদায় নদী খাতের যে স্বল্প স্থানে সামান্য জল থাকে, সেখানে কোমর ডোবে না। হেঁটে পারাপার করা যায়।

অথচ ত্রিশ বছর আগেও মালদার মহানন্দায় মালবাহী নৌকা চলত। হবিবপুর থেকে বুলবুলি হয়ে মহানন্দার বুকে নদী পথ দিয়ে ধান ঢুকত শহরে।

সে সব এখন গল্পকথা। পঞ্চাশ বছরের নদীটা ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিৎ, উত্তরবাংলার দুই ডজন নদী সম্পূর্ণই হারিয়ে গেছে।

এখন কেমন আছে মহানন্দা? মৃতপ্রায় শীর্ণ জলের ধারা বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে নিঃশব্দে নীরবে।

কেন এমন হল? উত্তরে বলতে হয় অনেক কথা। প্রধানত সরকারি স্তরে অবহেলা ও দুর্নীতি। ব্যক্তিগত স্তরে মানুষের উদাসীনতা। আরেকটি বড় কারণ, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত নগরায়ন। জনবিস্ফোরণের চাপে বসতি বেড়েছে অতি দ্রুত। পরিকল্পনার অভাব হেতু শহরের যাবতীয় নালা নর্দমার জল সরাসরি নদীতে গিয়ে মিশেছে। ঘটেছে নদীর দূষণ।

দূষণ মুক্তির কথাও ভাবা হয়েছে। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ২০০২ সালে মহানন্দা ও শিলিগুড়ি শহরের আরও দু'টো নদীর (জোড়াপানি-ফুলেশ্বরীর) দূষণ রোধের উদ্দেশে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। শহরের নিকাশি আবর্জনা পরিশোধন করে মহানন্দা—জোড়াপানি-ফুলেশ্বরী নদীতে ফেলবার উদ্যোগ শুরু হয়। তিনটি 'স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' (এসটিপি) তৈরির প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পেশ করে রাজ্য সরকার। প্রস্তাব মেনে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বরাদ্দ করে ৩৭ কোটি টাকা। প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব পায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)।

কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ মিললেও নদী সংরক্ষণের কাজ বাস্তবত শূন্য। এসটিপি তৈরির জমি, পাইপ বসানোর জায়গা মিলতে বছর গড়িয়ে যায়। ২০০৬ সালে দু'টি এসটিপির জন্য প্রয়োজনীয় জমি হাতে আসে। জোড়াপানি ও ফুলেশ্বরীর জল পরিশোধনের জন্য ডাবগ্রামে এসটিপি তৈরি হয়। উদ্দেশ্য কী ছিল? শহরের যাবতীয় দূষিত নোংরা জল কয়েক দফায় পরিশ্রুত করা হবে। প্রথমে ডাবের খোলা, প্লাস্টিক, থার্মোকল জাতীয় আবর্জনা ছেঁকে ফেলা। দ্বিতীয় দফার জল পরিশ্রুত করে জীবাণু মুক্ত করা হবে। তৃতীয় দফায় অর্থাৎ পরিশোধনের পরে দূষণ মুক্ত জল পাম্প করে ফেলা হবে নদীতে। ফলে, নদীর বুকে শহরের জঞ্জাল-আবর্জনা মিশবে না। আবর্জনায় ভরে উঠবে না নদীখাত।

কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই। দুটি এসটিপি-র সিংহভাগ কাজ হয়ে যায় দ্রুত (২০০৯-২০১০ সালের মধ্যে)। কিন্তু পাম্প বসানোর কাজই সম্পূর্ণ হয়নি তখন। ২০১১ সালে এসটিপি দুটি চালু করার ব্যাপারে তোড়জোর শুরু হয়। কিন্তু কাজ তেমন এগোয় নি। ২০১২-১৩ সালের মধ্যে এসজেডিএ-র বহু অর্থ (অন্তত ৬০ কোটি

টাকা) তছরুপ হয়। সংবাদ পত্রের খবর অনুযায়ী, বিষয়টি আদালত অবধি গড়ায়। অর্থ নয় ছয়ের অভিযোগে গ্রেফতার হন প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মালদহের তৎকালীন জেলাশাসক।

মালদার মহানন্দা। তার অবস্থাও শিলিগুড়ির অংশের মত। নর্দমার জল শোধন করে মহানন্দা নদীতে ফেলবার পরিকল্পনা ছিল স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির। অনেকগুলো জায়গা নর্দমার জল শোধনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কোথাও কোন দূষিত জল পরিশোধনের (ট্রিটমেন্টের) চিহ্ন চোখে পড়ল না।

ভারতে জলের অভাবে ধুঁকছে বড় বড় শহর। চেন্নাই বেঙ্গালুরু জল বিহীন। মুম্বাই দিল্লি সহ ভারতের ১২টি শহরে তীব্র জলাভাব। জল কষ্টে ভুগছেন দেশের ১০ কোটি মানুষ। জলসঙ্কটে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি কাজ। অনিবার্য পরিণতি খাদ্য সঙ্কট।

নদী খাল বিলে ভর্তি বাংলা ভূখণ্ডে জলের তীব্র অভাব সৃষ্টি হয়নি এখনও। তা যেভাবে নদী দূষণ এবং নদীর বিলুপ্তি ঘটছে তাতে কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিও জলের অভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অতীব সংকটময়। এখনই সতর্ক, সজাগ এবং সচেতন না হলে বিপদ অনিবার্য।

(সৌজন্য : তরাই গণ্ডার)

জল সংরক্ষণ—কেন জরুরি

রাজা রাউত

'জল'—অপর নাম জীবন। ধ্রুব সত্য এই কথাটি বিশেষ করে আজকের প্রেক্ষাপটে। বায়ুমণ্ডল-শিলামণ্ডল-জীবমণ্ডলে ব্যাপৃত হয়ে আছে এই জল। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের মূল আধারই হল জল। প্রতিটি কোষের প্রোটোপ্লাজমের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই জল। তাই, আমরা বলি একদম জল ছাড়া কোন জীবের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে কম বেশি ১৪৫.৪ কোটি ঘন কিলোমিটার জল আছে। এর মধ্যে ১৩৭ কোটি ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের লবণাক্ত জল। বাকি অংশের মধ্যে ৬ কোটি ঘন কিলোমিটার জল আছে মাটির নীচে ভৌম জল (Aquifer) হিসেবে এবং বাকি ২.৪ কোটি ঘন কিলোমিটার আছে পৃথিবীর দুই মেরুর বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সুউচ্চ পর্বতের গাত্রে জমাট বেঁধে (Glacier & Ice Staff)। এই জলগুলো তেমন ভাবে সরাসরি আমাদের কাজে লাগে না। খুব স্বাভাবিকই মানুষের নানা প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য স্বাদু জলের পরিমাণ নিত্যান্তই কম। নদী-নালা-খাল-বিল-ডোবা-পুকুর প্রভৃতি (Sweet Water) হল মানুষের ব্যবহার যোগ্য জলের প্রধান উৎস। বস্তুতঃপক্ষে, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, আমাদের মোট বারিমণ্ডলের মাত্র ০.০১ শতাংশ জল প্রত্যক্ষভাবে মানুষের নানান কাজে লাগে। এই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশই মানব সমাজের জীবন ও অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। জলকে আমরা 'প্রকৃতির মুক্ত দান' (Free gift of Nature) বলতে পারি। জল একটি পুনর্বীকরণযোগ্য সম্পদ (Renewable Resources) কিন্তু, বিপুল সংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটাতে এবং তার অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার ও অপচয় ক্রমশঃ তাকে দুষ্প্রাপ্য করে তুলবে আগামী দিনে যদি আমরা সময় থাকতে সচেতন না হই।

জনঘনত্বের ক্রমবর্ধমান চাপ, নগরায়ন এর দ্রুত বিস্তৃতি শিল্পায়ন, কৃষির উন্নতি, সেচব্যবস্থার অবৈজ্ঞানিক প্রসার এবং সর্বোপরি আমাদের ভোগবাদী মানসিকতার ফলে মাথা পিছু জলের যোগান ধীরে ধীরে কমে আসছে। পাশাপাশি নানান ভাবে পরিবেশ দূষণের জেরে জলের গুনমাণেরও অবনতি ঘটছে।

অথচ পদার্থ হিসেবে 'জল' কে আমরা অতি সাধারণ জিনিস মনে করি। কিন্তু জলের অসাধারণ কিছু ধর্ম আছে—

* জলের কণাগুলি নিজের সঙ্গে ও অন্য পদার্থের সঙ্গে থাকে।
* মাধ্যাকর্ষণ (Gravitational Force) কে অগ্রাহ্য করে মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে জল উপর দিকে উঠে আসতে পারে (Capillary Water)।
* পৃথিবীর প্রায় সকল বস্তুকে দ্রবীভূত করার ক্ষমতা রাখে (Universal Solvent)।
* জল গরম করলে বাষ্প হয়ে গ্যাসীয় আকার ধারণ করতে পারে, আবার, ঠাণ্ডা করলে জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হতে পারে।
* জলই হল একমাত্র পদার্থ যা ঠান্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় (ফলস্বরুপ, বরফ জলে ভাসে)।
* জলের নিজস্ব রং, গন্ধ ও স্বাদ নেই।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে গড়ে মাথাপিছু মানুষের ব্যবহার যোগ্য জলের পরিমাণ ৪০-৫০ লক্ষ লিটার তার সারা জীবনে। তবে, পৃথিবীর সর্বত্র এই জল সমভাবে বন্টিত নয়। কোনো অঞ্চলে যেমন জলের প্রাচুর্য্য তো কোথাও বা জলের তীব্র সংকট। জলের এই প্রাপ্যতা নির্ভর করে আবহাওয়া-জলবায়ুগত, ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক পরিস্থিতির উপর, মানবসমাজের তথাকথিত প্রযুক্তি-উন্নতির উপর এবং সর্বোপরি, কিভাবে আমরা জল ব্যবহার করছি-কতটা সংরক্ষণ করছি—তার উপর।

ব্যক্তি হিসেবে দেখলে আমাদের প্রতিদিন গড়ে ন্যূনতম তিন লিটার জল পান করি, রান্নার জন্য গড়ে তিন লিটার জল প্রয়োজন এবং অন্যান্য কাজে ন্যুনতম ১০ লিটার জল খরচ করি। গোটা বিশ্বের নিরিখে গড়ে প্রতিদিন ১০,০০০ মিলিয়ন টন জল আমরা ব্যবহার করি। উন্নত দেশগুলোতে জলের ব্যবহার আরও বেশি । একা আমেরিকাতেই ৩,৯০,০০০০ মিলিয়ন লিটার জল মাসে ব্যবহৃত হয়। আজ পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, এবং মধ্য এশিয়ার নানা শুষ্ক অঞ্চলে জনবসতির প্রসারের ফলে জলের

ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে তা ধারণযোগ্য নয়। শিল্পোন্নত দেশগুলিতেও জলের ব্যাপক চাহিদা ও ব্যবহার এমন যে নতুন উৎস থেকে জলের নতুন যোগান আনার সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। স্বচ্ছ জলের প্রাপ্যতা সম্পর্কে জগৎজোড়া সচেতনা গড়ে তুলতে আশির দশকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ''আন্তর্জাতিক পানীয় জলের জোগান ও নিকাশি দশক'' (International Drinking Water Supply and Sanitation Decade) হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে পানীয় জল পাওয়াকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে মন্ট্রিল আন্তর্জাতিক সম্মেলন (Montreal International Forum 1990) বসানো হয়।

সম্প্রতি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে (Report of the Committee on National Resoures of the Economic and Social Council) উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রায় ৮০টি দেশে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষ বসবাস করে, যাদের জীবনে জলাভাব এত তীব্রতর আকার ধারণ করছে যে, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, অত্যধিক জনবিস্ফোরণ ও দূষণের ফলে জলের সহজলভ্যতা ও গুণমান ক্রমশ কমে আসছে। অপরদিকে, শিল্পোন্নয়ন ও কৃষির জন্য জলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। ফল স্বরুপ, বাড়ছে নানান সামাজিক সংঘাত এই সব দেশগুলোতে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীন সংঘাত শুরু হয়ে গেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে শহুরে মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরাঞ্চলের গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে পানীয় জলের চাহিদা ক্রমশ বর্ধমান। এটা যোগান দিতে গিয়ে সেচের জলে টান পড়ছে অন্যদিকে শিল্পে জলের যোগান মার খাচ্ছে। শহরের আর্বজনা, শিল্পের বর্জ্য এবং মনুষ্য সৃষ্ট আর্বজনা পুকুর-খাল-বিল-নদী-নালার জলে মিশে সর্বত্রই দূষণ ঘটিয়ে চলছে। এইভাবে সারা পৃথিবীতে স্বচ্ছ পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি। ফলে, অন্য কোন অঞ্চল থেকে অথবা অন্য কোন ব্যবহারকে বাদ দিয়ে অথবা অন্য একদল মানুষকে বঞ্চিত করে এই জল আমদানি করতে হচ্ছে। এইভাবেই তৈরি হচ্ছে জলের দুষ্প্রাপ্যতা (Water Scarcity)। জন্ম নিচ্ছে জলের ঘাটতি (Water Shortage) এবং শেষে রুপ নিচ্ছে জলের সংকট (Water Crisis)। এই সমস্যাগুলো থেকে নিস্কৃতি পেতে অতীতে নব্বই-এর দশকে দেশে জাতীয় জলনীতি (১৯৮৭), দিল্লি নীতি (Delhi Policy, 1990) এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ডাবলিন নীতি (Dublin Policy, 1992), রিও-সম্মেলন (Forth Summit, 1992) চালু করা হয়েছিল।

একঝলকে দিল্লি নীতি

কিছু লোকের জন্য আরও বেশির বদলে সকলের জন্য কিছু—নীতির উপর মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত এই নীতি।

* জল সম্পদ এবং জলীয় ও কঠিন বর্জ্য পদার্থের সুসংহত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা।
* প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এবং নারীদের সম্পূর্ণ অংশগ্রহীতা।
* প্রকল্প রুপায়ণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দৃঢ়করণ।
* আর্থিক লাভ-করার দিশা ঠিক করা।

এক ঝলকে ডাবলিন নীতি

এই ক্ষেত্রে ধারণযোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং জলকে অর্থনৈতিক দ্রব্য হিসেবে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

* স্বচ্ছ-স্বাদু জল সীমাবদ্ধ। তাই, সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে এমন উপকরণ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।
* জল ব্যবহারকারী, প্রকল্প রচনাকারী এবং নীতি নির্দেশকের সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জল সম্পদ উন্নয়ন ও তার ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
* জল যোগাড়, বয়ে আনা, গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা ও স্থানীয় জলের উৎসগুলির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীদের অধিক অংশগ্রহণ।
* জলের অপচয় রোধ করতে একে অর্থনৈতিক দ্রব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।

জাতীয় জলনীতি (National Water Policy, 1987)

ভারতে এই নীতিতে যেগুলো বলা হল—

* জল অতি মহার্ঘ প্রাকৃতিক উপকরণ, মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অংশ এবং মূল্যবান জাতীয় সম্পদ।
* কিছুদিন অন্তর ভূ-গর্ভস্থ জলের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ণ, জলের গুণাগুণ ও অর্থনৈতিক লাভযোগ্যতার বিচার করা হবে নিয়মিত ভাবে।
* ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যাতে জলস্তর চিরতরে নীচে না নেমে যায় এবং তার ব্যবহার সামাজিক সাম্য বজায় রাখা।
* ভূমির উপরের (surface water) এবং ভূ-গর্ভের (ground water) জলসম্পদ উন্নয়ন ঘটানো এবং যৌথ ব্যবহারে সুসংবদ্ধ ও সুসংহত উন্নয়ন এবং প্রকল্পের গোড়া থেকে পরিকল্পিত ব্যবহার।
* উপকূল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থিত জলের অতিরিক্ত ব্যবহার এড়িয়ে চলা যাতে সমুদ্রের নোনা জল স্বাদু জলবাহী স্তরে (aquifer) ঢুকে না পড়ে।
* মানুষ ও পশুর পানের চাহিদা মেটানো কোন স্থানের জলের সর্বপ্রথম দায়িত্ব।

রিও-বিশ্বশিখর সম্মেলন (১৯৯২) জল নিয়ে যা জানালো : এই বসুন্ধরা সম্মেলনে এজেন্ডা-২১ গৃহীত হয়। এই এজেন্ডা-২১ নীতিতে—স্বচ্ছ/স্বাদু জলের প্রাপ্যতা ও সংরক্ষণ নিয়ে বলা হল—

* তৃণমূল স্তরে সরকারি পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে জল সম্পদ ব্যবস্থাপনার ভার দিতে হবে।
* রাষ্ট্রীয় স্তরে সুংবদ্ধভাবে জল সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সতর্ক-সমীক্ষার জন্য জাতীয় আইনকানুন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

এক ঝলকে আজকের জলসংকটের কারণ

* সাধারণের ব্যবহার যোগ্য উপকরণের (Common Resource) এর উপর ব্যক্তিগত মালিকানা।
* ভূমিহীনদের জলের অধিকার না থাকা।
* রিচার্জের তুলনায় অধিক ও অবৈজ্ঞানিকভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন ও তার যত্রতত্র ব্যবহার।
* দূষণ।
* মানুষের জলকে নিয়ে সচেতনতার অভাব।
* সরকারি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব থাকলেও তার রুপায়ণে আরও বেশি শ্লথতা।
* বন ও বনাঞ্চল ব্যাপক হারে ধ্বংস, সামাজিক বনসৃজনের অভাব।
* পরিবেশে জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন।
* নদীনালা, খাল, বিল-জলাভূমিকে ধ্বংস করে ফেলা, তাদের স্বাভাবিকত্বকে দিনদিন নষ্ট করা।

সবশেষে

আমাদের গ্রহ পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ জলে আচ্ছাদিত—সেই জন্য পৃথিবী একটি নীল গ্রহ। কিন্তু শতকরা ৯৭.৫ ভাগ জলই লবনাক্ত - পানের ও আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য। মাত্রা ২.৫% জল আমাদের ব্যবহারের যোগ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর (যার মধ্যে আমাদের দেশও আছে) শতকরা ৮০% রোগের মূল উৎসই জলজনিত। তাঁরা এও বলেছেন আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৩০% মানুষ তীব্র জল সংকটে ভুগবেন যা প্রায় ৫০টি বিভিন্ন দেশের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ভারতের নীতি আয়োগ ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে, যে গতিতে ভূ-গর্ভস্থ জল কমে আসছে তাতে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের প্রায় ৪০% শহর এলাকা জলসংকটে ভুগবে। ঠিক যেমন—সাম্প্রতিককালে আমরা ভারতের মেট্রোপলিটন মহানগরী তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই মহানগরে যে ভয়াবহ পানীয় ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জলের সংকট দেখেছি।

মার্কিনবিজ্ঞানী অধ্যাপক টনি এ্যালেন সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করা জল অপচয়ের একটি আশ্চর্য্যজনক তথ্য খুঁজে বের করেছেন গবেষণা করে। তিনি বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কিলোগ্রাম গোমাংস থেকে তৈরি 'Juicy Steak' (খুব জনপ্রিয়) তৈরি করতে ১৫,৪০০ লিটার জল ব্যবহৃত হয়। কিভাবে তা সুন্দরভাবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন—বলছেন, একটি গরু থেকে ২০০ কেজি মাংস পেতে গরুটিকে ৩ বছর ধরে মোট ১,৩০০ কেজি শস্যদানা খাওয়াতে হয়। এই ৩ বছর ধরে গরুকে লালন পালন করতে শস্যদানার চাষ করতে হবে, তার জন্য যে পরিমাণ জল লাগবে, গরুটিকে জল খাওয়াতে যে পরিমাণ জল লাগবে এবং গোশালা ও গোমাংসের দোকান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে যে পরিমাণ জল লাগবে তা হিসেব করে দেখা গেছে ৩,০৯১,০০০ লিটার। সেই হিসেবে, ১ কেজি গোমাংস থেকে তৈরি 'Juicy Steak' পেতে ১৫,৪০০ লি. জল প্রয়োজন। একইভাবে, তিনি জানিয়েছেন ১ কেজি চকোলেট বানাতে ২৪,০০০ লিটার জল এবং ১ টুকরো কাগজ তৈরি করতে ১০ লিটার জল প্রয়োজন।

আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য লাগলেও এই যুক্তিকে কোনোদিন ফেলে দেওয়া যাবে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে একজন মাংসভক্ষণকারী মানুষ দিনে ৫০০০ লি. জল ব্যবহার করে থাকেন। তিনি বলছেন যে, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্ধেক মানুষ মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয় তাহলে বছরে ২৫৬ ঘন কি.মি. জল বাঁচবে। তাই তার পরামর্শ জল বাঁচাতে যতটা পারেন নিরামিশাষী হন।

তাহলে যা করা উচিৎ—

* জল বাবহ্যর করার ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া।
* জলকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে দেখা।
* স্থানীয় জলের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়া।
* বর্ষার জল সংরক্ষণ করা।
* এলাকার ছোট বড় পুকুর, খাল-বিল, নদী-ঝোরাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা, স্বচ্ছ রাখা ও সংরক্ষণ করা।
* বন ও বনাঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণ করা, ব্যাপক সামাজিক বনসৃজন করা।
* সরকারি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করা, চালু প্রকল্পগুলোকে আন্তরিকতা দিয়ে কার্যকরী রাখা।
* দলমত, জাতি ধর্মের উর্দ্ধে উঠে হাতে হাত-কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জল সম্পদকে সংরক্ষণ করা।
* বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলসম্পদ সংরক্ষণ করা। তাকে সুসংহত ব্যবহার করা।
  আরও কার্যকরী আইন/নিয়মকানুন তৈরি করা ও কড়া ভাবে লাগু করা।
* ভূ-গর্ভস্থ জলের উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন বহুজাতিক নরম পানীয় কোম্পানিগুলোকে মিনারেল ওয়াটার নামে প্যাকেজড্ পানীয় জল উৎপাদনকারী আর্ন্তজাতিক, দেশীয় কিংবা স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
* জলাশয় বা জলাশয় নিকটবর্তী এলাকায় কীটনাশক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা ও কড়া আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।

এলাকার সমস্ত জলা জায়গা যেগুলোর আয়তন ন্যূনতম পাঁচ কাঠা এবং যেখানে অন্ততঃ বছরে ৬ মাস জল জমে সেখানে ইতিমধ্যে জলাভূমি সংরক্ষণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। এলাকার সমস্ত ছোটো/ বড় নদীগুলোকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখা তার বহমানতা বজায় রাখা। নদীতে বাঁধ না নির্মাণ করা। জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বায়ু ও সৌরশক্তির উপর জোর দেওয়া।

শেষে বলা যায়, নিজেদের সভ্যতাকে যদি বাঁচাতে হয়, নিজের সমাজকে যদি বাঁচাতে হয়, নিজের পরিবারকে যদি বাঁচাতে হয় এবং নিজেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে, আজ নয়, এখন থেকে 'জল সংরক্ষণ' নিয়ে ভাবতে হবে—নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

* পরিবেশ সমীক্ষণ—কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত, বাসুদেব দে।

ইউক্যালিপটাস বনসৃজন সম্পর্কে দু-এক কথা

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে ভাবতে খুব অবাক লাগে যে গাছটাকে কেউ কোনোদিন চিনত না জানতো না, কোনো ফল দেয় না, এমনকী পাখিরা বাসা পর্যন্ত বানায় না সেই গাছটায় অথচ আমরা লাগাতে শুরু করলাম। কিন্তু কোথা থেকে এলো, কে নিয়ে এলো, কেন নিয়ে এলো আমরা কেউ জানার চেষ্টা করলাম না। জানার চেষ্টা করলাম না যে এই গাছটা আমাদের এলাকার জীব বৈচিত্রের সঙ্গে, পাখপাখালির সঙ্গে, কীটপতঙ্গের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারবে কিনা। কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিবেশে ফেলবে কিনা ভাবলামই না এসব কথা। আসলে আমরা গাঁ-গঞ্জের মানুষ অত কিছু ভাবিনা। তার ওপর সরকারি অফিসের লোকজনদের ওপর আমাদের যে বড় আস্থা।

সত্যিই তো সরকারি অফিসের লোকজন কি বলেছে এই গাছটার ঠিকানা অস্ট্রেলিয়া? তারা কি বলছে সেই ১৭৯০ সালে মহীশূরের টিপু সুলতান নিজের বাগান সাজানোর জন্য সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন এই ইউক্যালিপটাস। তাহলে কি সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউক্যালিপটাস? তবে যে আমাদের বাপ ঠাকুরদা বলেন আমরা জন্মেও দেখিনি এই অদ্ভুতুড়ে গাছটাকে। ঠিকই তো তাঁরা দেখবেন কী করে, এ গাছ ১৯৫২ সালের পর থেকে এদেশে বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সে সময় কর্নাটক স্টেট ফরেস্ট প্লান্টেশন কর্পোরেশনই প্রথম দায়িত্ব নিয়ে ইউক্যালিপটাসের চারা গাছ বানান। অর্থাৎ এদেশে ইউক্যলিপটাসের আঁতুড়ঘর বলতে কর্নাটককেই বোঝায়। সেই থেকে তারাই দেশের বিভিন্ন রাজ্যকে ইউক্যালিপটাসের বীজ সরবরাহ করা শুরু করে। ফলে গত শতাব্দীর ৬০ ও ৭০-এর দশকে এদেশের বনদপ্তরের হাত ধরেই সেগুন গাছের সঙ্গে শুরু হলো ইউক্যালিপটাসের যাত্রা। তবে সরকারি দপ্তরের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে ইউক্যালিপটাস এলো আশির দশকে সামাজিক বনসৃজন শুরু হওয়ার পর।

এসব কথা অবশ্য তারা কিছুই জানায়নি, তারা জানালো এই গাছ নাকি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে ফলে তাড়াতাড়ি কেটে বিক্রিও করা যাবে। মানে অর্থকরী। সেই আশির দশক থেকেই শুরু হল গাছের পণ্যায়ন। মানুষকে বোঝানো শুরু হলো গাছ বিক্রির লাভের অর্থনীতি। যে গ্রাম-দেশের মানুষের সঙ্গে এতদিন নাড়ির টান ছিল গাছগাছালির, সম্পর্ক ছিল স্বজনের, বাপ-ঠাকুরদা ঠাকুরমা পিসিমার স্পর্শের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল গাছ-গাছলির নাম। সেই মানুষের সঙ্গে ধীরে ধীরে আলগা হতে শুরু করল গাছ গাছালির সম্পর্ক। এতদিন যে গ্রাম-দেশজুড়ে একটা বিনামূল্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ অর্থনীতি নিজের মত করে চলছিল তা এবার ভাঙ্গতে শুরু করল। সরকার মানুষকে যে অর্থনীতি বোঝাতে চাইল তার থেকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা অর্থনীতি বিশেষত ফলফলারি এবং কাঠ যা গ্রাম-দেশজুড়ে ছিল সেটা আমরা ভুলতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করল আমাদের গাঁ গঞ্জের গাছগাছালির পরিবেশ। আমরা কেউ খেয়ালই করলাম না সেসব। কেউ জানতে চাইলাম না এই গাছটা আমাদের বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে শুভ না অশুভ। এমনকী আশঙ্কাও করলাম না কোনো ধরনের। সারা দেশ জুড়ে আমরা দেখলাম গাছেদের এক নতুন কলোনি। হ্যাঁ, কলোনি বটে। তবে কখনো কখনো আমার এই গাছগুলোকে অনেকটা দাস শ্রমিকের মতো মনে হয়, ঠিক যেভাবে তুলাচাষের জন্য আফ্রিকা থেকে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া হতো অথবা চা বাগানের জন্য সাঁওতাল পরগনা থেকে নিয়ে যাওয়া হতো আদিবাসী মানুষদের। আমার কেন জানি ঠিক তেমনটাই এই গাছগুলোকে দেখলে দাস শ্রমিকের কথা মনে হয়। তাছাড়া সত্যিই তো এই গাছগুলোর সঙ্গে আমাদের তো কোনোদিনই কোনো সখ্য ছিল না, সম্পর্ক ছিল না, এমনকী গাছগুলো পর্যন্ত চিনত না আমাদের মাটিকে, একমাত্র মুনাফাই তাদের চিনিয়েছে আমাদের।

এই যে লাভের কথা লোভের কথা শেখানো হলো আমাদের, তাতে সত্যিই কি আমরা লাভবান হলাম। সত্যিই কি আমাদের লাভের জন্য এই গাছ রোপণের কথা ভেবেছিলো সরকার। না একেবারেই তা নয়। আসলে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী বিশ্বে যা কিছু ঘটে চলেছে সবটাই শিল্প অর্থাৎ পুঁজির প্রয়োজনে। যখনই পুঁজি কোনো শিল্পকে বা কোনো যন্ত্রকে বাজারে আনার কথা ভেবেছে মানে প্রমোট করেছে তখনই তার প্রয়োজন মতো কাঁচামাল তৈরির

জন্য একটা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছে। তেমনি একটি ব্যবস্থাপনার ফলশ্রুতি এই ইউক্যালিপটাস। ইউক্যালিপটাসের ফাইবার গুলো সরু ও তুলনামূলকভাবে পুরু প্রাচীর যুক্ত হওয়ায় ইউনিফর্ম এবং ফাইন কাগজ তৈরিতে এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। খুব ভালো টিস্যু পেপারও তৈরি হয় ইউক্যালিপটাস থেকে। যে টিস্যু পেপার ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃক্রিয়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বের মানুষের কাছে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। উন্নত মানের কোটেড পেপারও তৈরি হয় এর ফাইবার থেকে। ইউক্যালিপটাসের আরো একটা ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে প্লাইউড কারখানায়। এছাড়া ইউক্যালিপটাসের যে তেল তা পরিষ্কার করার জন্য, শিল্প দ্রাবক, অ্যান্টিসেপটিক, দুর্গন্ধমুক্ত করার জন্য, টুথপেস্ট এবং ডিকনজেস্টান্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পোকামাকড় ও মশা তাড়ানোর উপাদান হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। অর্থাৎ শিল্পজগতে এর যে চাহিদা রয়েছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সেই হিসেবে ব্যক্তি লাভের কথা আমরা যদি ভাবি তবে সাধারণ মানুষের ভালো দাম পাওয়ারই কথা আর সেটা পেলে আপত্তি থাকার কথা নয়, সে ক্ষেত্রে আমরা না হয় বাস্তুতন্ত্রের কথা উহ্যই রাখলাম। কিন্তু সে গুড়েও বালি। এযাবৎ এ তল্লাটের কেউই বলতে পারবেন না যে ইউক্যালিপটাস গাছ বিক্রি করে তিনি মন মতো দাম পেয়েছেন। একটি দশ কাঠার বাগানের মালিক গাছগুলো কেটে সর্বসাকুল্যে নাকি পেয়েছেন ৫০০০ টাকা। অর্থাৎ আট বছর ধরে তিনি যদি এতগুলো ইউক্যালিপটাস লালন পালন না করে এর অর্ধেক সংখ্যক আম গাছও লাগাতেন তবে নিঃসন্দেহ আম বিক্রি করে এর থেকে অনেক বেশি আয় করতেন, তাতে বোধ হয় গাছগুলোও কাটতে হতো না। সব মিলিয়ে ব্যক্তি মানুষ যে কোনোভাবেই লাভবান হচ্ছেন না তা বোধহয় আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে এটা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে এদেশে ইউক্যালিপটাসকে গ্রহণযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুঁজি আজও কৌশলগতভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কথাটা শুনতে কেমন কেমন লাগলেও এটাই সত্যি।

এই যে ইউক্যালিপটাস গাছের বিপক্ষ নেওয়া বা বিরুদ্ধতা করা, এই যে বলা গাছটা মাটির তলা থেকে প্রচুর পরিমাণে জল টেনে নেয়। এর মূল মাটির তলায় আড়াই থেকে ৩ মিটার অবধি পৌঁছে যায় মাটির তলার ফ্রেটিক জোনে। এর পাতাগুলো আম্লিক হওয়ার কারণে দ্রুত মাটির গুণাগুণ নষ্ট করে দেয় এবং এর অ্যালিলোপ্যাথিক ইফেক্ট অন্য প্রজাতির উদ্ভিদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রভাব ফেলে মাটিতে থাকা অণুজীবের ওপর, কীট পতঙ্গের উপর। এসব আমাদের মনগড়া নয়, এসব কথা গবেষণা পত্রের, এসব কথা আদালতের। ২০১৭-তে কর্নাটক হাইকোর্ট ইউক্যালিপটাসের রোপন নিষিদ্ধ করে দেন মূলত মাটির তলার জল নিঃশেষের কারণে। সে সময়েই সারা দেশজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ইউক্যালিপটাসের বিরুদ্ধে চলতে থাকা প্রতিবাদের প্রথম স্বীকৃতি মেলে। কিন্তু সে স্বীকৃতিও দীর্ঘস্থায়ী হলো না বেশিদিন। ২০১৯-এর ৩০শে জানুয়ারি কর্নাটক আদালতের রবি মালিনাথের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৭-এর আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে। অর্থাৎ আবার নতুন করে ইউক্যালিপটাস রোপনের ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হল ২০১৯-এ। আসলে ২০১৭-এর নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই নতুন করে খুঁটি সাজাতে শুরু করে পুঁজি। ২০১৭-তেই আমরা দেখলাম সেন্টার ফর সাইন্স এন্ড ইনভারনমেন্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশ করলো যেখানে বলা হল ইউক্যালিপটাস মোটেই মাটির তলা থেকে বেশি জল নেয় না। অন্যান্য গাছের সঙ্গে একটা তুলনাও তারা সেই রিপোর্টে প্রকাশ করে, যেখানে দেখানো হয় ইউক্যালিপটাসের জন্য যেখানে মোট বায়োমাসের ৭২৫ লিটার জল প্রতি কেজি হিসেবে লাগে সেখানে একাশিয়ার জন্য লাগে ১৩২৩ লিটার প্রতি কেজি, শিশু গাছের জন্য ১৪৮৪ লিটার প্রতি কেজি, ধানের জন্য ২০০০ লিটার প্রতি কেজি, তুলোর জন্য ৩২০০ লিটার প্রতি কেজি। এবং আরো বলা হয় যে একজন চাষী যেকোনো ফসল চাষ করে যা আয় করেন ইউক্যালিপটাস লাগালে নাকি তার থেকে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বেশি আয় করবেন। আমরা দেখলাম ইন্ডিয়ান পেপার ম্যানুফ্যাকচারস অ্যাসোসিয়েশন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তর যৌথভাবে কর্নাটক সরকারকে লিখল, ফার্ম ফরেস্ট্রি এবং এগ্রো ফরেস্ট্রির জন্য ইউক্যালিপটাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা গাছ। তাছাড়া আপনারা জানেন কাগজ কারখানা, প্লাইউড কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ইউক্যালিপটাস কতটা প্রয়োজনীয়। এর পাশাপাশি কৃষক ও গাছ রোপনকারীদের আয় বৃদ্ধি এবং সবুজায়ন ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হ্রাস হওয়ার ক্ষেত্রে ইউক্যালিপটাসের ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু সেভাবে কোনো নিশ্চিত গবেষণা নেই।

মজাটা হলো ইউক্যালিপটাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তার পক্ষে কিন্তু অনেক বক্তব্য রয়েছে, আর সেটাকেই এবার পেশ করা হল আমাদের সামনে। যেমন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী দিনেশ কুমারের লেখা বই 'ইউক্যালিপটাস ইন ইন্ডিয়া পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার'। যেখানে তিনি তুলে ধরেছেন যে ইউক্যালিপটাসের মধ্যে জেরোফাইট নেচার রয়েছে, অর্থাৎ সে শুষ্ক অঞ্চলে ও তার শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কারণ ইউক্যালিপটাস পাতার এমন ক্ষমতা রয়েছে যে সে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক রকমভাবে কমিয়ে দিতে পারে। এটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে খরা মরসুমে অন্যান্য গাছ যখন হলুদ বা ধূসর হয়ে যায় তখনো ইউক্যালিপটাস সবুজ থাকে কারণ সে তার বাষ্পায়ন বন্ধ করে দেয় এবং তাদের মধ্যে দিয়ে জল প্রবাহিত হতে দেয় না। বিশিষ্ট বনবিজ্ঞানী বিনায়ক রাও পাতিলের বক্তব্য হল, ইউক্যালিপটাস তার আশপাশের ফসলের সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল ও অন্যান্য পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে না। ইউক্যালিপটাসের প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন হয় না। ইউক্যালিপটাস মোটেই মাটির উর্বরতায় বাধা সৃষ্টি করে না।

এখানেই শেষ নয়, আরও বলা হলো যে চারটি লিখিত বক্তব্যের

ভিত্তিতে ২০১৭-তে কর্নাটক হাইকোর্ট ইউক্যালিপটাসের রোপণ নিষিদ্ধ করেন সেগুলোতেও নাকি ভূগর্ভস্থ জল কমার জন্য ইউক্যালিপটাসকে সরাসরি দায়ী করা হয়নি। যেমন প্রথম গবেষণাপত্র আর এম পালাননার, তিনি তাঁর লেখার উপসংহারে যা লিখেছিলেন সেটা নাকি ইউক্যালিপটাস রোপণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নয়। দ্বিতীয় গবেষণাপত্র দক্ষিণ ভারতে ভূগর্ভস্থ জলের সহজলভ্যতায় ইউক্যালিপটাস এর প্রভাব...এই লেখাটা নিয়ে বলা হলো লেখক একজন আকাডেমিশিয়ান, তিনি জিওলজিস্ট বা বনদপ্তরের কোনো ব্যক্তি নন। তৃতীয় গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে বলা হলো ওটা পাকিস্তানের সাইট থেকে রেফার করা হয়েছে। চতুর্থ পত্রটি নাকি ছিল ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের এবং ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল ইউক্যালিপটাসকে বিবেচনা করার জন্যই বলেছিল। কোনো গবেষণা পত্রেই নাকি ইউক্যালিপটাসকে স্পষ্টভাবে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির জন্য দায়ী করেনি। আরও বলা হলো কর্ণাটক হাইকোর্ট ২০১৭-তে ইউক্যালিপটাস নিষিদ্ধ করার আগে ২০১৫-তে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালে একই ধরনের একটি অভিযোগ যায়। 'সফল ভারত গুরু পরম্পরা পাঞ্জাবে'র পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল যেখানে ভূগর্ভস্থ জলের কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে ইউক্যালিপটাস চাষকে দায়ী করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার হাইকোর্ট বলেন, ইউক্যালিপটাস চাষের জন্য সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, এটা পরিবেশের জন্য বা ভূগর্ভস্থ জলের জন্য মোটেই বিপর্যয়কর নয়। ২০১৫-এর ১৬ এপ্রিল সেই ডিভিশন বেঞ্চ আরো বলেন পাঞ্জাব রাজ্যে ইউক্যালিপটাস রোপণের ওপর সম্পূর্ণভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। তবে বন বিভাগকে বলা হচ্ছে জলাবদ্ধ এবং নিরাপদ অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে ইউক্যালিপটাস রোপণের জন্য তারা যেন নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি তৈরি করেন। এছাড়াও ২০১৯-এ কর্নাটক হাইকোর্টে একাধিক চাষীদেরকে দিয়ে বলানো হলো যে ইউক্যালিপটাস চাষ করে তাঁরা প্রত্যেকেই লাভবান হয়েছেন এবং তাঁদের জমির উর্বরতা মোটেই হ্রাস পায়নি। সব মিলিয়ে পুঁজি শেষমেশ ইউক্যালিপটাস চাষের নিষেধাজ্ঞার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করতে সমর্থ হয়েছে, সমর্থ হয়েছে ইউক্যালিপটাস চাষের বৈধতা প্রদানে।

কিন্তু মানুষের মনে তো আর স্থগিতাদেশ জারি করা যায়না। আর দৈনন্দিন ব্যক্তিগত সাধারণ মানুষের জীবনের লাভ-ক্ষতির হিসেবও সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলে না। সেটা চলে না বলেই মানুষকে বোঝানো সম্ভব। দরকার হল লেগে থাকা, আর একাগ্রতা। এই যে প্রতিবছর জুন মাস আসলেই রাস্তায় রাস্তার দু'ধারে ধুমধাম করে গাছ লাগানো হয় তার বেশির ভাগটাই বিদেশি গাছ মানে তারা মোটেই আমাদের এ অঞ্চলের পরিচিত গাছ নয়, ফলের গাছ তো নয়ই। আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এর পুরো ব্যবস্থাপকই কিন্তু সরকার। কেন এগুলো আমাদের আঞ্চলিক গাছ বা ফলের গাছ হবে না, কেন আমরা সরকারকে বলব না যে আমাদের অঞ্চলের আমাদের পরিচিত গাছই আপনাদের লাগাতে হবে। কেন দাবি জানাব না? এগুলো বন্টন তো হয় সেই পঞ্চায়েত অফিস অথবা বিডিও অফিস থেকে। সুতরাং আমাদের প্রতিবাদ জানানোর শুরুটা যে পঞ্চায়েত অফিস থেকেই করতে হবে এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রতিবাদ নয় বাদানুবাদ নয়, আমাদের বোঝাতে হবে, আলোচনা চালাতে হবে, বারবার বলতে হবে। একদিন না একদিন নিশ্চয়ই বুঝবে তারা। তাছাড়া এই যে আমরা কথায় কথায় বলি সামাজিক বনসৃজন, গত শতাব্দীর ৭০ বা ৮০-র দশকের পর থেকে যে বনসৃজন সারা দেশজুড়ে হয়ে চলেছে সেটাকে সত্যিই কি সামাজিক বলা যায়? যে গাছগুলো আমরা এতদিন লাগালাম তারা কি সত্যিই আমাদের সমাজের? তারা যদি আমাদের সমাজের, আমাদের অঞ্চলের, আমাদের প্রাকৃতিক বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের না হয়ে থাকে তাহলে এ বনসৃজন কিভাবে সামাজিক হলো, এবার সেটাকে নিয়েও প্রশ্ন তুলতে হবে। প্রশ্ন তুলতে হবে মনোপ্লান্টেশন নিয়েও। এ লড়াই আমাদের সকলের।

(সৌজন্য: তরাই গণ্ডার)

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ ও পরিবেশ বিনাশ

সোমনাথ গুহ

মানুষের সীমাহীন লোভ ও প্রকৃতির ওপর খবরদারির করার প্রবণতার কারণে, বিশ্বজুড়ে আজ পরিবেশ বিপর্যস্ত। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিবেশ ও জলবায়ুর সংকটকে আরও ভয়ানক করে তুলেছে। পূর্ব ইউরোপের এই যুদ্ধই শুধু নয়, অতীতের সমস্ত যুদ্ধই মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার নতুন সব নজির সৃষ্টি করেছে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ-বিনাশ আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। শুধুমাত্র গত পঞ্চাশ বছরের যুদ্ধে কতো সহস্র বোমা, গ্রেনেড, প্রবল বিস্ফোরক সব ককটেল, মিসাইল, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ধরিত্রীতে আছড়ে পড়েছে, কতো বিষাক্ত সব রাসায়নিক পৃথিবীর জলবায়ুকে দূষিত করেছে তা আমাদের কল্পনাতীত। এক একটি বিস্ফোরণ বিশাল সব গহ্বর তৈরি করেছে, জল, বায়ু, মাটিকে দূষিত করেছে, বন্যপ্রাণী নিকেশ করেছে, গাছপালা ধ্বংস করেছে, এমন বিনাশ সূচিত করেছে যা বহু দশক পরেও মেরামত করে উঠতে পারা যায়নি।

কয়েকটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে। কম্বোডিয়ায় সত্তর ও আশির দশক জুড়ে যুদ্ধের ফলে এতো মাইন পোঁতা হয়েছিল যে তা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। অনুমান সেখানে অন্তত ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ মাইন এখনো রয়ে গেছে। এই সময়ে দেশটায় বহু পট

পরিবর্তন হয়েছে এবং কারো পরিষ্কার ধারণা নেই কোন জায়গায় কতো মাইন স্থাপিত হয়েছে; এর ফলে সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করার কাজও খুব শ্লথ ও অনিশ্চিত গতিতে এগিয়েছে। বলা হচ্ছে দেশের ২০ শতাংশ গ্রাম মাইন অধ্যুষিত। কৃষিজমিতে মাইন থাকার আশঙ্কার ফলে মানুষ সন্ত্রস্ত তাঁরা চাষবাস করতে অপারগ যার ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। শুধু কৃষিজমি নয়, অরণ্য, জলাভূমি, চারণভূমি ইত্যাদি ব্যবহারে মানুষ আজ প্রায় চার দশক পরেও শঙ্কিত। ২০১৯য়েও সাতটি মাইন নিস্ক্রিয় করার সংগঠন কাম্বোডিয়ায় কাজ করে চলেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনীর যাতায়াতে নিবিড়, নিশ্ছিদ্র অরণ্য বাধা সৃষ্টি করত। এই কারণে তারা বনাঞ্চলে পাতা ঝরানোর ওষুধ ছড়িয়ে দিত। ডালপালা ঝরে যেত, অনেক গাছ শুকিয়ে গিয়ে মারা যেত; বন পাতলা হয়ে যেত এবং যাতায়াত সুগম হতো। বিপুল বনাঞ্চল এভাবে ধ্বংস হয়েছে।

এছাড়া যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য আক্রান্ত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ তেল, কাঠ বিক্রি তো সব সময়ই ঘটে। অ্যাঙ্গোলায় ১৯৭৫য়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেখানে চোরা শিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়। যুদ্ধের কারণে দেশে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি হয় যার ফলে পশু শিকার বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। মোজাম্বিকের গৃহযুদ্ধে (১৯৭৭-১৯৯২), বৃহৎ তৃণভোজী প্রাণী যেমন হাতি, জলহস্তি, জেব্রা, ইত্যাদির সংখ্যা একটি জাতীয় উদ্যানে প্রায় ৯০ শতাংশ কমে যায়। আফগানিস্তানের যুদ্ধ অঞ্চলগুলিতে পানীয় জল মিলিটারি কনভয়ের তেল ও আগ্নেয়াস্ত্রের রাসায়নিকের ফলে বিষাক্ত হয়ে গেছে। 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' লিখছে যে দুই দশকের দখলদারির পর যখন মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যায়, তখন তাঁরা তালিবানিদের হাতে একটি দুষিত দেশের উত্তরাধিকার দিয়ে যায়। পত্রিকাটি বলছে যুদ্ধের যে বিপুল রাসায়নিক বর্জ্য তাঁরা সেই দেশটিতে ফেলে রেখে গেছে তা আদৌ কোনদিনও সাফাই হবে কি না সন্দেহ আছে।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউক্রেন অন্যতম শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল। ১৯২৮-এর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইউক্রেনে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে, খারকিভে বিশাল ট্র্যাক্টার প্ল্যান্ট গড়ে ওঠে। দুই দশকের মধ্যে একটি কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পাঞ্চলে পরিণত হয়। খারকিভ, মারিয়ুপোল, নিকোপল, ডনবাস শহর ও অঞ্চলে বৃহৎ শিল্প প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে ইউক্রেনে শিল্প উৎপাদন চার গুণ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের সংখ্যা এই সময়ে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় ও শহরের জনসংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে ৩৪ শতাংশ হয়ে যায়। প্রধান যে শিল্পগুলির প্রসার ঘটে সেগুলি হল : কয়লা, বিদ্যুৎ, যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে চারটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পনেরোটি রিঅ্যাক্টর আছে।

ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক কেন্দ্র জাপোরিছিয়া ইউক্রেনে অবস্থিত। যুদ্ধের শুরুতে রুশ আক্রমণের ফলে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি চুল্লি থেকে আগুন বেরোতে দেখা যায়। এই কেন্দ্রটিতে বিস্ফোরণ হলে তা চেরনোবিলের থেকে দশ গুণ বেশি ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। বিপদ বুঝে রুশ সেনারা চেষ্টা করে যাতে আগুন বেশি না ছড়ায়। একই ভাবে ২৪শে ফেব্রুয়ারি রুশ সেনারা চেরনোবিল পারমাণবিক কেন্দ্র, যা বর্তমানে পরিত্যক্ত, সেখানে প্রবেশ করে। কিছু রুশ সেনা পারমাণবিক বিকিরণের ফলে অসুস্থ হয়ে যায় যাঁদের বেলারুশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রুশ বাহিনী সেখান থেকে অন্যত্র সরে যায়। তিন দশকের অধিক সময় ধরে পরিত্যক্ত থাকার ফলে চেরনোবিলে গভীর অরণ্য গড়ে উঠেছে। প্রচুর জীবজন্তু, যার মধ্যে কিছু বিপন্ন প্রজাতি আছে সেগুলি এখানে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষ পদার্পণ না করার ফলে বিচিত্র উদ্ভিদ আত্মপ্রকাশ করেছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা রুশ বাহিনীর প্রবেশের ফলে, প্রকৃতির নিজস্ব খেয়ালে গড়ে ওঠা এই সংরক্ষণাগারের ভারসাম্য হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। কতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নন। প্রাথমিক ভাবে যেটা স্বস্তিদায়ক সেটা হচ্ছে তাঁরা বলছেন এই দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে এখনো অবধি কোনও মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের খবর নেই। কিন্তু যুদ্ধ আরও ঘনীভুত হলে এই পারমাণবিক চুল্লিগুলি থেকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; বলাই বাহুল্য তা শুধু ইউক্রেন বা রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়বে।

রুশ আক্রমণ পূর্ব ইউক্রেনের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই অঞ্চলে তেল শোধনাগার, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদি রয়েছে। যুদ্ধের প্রথম মাসে ইউক্রেন ১১০০ মিসাইল দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে; বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের ওপর ১১১টি আক্রমণ হয়েছে যেখানে জ্বালানি কারখানা, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাসের পাইপলাইন রয়েছে। ৪০০০ বিভিন্ন আকারের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হয়েছে, কৃষিজমিতে মাইন পোঁতা হয়েছে যার ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল চাষের অযোগ্য হয়ে গেছে। (তথ্যসূত্র: trt.world.com/২৮.০৪.২২)। আরেকটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে মার্চ মাস অবধি জীবাশ্ম জ্বালানি কারখানার ওপর ৩৬টি, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর ২৯টি এবং জল সরবরাহের পরিকাঠামোর ওপর সাতটি আক্রমণ হয়েছে। (globalcitizen.org/ ০১.০৪.২২)। কেমিক্যাল কারখানা, তেলের ডিপো, কয়লা খনি, প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন ইত্যাদির ওপর লাগাতার বোমাবর্ষণের ফলে প্রচুর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশে উদগীরিত হয়েছে যার ফলে মাটি, ভূ-জল দূষিত হয়েছে, প্রচুর বন্যপ্রাণী মারা গেছে। এটা রাসায়নিক অস্ত্র

ব্যবহারের সমতুল্য। বাতাসে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বায়ুদূষণ অভুতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু জায়গায় অ্যামোনিয়া গ্যাস লিকেরও খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা এর ফলে ক্যান্সার, শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত ব্যাধি, শিশুদের মধ্যে স্টান্টিং (বয়স ও ওজন অনুযায়ী বৃদ্ধি কম) এবং ওয়েস্টিং (দৈর্ঘের তুলনায় ওজন কম) সমস্যা, অন্তঃসত্ত্বা নারীদের সমস্যা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাবে। ইউরোপের জীবাশ্ম জ্বালানির একটা বড় অংশ আসে রাশিয়া থেকে। প্রাকৃতিক গ্যাস ৪০ শতাংশ, তেল ২৫ শতাংশ, কয়লা ৫০ শতাংশ। (তথ্যসূত্র: nature.com/০৫.০৪.২২)। রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের অবনতির কারণে আশা করা হয়েছিল ইউরোপ বোধ হয় এবার জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরযোগ্যতা কমিয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি (Renewable energy), যথা বাতাস, সৌরশক্তি ইত্যাদি কার্বনবিহীন উৎসের ব্যবহারের ওপর জোর দেবে। কিন্তু খরচ ও অনুন্নত পরিকাঠামোর ফলে ইউরোপে এখনো পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর ফলে জার্মানির মতো উন্নত দেশও, এই ভয়াবহ যুদ্ধ সত্ত্বেও, জ্বালানির জন্য রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাই আপাতত রাশিয়াকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বা তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না। পূর্ব ইউক্রেনের কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চল দখল করার লক্ষ্য নিয়ে রাশিয়া এগোচ্ছে, তাতে যদি পরিবেশের সর্বনাশ হয়ে যায় তো যাক।

COP26 & We

The time is now. COP26 must end the fossil fuel era, deliver drastic urgent emissions cut, and support the vulnerable.

Wait… What The Heck is COP26?!

Conference of Parties or COP is an annual meeting of governments to discuss the climate crisis. COP26 in Glasgow is the deadline for governments to declare how much they're going to cut emissions. This is our last chance to achieve our target of keeping global warming at 1.5°.

Why Should I Care?

Climate change is a reality for a majority of Indians already. It's forcing us out of our homes and livelihoods. Any further warming will intensify heatwaves, raise sea levels and cause catastrophic flooding and cyclones. This is just some of what's at stake at COP26.

So What Does Greenpeace Want?

* Stop all new fossil fuel projects immediately and phase out the industry.
* Countries revise their action plan to reach their emission reduction targets.
* Keep financial commitments to help climate-vulnerable nations reach their targets.
* Set rules to ensure all nations cooperate in reducing half of global emissions by 2030.

5. Promises Made By India At COP26

1. India will reach net-zero by 2070
2. India will increase its non-fossil energy capacity to 500 gigawatts by 2030
3. India will fulfil 50% of its energy requirements from renewable energy sources by 2030
4. By 2030, India will reduce its total projected carbon emissions by 1 billion tonnes
5. India will reduce the carbon intensity of its economy by 45% by 2030

By announcing such an ambitious target, India has taken a step forward and now it must show leadership by implementing real climate action on the ground.

Fossil fuels dependent transport is a key accelerator of climate change, that's why our Detox City campaign is working to transform India's cities through the spread of sustainable mobility. If more citizens adopt sustainable transportation, we can demand better public transport, more green spaces, and better pedestrian and cycling infrastructure.

Will you do your bit to take action to make our cities cleaner and healthier?

From: Greenpeace Communique

অভিনন্দন

- এভারেস্ট বিজয়ের জন্য পিয়ালি বসাককে। কঙ্গা ভুটিয়া, শিপ্রা মজুমদার, ছন্দা গায়েন, টুসি দাস বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয়িনী বাঙালি মহিলা পর্ব্বাতোরহীদের সাথে পিয়ালি বসাকের নাম যুক্ত হল। পাশাপাশি লোৎসে শৃঙ্গ জয়ের মাধ্যমে তিনিই প্রথম চারটে আট হাজারী শৃঙ্গজয়ী বাঙালি কন্যা।
- বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে জ্যাভলিন থ্রোতে রুপো জিতে নজির গড়ার জন্য নীরজ চোপড়াকে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অন্নদাতাদের বজ্রপাত থেকে রক্ষার তাগিদে

ষড়ানন পান্ডা

আমি বড়ই ক্লান্ত অসুস্থ। আমার নিজের জন্য নয়। দেশের অন্নদাতাদের কেমন করে বজ্রপাত থেকে জীবন রক্ষা হবে এই চিন্তায় আমার চোখে ঘুম আসে না। আসুন আপনাদের সবাইকে এর অংশীদার করি। টিভি রেডিও সংবাদপত্রের পাতায় প্রতিদিন বজ্রপাতে কতজন কৃষকের মৃত্যু ঘটে তার হিসেব কেউ দিতে পারে না। বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। প্রকৃতিকে জানা বোঝা এবং তাকে জয় করা বিজ্ঞানচিন্তার ফল। এই চিন্তাকে সম্বল করে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে অনেকখানি জয় করতে পেরেছে। তার বিরাম নেই। জয়ের পথে এগোবার জন্য তার অবিরাম প্রচেষ্টা।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

জায়গাটার নাম ফিলাডেলফিয়া। এলাকার মানুষ প্রত্যেকেই কার্ড দিয়ে তৈরি ঘরে বাস করে। যখন তখন প্রচন্ড বজ্রপাত ঘটে। ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কল্পনা ছিল আকাশের ওপারে কোন বড়বাবু আছেন তিনি যখন রেগে যান তখনই বজ্রপাত হয় আর তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে যায়। এক তরুণ এগিয়ে এলো। যে ১৯৪৬ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিল। সে আকাশের বজ্রকে মাটিতে নামিয়ে আনবে। বানাল একটা ঘুড়ি। সেই ঘুড়ি থেকে একটা সরু তার টেনে এনে মাটিতে পুঁতে দিল। তার নাম বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)। পরে বিজ্ঞানীরা ফ্রাঙ্কলিনের এই কল্পনাকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছিল। তারপর পৃথিবীর বহু বিজ্ঞানী বজ্রপাত কে নিয়ে নানা গবেষণা চালিয়েছেন এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের প্রতিজ্ঞা বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু তারা রুখে দেবেন।

বজ্রপাতকে নিয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন পরীক্ষাটা শুরু করেছিলেন ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই জুন। কত দিনে আমরা সফল হব জানিনা। তবে উপযুক্তভাবে সরকারি আর্থিক সাহায্য পেলে বিজ্ঞানীরা আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবেন।

সরকারকে উৎসাহিত করবে আপামর সাধারণ মানুষ। তাই সচেতনতাটাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বিজ্ঞানীরা যখন জানতে পারলেন মানুষের তৈরি বিদ্যুৎ আর আকাশের চমকানো বিদ্যুৎ একই তখন এক ধাপ এগিয়ে বর্জ্য নিরোধক দণ্ড তৈরি করে ফেললেন।

বিজ্ঞান সব সময় কার্যটা দেখে তার কারণটা কি অনুসন্ধান করে। বজ্রপাতের কারণটাও জানতে সমর্থ হল বিজ্ঞান। এক) বায়ুর গতি এবং দুই) বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার কম বেশি হওয়া। ঠান্ডা বাতাস মেঘের ভিতরকার জলকণাকে বরফে পরিণত করে। বরফের কুচি গুলো পরস্পরের মধ্যে ঘর্ষনে একটা বিদ্যুত-তরঙ্গ তৈরি করে। আমরা জানি বিদ্যুৎ তরঙ্গের একদিকে থাকে ধনাত্মক বা পজিটিভ শক্তি (+) অপরদিকে থাকে (−) ঋণাত্মক শক্তি।

(−) বায়ুর কারণে এই দুটি শক্তির শর্ট সার্কিটে আলোকের বিশাল ঝলকানি এবং শব্দ তৈরি হয়। শব্দের গতির চেয়ে আলোর গতি অনেক গুন বেশী। তাই আমরা আলোর ঝলকানি দেখার কিছুক্ষণ পরে শব্দটা শুনতে পাই। শব্দ এবং আলো কিন্তু একই সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে। বজ্রর শব্দ ২৫ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা যায়।

উচ্চতা অনুসারে মেঘকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে নিচের স্তরের মেঘ মাটি থেকে মাত্র ১৫০০ মিটার উঁচুতে থাকে। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের মেঘ থাকে হাজার মিটার উপরে। কোন মেঘ কিরকম ঝড়-বৃষ্টি দিতে পারে এরকম হিসাবে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ঝড়ো পুঞ্জ মেঘের ইংরেজি নাম কিউমুলোনিম্বাস। এই মেঘ উপরের দিকে প্রসারিত হয়। সুতরাং—এই মেঘ দেড় হাজার মিটার থেকে ছয় হাজার মিটার পর্যন্ত উপরের দিকে বিস্তৃত থাকে। এই মেঘ বজ্রগর্ভ মেঘ। আকাশে ঘন কালো অনেক দূর বিস্তৃত এই মেঘ দেখা গেলে বোঝা যাবে প্রচুর বজ্রপাত সহ ঝড় বৃষ্টি হবে। এই জন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আলোর গতি শব্দের গতিবেগ এর চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি। শব্দ এবং আলোর ঝলকানি একসঙ্গে হলেও আমরা শব্দটা পরে শুনি। এই আলোর ঝলকানি পাঁচশত কোটি জুল শক্তি উৎপন্ন করে। বাড়িতে যে বাল্ব জলে, ১০০ ওয়াট এর সেই বাল্ব এক সেকেন্ডে ১০০ জুল শক্তি খরচ করে। একটি বজ্রপাতের জুল শক্তি একটি পরিবারের এক বছর বা ১২ মাস বিদ্যুতের খরচ জোগাতে পারবে। সেই বিদ্যুৎ অবিরাম জ্বললেও এক বছর চলবে। এই বিশাল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি কে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য বিজ্ঞানীদের চোখে ঘুম নেই। অবিরাম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীদের পরিশ্রম যেদিন সফল হবে, সেদিন বজ্রপাতে কারো মৃত্যু হবে না। এবং বিদ্যুৎ জ্বালাবার জন্য একটি পয়সাও খরচা হবে না। বিদ্যুতের একটি ঝলকানির তাপমাত্রা ৫০০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর বেশি।

ইতিমধ্যে সাবধান হওয়ার কয়েকটি পরামর্শ :

১) আকাশে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ দেখলেই তাড়াতাড়ি করে কাছাকাছি কোন পাকা দালানের তলায় আশ্রয় নিন।

২) গাড়িতে থাকলেও গাড়িসহ পাকা দালানের নিচে আশ্রয় নিন।
৩) খোলা আকাশের নিচে আদৌ থাকবেন না।
৪) বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে দিন। দরজা বা জানালার কাছে থাকবেন না। জানালার রেলিঙে হাত দেবেন না।
৫) মাটিতে না দাঁড়িয়ে কাঠের খাট বা চেয়ারে বসুন। মাটিতে পা লাগাবেন না।
৬) বাড়ির ইলেকট্রিক লাইন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন।
৭) ফ্রিজ টিভি রেডিও কম্পিউটার ফোন সবকিছুই বন্ধ করে দিন।
৮) নৌকাতে থাকবেন না। উচু গাছের নিচে থাকবেন না।
৯) বাড়িতে বজ্র নিরোধক দন্ড লাগাবার ব্যবস্থা করবেন।
১০) সরকারি খরচে মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে পাকা শেল্টার তৈরি করতে হবে।
১১) আলপথ ধরে তালগাছ পুততে হবে।
১২) সরকারি খরচায় কৃষকদের প্রত্যেকটি গৃহে বজ্র নিরোধক দন্ড বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হলে অনুদান দুই লক্ষ টাকা করে (সরকারি আদেশ নামা : No. 1684__fr /4p-3/04 dt 08.09.2009) অনুদান দেওয়ার দরকার নেই। সেই টাকায় আমাদের অন্নদাতা কৃষকদের বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচবার পথটুকু মহামান্য সরকার দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন। এটা আমার একার আবেদন নয়। আমাদের অন্নদাতা প্রত্যেকটি কৃষকের আবেদন।

আসুন আমরা সকলে মিলে অন্নদাতা কৃষকদের বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচবার রাস্তাটা তৈরি করে দেই।

এক যে ছিলেন সরস্বতী

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

কত স্বপ্নই না ছিল তাঁর দু'চোখ ভরে। বোম্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্নাতক হয়েছিলেন তিনি। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে ভর্তি হওয়া তো শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। তারপরই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার সি ভি রমনের অধীনে শুরু হবে জ্ঞানের অন্বেষণ। কিন্তু একি! আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন স্বয়ং তিনিই। হবে নাই বা কেন? আবেদনকারী যে একজন মহিলা। এই অক্ষমতাটুকুই কি যথেষ্ট নয় আবেদনে সাড়া না দেওয়ার জন্য। যদিও শেষপর্যন্ত তাঁর অদম্য জেদের কাছে হার মানতে হয়েছিল সি ভি রমনকে। তিনি কমলা সোহোনী-প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বিজ্ঞানে পিএইচডি পেয়েছিলেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

'What will our soldiers think when they return to the university and find that they are required to learn at the feet of a woman'?

একজন মহিলাকে গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়েতে নিয়োগ করা যে কতটা অন্যায়, কতটা অযৌক্তিক তা বোঝানোর জন্যই এই উক্তি। আক্রমণের লক্ষ্য তিনি যাঁর অবদানের কাছে চিরঋণী গণিতের জগৎ, পদার্থবিদ্যার পৃথিবী। তিনি গণিতজ্ঞা এমি নোয়েদার।

টি. এ. সরস্বতী

আসলে মানবসমাজের নিয়মকানুন বড়োই বিচিত্র। ভেদাভেদের বেড়াজালে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত এই সমাজ। এ বিভাজন কখনও দেশের নামে, কখনও ধর্মের নামে, কখনও অর্থের নামে। জন্মের পরিচয় নির্ধারিত করতে চায় জীবনের গতিপথকে। কেউ ভোগ করে সকল সুযোগ সুবিধা, তো কারোর জীবন হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র বঞ্চনার ছবি। এক শ্রেণী অপার শক্তিধর, তো আরেক শ্রেণী শোষিত নিপীড়িত বঞ্চিত। যুগ যুগ ধরে এই দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্যতম প্রতিনিধি মানব সমাজের ''অর্ধেক আকাশ'' - নারী।

তাঁর বঞ্চনার ইতিহাস, সে তো বহুশ্রুত। কিন্তু বঞ্চনার অন্ধকার যেমন সত্য, তেমনই সে অন্ধকারকে সরিয়ে আলোর যাত্রা সেও তো মিথ্যা নয়। কত জানা অজানা আলোর কণিকা মহাকালের ঘন আঁধারের বুক চিরে একটু একটু করে রচনা করে চলেছে আলোর আকাশ। সেই আকাশেরই অগণিত আলোর কণিকার মাঝে তিনিও ছিলেন;আমাদেরই দেশে, আমাদেরই মাঝে, সেই সময়ের প্রতিনিধি হয়ে যখন ঘরের দুয়ার পেরিয়ে হাজার বাধা বিঘ্নের মাঝেও বিজ্ঞান জগতের অবরুদ্ধ দ্বার একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে ''অর্ধেক আকাশ''-এর করাঘাতে। নাম ছিল তাঁর টি. এ. সরস্বতী আম্মা।

কেরলের পলক্কড জেলার চেরপুলসেরিতে কুট্টিমালু আম্মা ও মরঠ অচ্যুত মেননের ঘরে তাঁর জন্ম হয়, মালয়ালি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ১০৯৪ কোল্লাম অব্দে (১৯১৮-১৯১৯) অর্থাৎ প্রাকস্বাধীন ভারতবর্ষে।

আগের শতকে, ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচে নারীশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তার আগেই বহু ঘাত প্রতিঘাত বাধা সত্ত্বেও

ভারতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল। আস্তে আস্তে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মহিলারা প্রবেশ করতে শুরু করেন। তার আগে থাকতেই সাবিত্রী বাই ফুলে, জ্যোতিরাও ফুলে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বরেণ্য শিক্ষাবিদরা বালিকাদের বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, চন্দ্রমুখী বসু, কর্নেলিয়া সোরাবজী, মেরি পুনেন লুকসে-একে একে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অঙ্কিত হতে থাকে তাঁদের নাম যাঁরা দেখিয়েছিলেন অচলায়তন ভাঙার দিশা। সেই দিশারই পথিক সরস্বতী আম্মা স্নাতক হয়েছিলেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সংস্কৃত, পদার্থবিদ্যা, গণিত ছিল তাঁর বিষয়। এর পর তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে প্রথম বিভাগসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং বিহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনায় দেখা যায় নারীস্বাক্ষরতার হার মাত্র ৯ শতাংশ (প্রায়) এবং ১৯৫০-এরই দশকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করেন সরস্বতী আম্মা।

সেখানে বিশিষ্ট সংস্কৃত বিশারদ ড: ভি রাঘবন সরস্বতী আম্মাকে পরামর্শ দেন গণিতে ভারতের অবদান নিয়ে কাজ করতে। তাঁরই অধীনে শুরু হয় সরস্বতী আম্মার গবেষণা। ১৯৬৪ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় 'Geometry in Ancient and Medieval India'(GAMI)

বইটির ভূমিকায় ড: ভি রাঘবন সরস্বতী আম্মার বিষয় নির্বাচনে তাঁর পরামর্শ প্রসঙ্গে লেখেন,

"..I did not want her to take up any subject in the overworked fields of Alamkra–Vedanta or general literature and wanted to know if she was prepared, to work in fields which were neglected or in which few young scholars were inclined to put forth their efforts. On further enquiry I found that she was qualified in mathematics, having taken her first degree in physics and mathematics and decided that she should specialise in the field of Indian contribution to mathematics, algebra and geometry.'

বইটি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। "Deccan Herald Magazine" -এ সেই সময়ে বইটি সম্বন্ধে লেখা হয়,

'The book under review is an almost exhaustive survey of geometry in Sanskrit and Prakrit literature right from the vedic times down to the early part of the seventeenth century A.D.'

Historia Mathematica -তে Michio Yano লেখেন–

'...the book has established a firm foundation for the study of Indian geometry, and it will very surely give stimulus to the students of history of mathematics.'

সরস্বতী আম্মার কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় মাধবের কথা। আজ থেকে ছ'শো বছরেরও পূর্বে কেরালায় স্থিত এই গণিতবিদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় কেরালার গণিত ঘরানার। ইউরোপীয় গণিত জগতের বেশ কিছু আবিষ্কার যে অনেক আগে থেকেই এই ঘরানার চর্চার বিষয় ছিল তা আজ বিশ্বের কাছে অজানা নয়। কিন্তু ইতিহাসের ভুলে যাওয়া অধ্যায় থেকে পৃথিবীর সামনে এই অবদানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে যাঁদের নিরলস সাধনায় সরস্বতী আম্মা তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

Geometry in Ancient and Medieval India "(GAMI)-সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে Michio Yano -এর বক্তব্য, "Chapter VII, the most remarkable chapter of GAMI, shows the outstanding aspect of Indian Mathematics–the discovery of the infinite series of and of sine and cosine series. Both discoveries are ascribed to the lost work of Madhava (late 14th century), anticipating Leibniz and Newton by three centuries."

টি. এ. সরস্বতী আম্মা নিজের কর্মজীবনে একাধিক কলেজে অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করেন এবং অবসর গ্রহণ করেন Shree Shree Lakshmi Narain Trust Mahila Mahavidyalaya-এর অধ্যক্ষা রূপে। অবসর গ্রহণের পর তিনি কেরালায় ফিরে আসেন। ১৫ই আগস্ট ২০০০ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

যিনি নিজে একদিন অতীতের যবনিকা সরিয়ে গণিতের ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধ করেছিলেন আজ প্রকৃতির নিয়মে তিনি নিজেই এক ইতিহাস। Kerala Mathematical Association তাঁর স্মৃতিতে স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করলেও এ কথা কি অস্বীকার করা যায় যে ভারতের গণিতের ইতিহাসে যে মানুষটির অবদান কোনমতেই অগ্রাহ্য করা যায় না তাঁর স্মৃতি আজ সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটাই দূরে। ভুলে যাওয়া আমাদের স্বভাব,তাই হয়তো স্মৃতি আস্তে আস্তে ধূলিময় হয়ে যায়। কিন্তু এও তো ঠিক যে সময়ের প্রেক্ষাপটে যা হারিয়ে যায় তাকেও উদ্ধার করার প্রয়াস করে মানুষই। সরস্বতী আম্মা হারাননি। তিনি আছেন তাঁর কাজেরই মাঝে এবং তাঁর অবদান নিয়ে চর্চা সম্বৃদ্ধ করবে আমাদেরকেই। আশা রাখা যায় ভবিষ্যতে টি.এ.সরস্বতী আম্মার জীবন নিয়ে কাজের পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং সহজতর হবে সাধারণের পক্ষে তাঁর কর্মযজ্ঞের নাগাল পাওয়া।

আচ্ছে দিন

- ডলার ছাড়িয়েছে ৮০ টাকা। সবকিছুতে জি.এস.টি. বৃদ্ধি ১২-১৮ শতাংশ। প্রবল অর্থনৈতিক সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব, রাজনৈতিক হিংসা, ধর্মীয়-জাতপাতের বিভাজন বৃদ্ধি সামাজিক অস্থিরতা... দেশ ছাড়ছেন ভারতীয়রাও। ২০১৯এ নাগরিকত্ব ছেড়েছেন ৪০ হাজার ভারতীয়। ২০২০-তে ৮৫ হাজার এবং ২০২১-এ এক লক্ষ ৬৩ হাজার। প্রথম পছন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়া। জুন ২০২২-এ খুচরো মূল্যবৃদ্ধি ৭.০১ শতাংশ, পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি ১৫.১৮ শতাংশ, বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড ২৬১৮ কোটি ডলার।

ব্যাটারির ন্যানো কথা

তপন দাস

'শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই, শক্তির রুপান্তর হয় মাত্র'। কিন্তু কোন সহজ উপায়ে একে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা যায় সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছিল বহুদিন পূর্বেই। অনেকেই মনে করেন বিদ্যুতের আবিষ্কারক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। কিন্তু ১৭৮০ সালে **লুইজি গ্যালভানি** ও ১৮০০ সালে বিজ্ঞানী **আলসান্দ্রো ভোল্টার** এর হাত ধরেই পৃথিবীর মানুষ পেয়েছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনের সহজ রাস্তা। ইতালিয় বিজ্ঞানী ভোল্টা আবিষ্কার করেছিলেন সরল ভোল্টেইক কোষ বা ব্যাটারি। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগেও মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো ব্যাটারি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনেক মাধ্যম আবিষ্কার হয়েছে। আবার মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরিবর্তন এসেছে ব্যাটারির। তড়িৎকোষ প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নতি বৈদ্যুতিক প্রগতিকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলেছে। তারবার্তা (টেলিগ্রাফ) এবং টেলিফোন, বহনযোগ্য কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, বৈদ্যুতিক গাড়ি, হাজার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এমনকি হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর পেসমেকার যন্ত্রেও ব্যাটারির ব্যবহার হচ্ছে।

সাধারণভাবে যেকোনো তড়িৎকোষে তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম এমন দুটি অংশ থাকে তার একটি ঋনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত অপরটি ধনাত্মক প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত এবং এরা যথাক্রমে ক্যাথোড ও অ্যানোড নামে পরিচিত। প্রত্যেক তড়িৎকোষে একটি উপযুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ থাকে যা দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম। ঋণাত্মক চিহ্নিত প্রান্তটি হল ইলেকট্রনের উৎস যেখান থেকে ইলেকট্রনগুলি বহিঃস্থ একটি বৈদ্যুতিক বর্তনী দিয়ে ধনাত্মক প্রান্তে প্রবাহিত হয়। যখন কোনও তড়িৎকোষ কোনও বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ভার বা লোডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তখন এর ভেতরে একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া উচ্চ-শক্তির বিক্রিয়ককে কম-শক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তর করে আর মুক্ত-শক্তির পার্থক্যটি বৈদ্যুতিক শক্তি হিসাবে বহিঃস্থ বর্তনীতে সরবরাহ করা হয়। ঐতিহাসিকভাবে ইংরেজিতে 'ব্যাটারি' শব্দটি দিয়ে নির্দিষ্টভাবে একাধিক তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ দ্বারা গঠিত একটি যন্ত্রকে বোঝানো হয়, তবে প্রয়োগের বিবর্তনের কারণে 'ব্যাটারি' শব্দটি দিয়ে একটি মাত্র তড়িৎ-রাসায়নিক কোষ দ্বারা গঠিত যন্ত্রকেও নির্দেশ করা হয়। এই তড়িৎকোষ দু'রকমের। একটিকে বলে ভেজা কোষ অন্যটি নির্জল তড়িৎকোষ।

আবার জীবন চক্রের নিরিখে তড়িৎকোষগুলিকে দু'রকম ভাবে শ্রেণীবিভাজন করা হয়। 'প্রাথমিক' তড়িৎকোষ সংযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করতে পারে তবে সক্রিয় উপাদানগুলি একবার নিঃশেষ হয়ে গেলে সেগুলি বৈদ্যুতিকভাবে পুনরায় আহিত বা চার্জ করা যায় না। সীসার অ্যাসিড তড়িৎকোষ 'গৌণ' বা 'চার্জযোগ্য' তড়িৎকোষ। এখানে কোষে তড়িৎ-রাসায়নিক শক্তি ফুরিয়ে গেলে এটির ভেতরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুনরায় শক্তি ভরা যায় ও বারবার ব্যবহার করা যায়, স্থায়ীভাবে সংযুক্ত কোষের আয়ু বাড়িয়ে তোলে। **জন ফ্রেডেরিক ড্যানিয়েল** নামে রসায়নের এক ইংরেজ অধ্যাপক ১৮৩৬ সালে ড্যানিয়েল কোষ আবিষ্কার করেন, যাতে একটি কপার দন্ড (ক্যাথোড) কপার সালফেট দ্রবণে থাকে আর একটি দস্তার তড়িৎদ্বার (অ্যানোড) জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে ডোবানো থাকে। মাটির স্বছিদ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক দ্বারা দ্রবণদুটি আলাদা থাকলেও এর মধ্য দিয়ে আয়ন চলাচল করতে পারে তবে দ্রবণকে মিশ্রিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

ড্যানিয়েল তড়িৎকোষ, এটি বিদ্যুতের প্রথম ব্যবহারিক উৎস ছিল। এটি ভোল্টাইক কোষ এর চেয়ে দীর্ঘ এবং আরও নির্ভরযোগ্য তড়িৎ প্রবাহ সরবরাহ করে। এটি সুরক্ষিত এবং কম ক্ষয়করও। এটি প্রায় ১.১ ভোল্ট বিভব পার্থক্য তৈরি করে।

১৮৩৭ সালে চিকিৎসক **গোল্ডিং বার্ড** ড্যানিয়েল কোষের একটি সংস্করণ উদ্ভাবন করেন যাতে দ্রবণ পৃথক রাখতে প্লাস্টার অফ প্যারিসের প্রতিবন্ধক ব্যবহার করেন। এরপর ১৮৩৮ সালে লিভারপুলের যন্ত্র প্রস্তুতকারী **জন ডান্সার** ড্যানিয়েল কোষের সচ্ছিদ্র পাত্রটি সংস্করণ করেন।

ব্যাটারির ক্রমউন্নয়নে একজন বিজ্ঞানী ব্যাটন তুলে দিয়েছেন আরেক জনের হাতে। কখনো পরিবর্তন এনেছেন তড়িৎদ্বারে আবার কখনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের। যেমন ১৮৬০ এর দশকে **ক্যালাউড** নামে একজন ফরাসি গ্র্যাভিটি কোষ নামে ড্যানিয়েল কোষের একটি বিকল্পরূপ আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে অভ্যন্তরীণ রোধ হ্রাস হয় এবং এইভাবে ব্যাটারি আরও শক্তিশালী প্রবাহ উৎপাদন করে। ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ্র্যাভিটি কোষে একটি কাচের জার থাকে, এর ভিতরে নিচের দিকে একটি তামার ক্যাথোড বসানো থাকে এবং কিনারায় ভিতরের দিকে একটি দস্তার অ্যানোড ঝুলানো অবস্থায় স্থাপন করা হয়। কপার সালফেটের কেলাসগুলো ক্যাথোডের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এরপরে জারটি পাতিত জল দিয়ে ভরা হয়। এরফলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়, জিঙ্ক সালফেট দ্রবণের একটি স্তর আনোডের উপরের দিকে চারপাশে গঠিত হয়। এই উপরের স্তরটি কম ঘনত্বের ও কোষের বিপরীত মেরুত্বের কারণে নীচের কপার সালফেট স্তর থেকে পৃথক থাকে। এরপর জার্মান বিজ্ঞানী **জোহান ক্রিশ্চিয়ান পোগেনডর্ফ** ১৮৪২ সালে সচ্ছিদ্র মাটির পাত্র ব্যবহার করে তড়িৎবিশ্লেষ্য এবং ডিপোলারাইজারকে আলাদা করার সমস্যার সমাধান করেন। পোগেনডর্ফ কোষ যার অপর নাম গ্রেনেট কোষ যেখানে

তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসাবে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ডিপোলারাইজার হিসাবে ক্রোমিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। দুটি অ্যাসিডকে বাহ্যিকভাবে একত্রে মিশানো হয়, ছিদ্রযুক্ত পাত্রটি বাদ দেওয়া হয়। ধনাত্মক তড়িৎদ্বার (ক্যাথোড) হিসাবে ব্যবহৃত হয় দুটি কার্বন ফলক, এই ফলকদুটির মধ্যে একটি দস্তার ফলক (ঋণাত্মক বা অ্যানোড) স্থাপন করা হয়। দস্তার (জিংক) সঙ্গে অ্যাসিড মিশ্রণের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার প্রবণতার কারণে, অ্যাসিডে পরিষ্কার করে দস্তার তড়িৎদ্বার উন্নত করার একটি প্রক্রিয়া সমাধান করা হয়।

১৮৩৯ সালে ওয়েলসের অধিবাসী **উইলিয়াম রবার্ট গ্রোভ** গ্রোভ সেল আবিষ্কার করেন। এটিতে সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবানো একটি জিঙ্ক অ্যানোড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে নিমজ্জিত একটি প্ল্যাটিনাম ক্যাথোড থাকে, সচ্ছিদ্র মাটির পাত্র দ্বারা দ্রবণ পৃথক থাকে। গ্রোভ সেল একটি উচ্চতর প্রবাহ এবং ড্যানিয়েল কোষের প্রায় দ্বিগুণ ভোল্টেজ উৎপন্ন করলেও এর ব্যবহারে বাধ সাধে এই কোষে উৎপন্ন বিষাক্ত নাইট্রোজেনের অক্সাইড ও বেশি অর্থ মূল্যের প্ল্যাটিনাম। এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করেন **আলফ্রেড ডুন** ১৮৮৫, নাইট্রো-মিউরিয়াটিক অ্যাসিড (অ্যাকোয়া রেজিয়া)—আয়রন এবং কার্বন ব্যবহার করে।

১৯৫০ এর দশকের শেষ অবধি জিঙ্ক-কার্বন ব্যাটারি একটি জনপ্রিয় প্রাইমারি কোষের ব্যাটারি হিসাবে জনপ্রিয় ছিল, তবে এর তুলনামূলকভাবে কম আয়ুষ্কালের কারণে বিক্রি কম হয়। **এডিসনে**র পূর্ববর্তী কাজের উপর ভিত্তি করে কানাডিয় প্রকৌশলি **লুইস ইউরি** সিদ্ধান্ত নেন যে এর পরিবর্তে ক্ষারীয় ব্যাটারি আরও ভাল ফল দেবে। তখন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী ক্ষারীয় ব্যাটারি অসম্ভব ব্যয়বহুল ছিল। ইউরির ব্যাটারিতে একটি ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড ক্যাথোড হিসাবে এবং ক্ষারীয় তড়িৎবিশ্লেষ্যের সঙ্গে দস্তা চূর্ণ অ্যানোড হিসাবে থাকে। দস্তা চূর্ণ ব্যবহার করা অ্যানোডকে একটি বৃহত্তর পৃষ্ঠতল দেয়। এই ব্যাটারি ১৯৫৯ সালে বাজারে ছাড়া হয়।

'এক্সাইড' ব্র্যান্ডের অধীনে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালে পর্যন্ত নিকেল-আয়রন ব্যাটারি উৎপাদিত হয়, মূলত টমাস এডিসন ১৯০১ সালে এটির রুপ দান করেছিলেন। তার আগে ১৮৯৯তে সুইডিশ বিজ্ঞানী **আর্নষ্ট ওয়াল্ডেমার জাগনার** নিকেল-আয়রন ব্যাটারি তৈরি করেছিলেন। ব্যাটারির উন্নতিতে ফরাসী বিজ্ঞানী **জর্জ লেকনসে** ও জার্মান বিজ্ঞানী **কার্ল গাসনারে**র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

এরপর নিকেল এবং লিথিয়াম-ভিত্তিক তড়িৎকোষ প্রবর্তনের ফলে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট থেকে শুরু করে মোবাইল ফোনসহ অসংখ্য বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৭ সালে সনি এবং আসাহি কাসেই লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি বাজারে ছাড়ে। এই ব্যাটারি একটি তরল দ্রাবকের পরিবর্তে একটি কঠিন পলিমার সংমিশ্রণে তাদের তড়িৎবিশ্লেষ্য ধারণ করে এবং তড়িৎদ্বার এবং বিভাজক একে অপরের সঙ্গে স্তরিত হয়। পরবর্তী পার্থক্যটি হলো ব্যাটারিকে অনমনীয় ধাতব আবরণের পরিবর্তে নমনীয় মোড়কে আবদ্ধ করা হয়, যার অর্থ এই জাতীয় ব্যাটারি নির্দিষ্ট যন্ত্রের সঙ্গে মানানসই আকারে তৈরি করা যায়। এটি মোবাইল ফোন এবং ব্যক্তিগত ডিজিটাল সহায়ক যন্ত্র, এবং বেতার-নিয়ন্ত্রিত বিমানের মতো বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের নকশায় লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারির সুবিধা হয়েছে, কারণ এই ধরনের ব্যাটারি আরও নমনীয় এবং আঁটসাঁট ডিজাইনে মানানসই। সাধারণ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির তুলনায় এগুলির মধ্যে সাধারণত নিম্ন শক্তি ঘনত্ব থাকে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্রস্তুতি যে তিনজন বিশেষ ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তারা ২০১৯-এ রসায়নের নোবেল বিজয়ী **জন বি গুডেনাফ, এম স্ট্যানলি হুইটিংহাম** ও **আকিরা ইয়োশিনো**।

একদিকে নগরায়ন ও অন্যদিকে শিল্পায়নের জেরে মানুষ যখন বুঝতে শুরু করল জীবাশ্ম জ্বালানির সংকটের কথা, থেমে থাকলেন না বিজ্ঞানীরাও। তারাও নেমে পড়লেন বিকল্প শক্তির সন্ধানে। খুব সচেতন ভাবেই জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা থেকে মুক্তির পথ সর্ব প্রথম দেখিয়েছেন এম স্ট্যালনি হুটিইংহাম। অপেক্ষাকৃত হাল্কা, জলে ভাসমান লিথিয়াম ধাতু দিয়ে তৈরি করেন এই ব্যাটারি। গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকের শেষের দিকে তিনিই ইন্টারকেলেশান তড়িৎ আবিষ্কার করেন। পুনঃনবিকরনযোগ্য ব্যাটারির ক্ষেত্রে এই ধরনের তড়িৎ দ্বারের ব্যবহার অপরিহার্য। এই ব্যাটারিতে একদিকে যেমন প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করে রাখা যায় আবার তাকে পুনরায় তড়িতাহিতও করা সহজ। লিথিয়াম ব্যাটারির এই উদ্ভাবক ইন্টারকেলেশান তড়িৎদ্বার বানাতে টাইটেনিয়াম ডাই সালফাইডের ক্যাথোড লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অ্যানোড রূপে ব্যবহার করেছেন। অনেকে মজার ছলে বলেন এ যেন স্যাণ্ডুইচে একটুখানি জ্যাম দেওয়া। এই ব্যাটারিতে জ্যামের কাজটা করে লিথিয়াম আয়ন। হুইটিংহাম এখানে লিথিয়ামের সঙ্গে পরিবর্তনশীল জারণস্তর সম্পন্ন ভ্যানাডিয়ামের যৌগও ব্যবহার করেছেন। অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর এই লিথিয়াম ব্যাটারিকে আরও উন্নত করার দায়িত্ব নিলেন জন বি. গুডেনাফ। চার ভোল্টের ব্যাটারিটি বানাতে গুডেনাফ লিথিয়ামের পরিবর্তে অন্য ধাতু ব্যাবহার করেছেন। নোবেল বিজয়ীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে নোবেল জয়ী গুডেনাফ কর্তৃক লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উন্নতি সাধন বিজ্ঞানের জগতে এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার। অতিসক্রিয় লিথিয়ামের ব্যাটারিকে কিভাবে আরও নিরাপদে ব্যবহার করা যায়, এ নিয়ে গুডেনাফের পরে যিনি ভেবেছেন তিনি হলেন জাপানি রসায়নবিদ আকিরা ইয়োশিনো। ইয়োশিনো কার্বনজাত এক বিশেষ পদার্থের মধ্যে একে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই উন্নত মানের ব্যাটারি সৌরশক্তি বা বায়ু প্রবাহ থেকে প্রাপ্ত শক্তিকেও সঞ্চিত রাখতে সক্ষম। ১৯৮১ সালে পলিঅ্যাসিটিলিনকে কাজে লাগিয়ে পুনঃনবিকরনযোগ্য ব্যাটারি বানাতে সক্ষম হলেও এই ব্যাটারি আয়তনে অনেকটা বড় হওয়ায় এটি বাণিজ্যিকভাবে অতটা সুফল লাভ করেনি। কিন্তু তিনিই প্রথম লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইডের ব্যাটারিকে ফেব্রিকেট করেছেন। তার আবিষ্কৃত কার্বনজাত পদার্থ অ্যানোড রুপে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সক্রিয়তা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং এটির ব্যবহার অনেক গুণ বেশি নিরাপদ। আকিরার এই

গবেষণা টোকিওর আসাহি কর্পোরেশন ও নাগোয়ার মেইজো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সোনি কোম্পানি ১৯৯১ সালে বাণিজ্যিক ভাবে এই লিথিয়াম ব্যাটারি বাজারে নিয়ে আসে। আজ প্রায় সব কোম্পানি মোবাইল, ল্যাপটপে বা ক্যামেরায় এই ব্যাটারি ব্যবহার করছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কখনো থেমে থাকেনা। মহাকাশ এবং চিকিৎসা প্রযুক্তিতেও কার্যকর হবে এমন ব্যাটারিও আবিষ্কার হয়ে গেল। এই নতুন ব্যাটারিটি হল **ন্যানো-ডায়মন্ড ব্যাটারি**। ২০০৬ সালে, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাবট ইনস্টিটিউটের বার্ষিক বক্তৃতায়, গবেষকরা, প্রথমবারের মতো, একটি অভিনব প্রযুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন যা শক্তি উৎপন্ন করতে পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবহার করতে পারে। নাম দেওয়া হয়েছে 'হীরা ব্যাটারি'। ২০২০ সালে, ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক একটি স্টার্টআপ কোম্পানি, NDB, একটি অত্যন্ত দক্ষ ন্যানো-ডায়মন্ড ব্যাটারি তৈরি করেছে যা চার্জ ছাড়াই ২৮,০০০ বছর পর্যন্ত চলতে পারে। এই ব্যাটারিটিও পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

এইভাবে সহজলভ্য তড়িৎ উৎপাদন প্রযুক্তিতে একটি তড়িৎ কুণ্ডলীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে একটি চুম্বককে সরানো যায়। আর ডায়মণ্ড ব্যাটারির ক্ষেত্রে ব্যাটারিটিকে কোন তেজস্ক্রিয় উৎসের কাছে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ পরিমাণে অল্প হলেও ব্যাটারি তার কার্যকারিতা অনেকদিন ধরে রাখতে পারে।

ক্যাবট ইনস্টিটিউটের গবেষকরা একটি প্রোটোটাইপ "হীরা ব্যাটারি" প্রদর্শনের জন্য নিকেল-৬৩ কে তেজস্ক্রিয় উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তেজস্ক্রিয় উৎস একটি পারমাণবিক শক্তি চালিত ব্যাটারি উৎপাদন করতে একটি হীরা ভিতরে আবদ্ধ করা হয়। যাইহোক, দলটি তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ ব্যবহার করে আরও দক্ষতার সঙ্গে একটি ব্যাটারি পাওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল। তেজস্ক্রিয় রিয়েক্টরে ব্যবহৃত নিউট্রন কার্বনকে কার্বন-১৪ এ রুপান্তর করে। কার্বন-১৪ থেকে নির্গত বিটা রশ্মি এখানে শক্তির উৎস। **টম স্কট**, ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক, প্রযুক্তির সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে এই প্রযুক্তিটি পারমাণবিক বর্জ্য থেকে দীর্ঘমেয়াদী পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকবে এবং কোনও চলমান অংশ বা নির্গমন না থাকায় কোনও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় একটি নিউক্লিয়াসকে একটি নিউট্রন দ্বারা আঘাত ঘটিয়ে তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয়। ফলে উৎপন্ন নিউট্রন C-১২ কে C-১৪ এ সহজে রূপান্তরিত করে। এরা একধরনের পারমাণবিক বর্জ্য। ন্যানো-ডায়মন্ড ব্যাটারি শক্তি উৎপন্ন করতে পারমাণবিক বর্জ্য ব্যবহার করা হলেও তেজস্ক্রিয় কোর সিন্থেটিক হীরা বা পলিক্রিস্টালাইন হীরার একাধিক স্তর দিয়ে সুরক্ষিত। পলিক্রিস্টালাইন হীরা একটি ব্যতিক্রমী তাপীয় পরিবাহী উপাদান। এই পলিক্রিস্টালাইন হীরার ব্যবহার ন্যানো-ডায়মন্ড ব্যাটারিকে অত্যন্ত শক্ত এবং টেম্পারপ্রুফ করে তোলে।

ডায়মন্ড নিউক্লিয়ার ভোল্টাইক (DNV) হল একটি ডিভাইস যা একটি অর্ধপরিবাহী নিয়ে গঠিত। পৃথক ইউনিটগুলি একটি স্ট্যাক বিন্যাস গঠনের জন্য সংযুক্ত থাকে এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি সিস্টেমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক যোগাযোগের তল তৈরি করতে তৈরি করা হয়। এই নকশাটি সিস্টেমের সামগ্রিক দক্ষতাকে উন্নত করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং পণ্যের জন্য একটি বহু-স্তর সুরক্ষা ঢাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমস্ত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উচ্চ পরিমাণে তাপ শক্তি উৎপাদন করতে পারে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে এই বিটা ভোল্টেইক কোষে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় C-১৪ সজীব কোষের কোনো ক্ষতি করবে না তো? এই প্রশ্নকে অনেকটাই নস্যাৎ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের যুক্তি যে বিশেষ পদ্ধতিতে এই ব্যাটারির খোল তৈরি হয় তাতে এই আশঙ্কা প্রায় নেই বললেই চলে। বরঞ্চ বলা ভালো দূষণ মুক্ত সবুজ পৃথিবীর লক্ষ্যে এই বিকল্প শক্তি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। মহাকাশ যাত্রা থেকে শুরু করে পেশমেকারে এই ব্যাটারি ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজন ও ব্যবহারের নিরিখে অপেক্ষাকৃত ছোট ও হালকা ব্যাটারি এই প্রযুক্তিতে বানানো সম্ভব হয়। দীর্ঘস্থায়ী এবং ভোল্টেজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী। আমরা আছি নতুনের অপেক্ষায়।।

মেরুজ্যোতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি

অমিতাভ চক্রবর্তী

১৯৬৬ সাল। আমেরিকায় লস লোমিটাস এলিমেন্ট্রি স্কুলে ফার্স্ট গ্রেডের ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন শ্রীমতী ওয়েডলি। ক্লাসের ক্ষুদেদের একটি বিশেষ হোমওয়ার্ক দিলেন তিনি। প্রত্যেকেই বাড়িতে গিয়ে শুনে আসবে তাদের বাবা সংসার চালানোর জন্য ঠিক কী কাজ করেন এবং পরদিন ক্লাসে এসে বলবে। পরদিন যথারীতি ক্লাস শুরু হল। সেদিন শ্রীমতী ওয়েডলিকে দেখে যেন যমদূতের মতো ভয় করছিল চার্লস হির্সবার্গ-এর। অথচ ওয়েডলি মানুষ হিসাবে খারাপ কিছু নন, এমনকি ছাত্রদের সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহারও তিনি করেন না। চার্লসের শুধুই মনে হচ্ছিল, ওর বাবা এবং মা একই পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাহলে শুধু বাবার কথা বলতে হবে কেন? ক্লাসের প্রত্যেকেই একে একে নিজের পিতার পেশা বলছেন এবং শিক্ষিকা ব্ল্যাকবোর্ডে তা লিখে রাখছেন। চার্লসের পালা এলে ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল 'আমার বাবা একজন বিজ্ঞানী।' শ্রীমতী ওয়েডলি ব্ল্যাকবোর্ডে 'সায়েন্টিস্ট' কথাটি লেখার সঙ্গে সঙ্গেই চার্লস বলে উঠল 'আমার মাও একজন বিজ্ঞানী'। জনা পঁচিশেক ছাত্রের ছোটো ক্লাসঘরে তখন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। মুহূর্তে পঁচিশ জোড়া চোখ ঘুরে গেল চার্লসের

দিকে। যেন অবিশ্বাস্য কিছু বলে বসেছে সে। বড়ো হয়ে চার্লস বলেছেন, 'সেদিন থেকেই আমি বুঝতে শুরু করলাম আমার মা অন্যদের থেকে কতটা আলাদা।'

চার্লসের মা যোহান ফাইনম্যান। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যানের ছোটো বোন তিনি। অথচ তার নিজের বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার পথ কিন্তু খুব মসৃণ ছিল না। ছোটোবেলায় তাঁর মা বলেছিলেন, 'মেয়েদের মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের কাজকর্মের উপযুক্ত নয়।' ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে বক্তব্য রাখার সময় যোহান নিজেই এই তথ্য জানিয়েছিলেন। তবে বয়সে তাঁর চেয়ে নয় বছরের বড়ো দাদা রিচার্ড কিন্তু নিজের কাজকর্মে সঙ্গী করতেন ছোটো বোনকে। তখন মাত্র ১৪ বছর বয়স রিচার্ডের। হরেক কিসিমের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে নিজের বেডরুমে একটি গবেষণাগার বানিয়েছিল সে। সেই গবেষণাগারে নিজের সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেছিল বোন যোহানকে। পারিশ্রমিক সপ্তাহে ৪ সেন্ট। কাজ বলতে দাদার নির্দেশ মতো কোনো সুইচকে অন বা অফ করে দেওয়া, অথবা পরীক্ষানিরীক্ষা চলার সময় উপরের বাক্স থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নামিয়ে আনা। এই কাজ করতে গিয়েই হয়তো বিজ্ঞানকে ভালোবাসতে শুরুও করেছিলেন যোহান।

যোহান ফাইনম্যান

ছোট বোনটিকে বিভিন্ন সহজ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে বলত রিচার্ড। সমাধান করতে পারলে পুরস্কার ছিল দাদার চুলের মুঠি ধরে কিছুক্ষণ টেনে দেওয়ার অধিকার। দেয়ালে টাঙ্গানো সমকোণী ত্রিভুজের ছবিটির বাহুগুলোতে হাত বুলিয়ে চার বছরের বোনকে রিচার্ড শেখানোর চেষ্টা করতো-অতিভুজের বর্গ সবসময় ভুমির বর্গ এবং লম্বের বর্গের যোগফলের সমান। অদ্ভুত ছন্দে পিথাগোরাসের সূত্রের এই প্রয়োগটি বলতো সে। শুনে শুনে ছন্দময় কথাগুলো যোহানের মনে গেঁথে গিয়েছিল। তবে অনেকসময়ই দাদার কথাগুলো অদ্ভুত ঠেকত ওর কাছে। রিচার্ড বলত এই ঘরবাড়ি, লোহার দেরাজ, ওদের পোষা কুকুর, এমনকি যোহানের নিজের শরীরও নাকি অ্যাটম দিয়ে তৈরি! কখনো হয়তো জল ভর্তি কাচের গ্লাসকে উল্লম্বভাবে জোরে ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিত, ঘোরার সময় জলের গ্লাস উল্টো হওয়া সত্ত্বেও অপকেন্দ্র বলের প্রভাবে কেন জল পড়ছে না। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে যোহান বলেছেন ''রিচার্ডই আমার প্রথম শিক্ষক''। একবার মাঝরাতে ওকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল রিচার্ড। তারপর দু'জনে ছুটে চলে গিয়েছিল আলো ঢাকা শহর থেকে কিছুটা দূরে গলফ কোর্সে। আকাশে তখন মায়াবী আলোর খেলা। কম্পনশীল সেই বর্ণিল আলো যেন অন্য কোনো অচেনা জগৎ থেকে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। বোনকে প্রথম মেরুজ্যোতি দেখিয়েছিল রিচার্ড, আর বলেছিল ''আজও কেউ জানে না কী করে এটা হয়।'' অনেক বছর পর নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে যোহান বলেছিলেন, ''দেখে এত অবাক হয়েছিলাম, যে সেদিন থেকেই আমি মেরুজ্যোতি নিয়ে উৎসাহী হয়ে পড়ি।' বোনের ১৪ বছরের জন্মদিনে একটি কলেজ টেক্সটবুক উপহার দিয়েছিল রিচার্ড। বইটির শিরোনাম ''অ্যাস্ট্রোনমি''। প্রায় একমাসের বেশি সময় ধরে বইটি খুঁটিয়ে পড়ছিল যোহান। বইয়ের ৪০৭ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে একটি তথ্যে আটকে গেল ওর চোখ। সেখানে লেখা ''Relative strengths of the Mg^+ absorption line at 4,481 angstroms ... from Stellar Atmospheres by Cecilia Payne''। ''সিসিলিয়া পাইন''! নামটি দেখেই চমকে উঠেছিলেন যোহান। তার মানে মহিলারাও বই লেখেন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী হন! সেদিন থেকে নিজেও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে। আর বুঝেছিল বিজ্ঞানী হতে গেলে প্রয়োজন সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং কঠিন অধ্যাবসায়ের মানসিকতা। তারপর কবে থেকে যেন বিজ্ঞানচর্চাকেই নিজের ভবিষ্যৎ পেশা হিসাবে লক্ষ্য স্থির করে ফেলেছিল যোহান। ওর মনে হল, মহিলা বিজ্ঞানী মানেই মেরি কুরি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই! কারণ হাজারো প্রতিকুলতাকে জয় করে দু'বারের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী মেরি কুরিকে যোহান তখনো রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে ভাবতে পারতো না। তার কাছে কুরি যেন এক পৌরাণিক কাহিনির চরিত্র।

যোহান ফাইনম্যানের জন্ম ১৯২৭ সালের ৩০ মার্চ নিউইয়র্ক সিটির কাছাকাছি কুইন্স-এ। মেলভিল আইরি ফাইনম্যান এবং লুসিলির দ্বিতীয় সন্তান যোহান। ইহুদি হলেও পরিবারে কোনো ধর্মাচরণ দেখেন নি তিনি। দাদা রিচার্ড তো আবার নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন ওদের ব্যবসায়ী পিতা মেলভিল ফাইনম্যান। সংসার চলবে কী করে?' এই ভাবনায় তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল লুসিলির। ছোট্ট যোহানের মনে হয়েছিল, সংসারের জন্য উপার্জন প্রধানত পুরুষরাই করে, অতএব তিনি পুরুষদের কোনো পেশাতেই নিযুক্ত হবেন। আর রোল মডেল দাদাটি যখন পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছে, অতএব পদার্থবিদ হওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি যোহান। স্কুল, কলেজের পাঠ শেষে পদার্থবিদ্যায় পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন যোহান ফাইনম্যান। এবার কর্মজগতে প্রবেশের সময়। তখনকার দিনে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার 'Situations Wanted' সেকশনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা বিজ্ঞাপন থাকত। পুরুষ বিভাগে নিজের উপযুক্ত কোনো কাজের হদিস পেলেন না তিনি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে আমেরিকার মহিলারা তখনো পরিবারের কাজকর্মকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। এমনকি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিন অফ উইম্যান' পদাধিকারীও 'সচেতন মাতৃত্ব' (sensible

motherhood)-এর পক্ষেই সওয়াল করতেন। ততদিনে যোহান নিজেও মা হয়েছেন। দুই সন্তান ও স্বামী রিচার্ড হিসবার্গকে নিয়ে বছর তিনেক কেবলমাত্র পরিবারকেই সামলেছেন তিনি।

তবে বিজ্ঞানের জগৎ থেকে বহুদূরে কেবলমাত্র সাংসারিক দায়দায়িত্ব সামলে জীবন কাটানো একসময় অসহনীয় হয়ে উঠল যোহানের। তখন ১৯৬৪ সাল। নিজের পদার্থবিদ্যার ডিগ্রি নিয়ে লেমন্ট-ডোহার্টি অবজারভেটরিতে কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করলেন তিনি। গৃহীত হল আবেদনপত্র। সৌরঝড় এবং ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের সম্পর্ক নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেন যোহান ফাইনম্যান। কিছুদিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য এলো গবেষণায়। বেশ কয়েকজন গবেষকের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করলেন ভূপৃষ্ঠের অনেকটা উপরে যে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার অঞ্চল, যেখানে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাধান্য এবং সৌরঝড়ের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে, সেটা আদতে একটা উন্মুখ প্রান্ত (open ended) ক্ষেত্র। অথচ সমসাময়িক ধারণা ছিল এই অঞ্চল জলের ফোঁটার মতো (closed-tear drop) কোনো ক্ষেত্র। এবার গবেষকরা জানালেন এই ক্ষেত্রের একদিকে বরং দীর্ঘ লেজের মতো অংশ থাকে।

লেমন্ট-ডোহার্টিতে নিজের গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়মিত দাদা রিচার্ডের সঙ্গে আলোচনা করতেন যোহান। আবার মনের কোনে একটি আশঙ্কাও উঁকি দিত। ওর গবেষণা ও জানাবোঝাকে সম্বল করে রিচার্ড আবার মেরুজ্যোতির কারণ আবিষ্কার করে ফেলবে নাতো? A Passion for Science- Stories of Discovery and Invention বইয়ের একটি অধ্যায়ে এই আশঙ্কার কথা স্বীকার করেছেন যোহান। তিনি লিখেছেন—

''আমি বলেছিলাম, 'দেখো, আমরা নিজেরাই প্রতিযোগিতা করি, এটা আমি চাই না। তাই চল, পদার্থবিজ্ঞানকে আমাদের মধ্যে ভাগ করে নেই।' যোহান বলেছিলেন—''আমি অরোরা (মেরুজ্যোতি) নেব এবং তুমি বাকি মহাবিশ্ব নিয়ে যাও।'' উত্তরে রিচার্ড বলেছিলেন, ''ঠিক আছে!''

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অনেক রাতে গবেষণাগার থেকে বাড়িতে ফিরতেন যোহান। এদিকে তাদের মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে করতে হয়তো ঘুমিয়েই পড়ত সন্তানরা। বাড়ি ফিরেই ফ্রিজের খাবার গরম করে সেরে নিতেন ডিনার। তারপর কোনোদিন হয়তো ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সুইচটি অন করে সশব্দে মেঝে পরিষ্কার করতে শুরু করতেন। ঘুম ভেঙে যেত সন্তানদের। কেঁদে উঠত ওরা। সন্তানদের জড়িয়ে ধরে নিজেও চোখের জল ফেলতেন। তারপর বলতেন—''আমি বুঝতে পারি তোমরা আমাকে কাছে পেতে চাও। কিন্তু আমি তো হতে পারি শুধুমাত্র একজন পার্টটাইম মা অথবা একজন ফুলটাইম পাগল মহিলা।'' বিজ্ঞান গবেষণার প্রতি এতটাই অনুরাগ ছিল তাঁর।

পরবর্তীকালে নাসার জেট প্রপালশান ল্যাবরেটরিতে যোগ দিয়েছিলেন যোহান। সেখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে থাকা ম্যাগনেটোস্ফিয়ার নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণার সৌজন্যেই আমরা জেনেছিলাম কীভাবে সূর্য থেকে নিঃসৃত আয়নীয় কণা ওই ম্যাগনেটোস্ফিয়ার স্তরে প্রবেশের ফলেই উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর রাতের আকাশে অপূর্ব মেরুজ্যোতির (Aurora borealis) সৃষ্টি হয়।

সূর্যের প্রভাবে ভূচৌম্বকীয় এবং জলবায়ু বিশৃঙ্খলার কারণগুলি সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ২০০০ সালে নাসার এক্সেপশনাল সায়েন্টিফিক মেডেল লাভ করেছিলেন তিনি। ২০০৪-এ কর্মক্ষেত্র থেকে অফিশিয়ালি অবসর গ্রহণ করলেও ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জার্নালে নিয়মিত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ করে গিয়েছেন ড. যোহান ফাইনম্যান। পরিচিত মহলে মজা করে বলতেন, ''সূর্য যখন প্রতিনিয়ত এত মজার মজার কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে, তাহলে আমি অবসর নেবো কী করে?'

তবে বয়সের ভারে শরীরে থাবা বসাচ্ছিল নানা রকম জটিলতা। অবশেষে ২১ জুলাই ২০২০, ৯৩ বছর বয়সে থেমে যায় বিজ্ঞানীর পথ চলা। অবশ্য অনেক আগেই মাত্র ৬৯ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন দাদা রিচার্ড ফাইনম্যান।

কেন এত অপুষ্টি?

- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আয় কমে যাওয়া, কাজ হারানো, কাজ না পাওয়া
- দু'বছর স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ। ফলে সকালে ও দুপুরে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া বন্ধ
- মিড ডে মিলে বরাদ্দ কমানো। ডিম, ছোলা, ডাল ও সোয়াবিন বাদ
- নাবালিকা ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি
- নাবালিকা অপুষ্টি ও গর্ভধারণ, অপুষ্ট সন্তান
- অল্প বয়সে পরপর গর্ভধারণ, অযত্ন, গৃহে প্রসব, সময়ের আগে অপরিণত সন্তান প্রসব
- শিক্ষক ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নির্বাচন সহ সরকারি কাজে যুক্ত করা
- দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, আমলাতান্ত্রিকতা, কেন্দ্র-রাজ্য দ্বৈরথ

শিক্ষা প্রসঙ্গে

‘করোনা’-র সমার্থক ‘লেখাপড়া করো না’

সোমা সেনগুপ্ত

গত দু'বছর ধরে গোটা বিশ্ব এক অভিশাপের সম্মুখীন হল যার কোনো আগাম প্রস্তুতি ছিল না,যাকে বলা হয় Covid-১৯ এবং তা আমাদের কাছে করোনা বলেই পরিচিতি লাভ করেছে। করোনাকালে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে কি কি ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়েছে তা আগেও আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা তার ভয়াবহতা তুলে ধরে আশু সমাধানের বিষয়গুলি আলোচনা করেছেন এবং করেও চলেছেন।

তবে শিক্ষাব্যবস্থায় করোনার আঘাত বোধহয় সব ভয়কেই ছাপিয়ে গিয়েছে তার ঘোষণাহীন পদার্পণে।

প্রথমেই আসা যাক কিছু সমীক্ষায়। ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বিশ্বে একশ বাহাত্তর কোটি পঞ্চাশ লাখ শিক্ষার্থী শিখন ক্ষতির সম্মুখীন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এখানকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও ১৭ই মার্চ থেকে বন্ধ থেকেছে। প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী তার মাশুল গুনেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ‘Annual Status of Education Report’ -এ যে সমীক্ষা বেরিয়ে এসেছে তা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে খুবই উদ্বেগজনক বলেই জানা গেছে। দেখা গেছে যে ২০১৮ সালে প্রথম শ্রেণির ২৪.৯ শতাংশ পড়ুয়া অক্ষর পড়তে পারত না, সেটা ২০২১-এর ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছে ৩২.১ শতাংশ।২০১৮-তে তৃতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ৮.৩ শতাংশ পড়ুয়া অক্ষর চেনার বিষয়ে অপারগ ছিল, ২০২১-এ সেটা বেড়ে হয় ১২.৫ শতাংশ। ২০২১ সালে তৃতীয় শ্রেণির ৯.২ শতাংশ পড়ুয়া ১ থেকে ৯ সংখ্যা চিনতে পারেনি, ২৮.৮ শতাংশ পড়ুয়া ঐ সংখ্যাগুলি চেনে কিন্তু ১০-এর পর থেকে ৯৯ পর্যন্ত চিনতে পারছে না, ৩২.৭ শতাংশ পড়ুয়া ৯৯ পর্যন্ত চিনলেও বিয়োগ জানে না,১৫.৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিয়োগ জানলেও ভাগ জানে না।

এত সত্ত্বেও সমীক্ষায় আবার কিছুটা আশার কথা প্রকাশ পেয়েছে, তা হল করোনা পর্বে যেখানে বহু পড়ুয়াই স্কুলছুট হয়েছে সেখানে ২০২১ সালে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে যেখানে ৬-১৪ বছরের ৮৮.১ শতাংশ পড়ুয়া সরকারি স্কুলে ভর্তি হয় সেখানে ২০২১ সালে তা দাঁড়ায় ৯১.৫ শতাংশ-এ। ২০১৮ সালে ৭-১০ বছরের পড়ুয়ার সংখ্যা ৮৬.৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালে ৮৯.২ শতাংশ হয়। আবার অন্যদিকে ২০১৮ সালে বেসরকারি স্কুলে ৬-১৪ বছরের পড়ুয়ার সংখ্যা ৭.৯ শতাংশ থেকে কমে ২০২১ সালে হয় ৬.৫ শতাংশ। অঙ্গনওয়াড়িতে ২০১৮ সালে হয় ৭২.৬ শতাংশ পড়ুয়া, সেটাই বেড়ে হয় ৮৯.৪ শতাংশ ২০২১ সালে।

করোনাকালে সরকারি বেসরকারি স্কুলের পড়াশোনা অনেকটাই মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়ে। স্মার্টফোন, রেডিও, টিভি ও সহায়ক বই এই চারটি মাধ্যমে সরকারি স্কুলের ৬৪.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ও বেসরকারি স্কুলের ৮১.৪ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়েছে। সমীক্ষা জানাচ্ছে সরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের টিউশন প্রবণতা কমেছে, বেসরকারি ক্ষেত্রে বেড়েছে। মিডডে মিল পেয়েছে ৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী।

এতো গেল সংখ্যাতত্ত্বের কিছু হিসেব, যার থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে করোনারই কারণে কি প্রভূত পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়েছে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন পড়ুয়ারা। কোভিড পরিস্থিতিতে নিম্নবিত্ত মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ঘরের সেইসব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, যারা স্কুল খোলা থাকার সময়ে মিডডে মিলের সুবিধাও পেত। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ সংসারের হাল ধরতে চাষের কাজে, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজে, গ্যারেজে,মাছ-আনাজ বিক্রির সম্ভার নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের অনেকে অনুত্তীর্ণ কৈশোরেই বাধ্য হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে অকাল মাতৃত্বের ভারে ভবিষ্যৎ পঙ্গু সমাজ সৃষ্টির সোপান হচ্ছে নিজেদের অভিশপ্ত জীবনকে সম্বল করে। এদের কারোরই স্মার্টফোন কিনে, রিচার্জ করে অনলাইনে পড়াশোনা করার সামর্থ্যই নেই। সেখানে পড়াশোনার শত ইচ্ছা থাকলেও এদের ভরসা চোখের জল ও অপরিণত বয়স থেকেই জীবনসংগ্রাম।

হয়তো বিনা ঘোষণায় এই মহামারীর আগমনে স্কুল কলেজ বন্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মতো এতো করুণ অবস্থা বোধহয় আর কোনো রাজ্যে হয়নি, যেখানে প্রাথমিক শ্রেণির শিশুরা পর্যন্ত স্কুল খোলার আর্তি নিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে পথে বসেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে খেলা, মেলা, উৎসব, ভোট সবই নির্দ্বিধায় ছাড়পত্র পেয়েছে। অথচ স্কুলকলেজের ১৫ বছর ও তদোর্ধদের টিকা দেওয়ার পরেও শিক্ষাঙ্গন খোলার ক্ষেত্রে প্রবল অনীহা দেখা গিয়েছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, যেখানে শিক্ষা প্রতিটি ছাত্রদের প্রাথমিক অধিকার সেখানে সরকারের দায়িত্ববোধের কোনো পরিচয়ই পাওয়া গেল না যাতে শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠুভাবে বিধিনিষেধ মেনে শিক্ষার সুযোগ পায়।

করোনা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবিতে ফেসবুক, টুইটারে সরব হয়েছিলেন অভিভাবকদের একাংশ; সঙ্গে ছিলেন কিছু বিশিষ্টজন। হ্যাশট্যাগ ওপেন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লিখে সোস্যাল মিডিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার দাবি জানিয়েছিলেন তাঁরা। অভিভাবকদের মতে পুরভোট থেকে মেলা, সংক্রমণের জন্য আটকে নেই কিছুই। অথচ শিক্ষাঙ্গন খোলার ক্ষেত্রেই এদের অজুহাতের শেষ নেই। এই অবস্থায় যেহেতু সমস্ত শ্রেণির পড়ুয়াদের ভবিষ্যতই নষ্ট হচ্ছে তাই অভিভাবকদের কেউ লিখেছিলেন, ‘এবার মনে হয় গর্জে ওঠা দরকার প্রত্যেক অভিভাবকের’। যেহেতু তাঁদের চোখের সামনে তাঁদের

সন্তানদের বিপুল ক্ষতির শিকার হতে দেখছেন এইভাবে যে হয় তারা ক্রমশঃ খিটখিটে হয়ে পড়ছেন নয়তো মানসিক অবসাদে বিষণ্ণ মনমরা হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। এ যে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়ে চোখ খুলে গিয়েছে অভিভাবকদের, তাঁরা বুঝেছেন এই করোনারই ভয় দেখিয়ে সন্তানদের ভবিষ্যতকে একেবারে পঙ্গু করে দেওয়াই এদের লক্ষ্য। আর এইসবের কারণে আরও একটি সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে, তা হল শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে কোনো অসাধু ব্যবসায়িক মুনাফার সম্পর্ক নেই তো? না হলে যেখানে ক্ষতিকর পানীয়কে (মদ) তার অপকারিতা জানা সত্ত্বেও বাড়তি কর সংগ্রহের লোভে তা দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরাজ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এবং ব্যাপকভাবে যেখানে সেখানে বিক্রির ব্যবস্থা চলছে সেখানে শিক্ষার মতো অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রাখা হচ্ছে। এর কারণ কি এটাই যে এখনো এখান থেকে চটজলদি মুনাফা পাওয়া যায় না এবং শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের অসীম চাহিদা যাতে তাঁদের প্রভূত অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাকে কিনতে বাধ্য করে ও শিক্ষা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণরূপে একটি লাভজনক ব্যবসা। যদি পরিস্থিতি এমনি হয় তবে শিক্ষাঙ্গন শুধুই উচ্চবিত্তের নাগালে থাকবে। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত পড়ুয়া এবং তাদের মধ্যেও যারা মেধাবী, সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবে। আর তার ফল হবে অতি ভয়াবহ। একমাত্র বাধ্য অনুগত সেবক বাদে আর কারোর কোনো অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং এটাই বোধহয় কাঙ্ক্ষিত।

এই অবস্থা শুধু অভিভাবকরাই নয় আঁচ করতে পারছিলেন বহু শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরাই। তাই অনেকদিন ধরেই সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে মাঠে বসিয়ে কিংবা স্কুলের বারান্দায় বসিয়ে সম্পূর্ণ বিধি মেনেই পড়াশোনার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর তাঁদের এই উদ্যোগে অভিভাবকরাও যারপরনাই খুশি।

যাইহোক শিক্ষাঙ্গন খোলার ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্টজনদের লাগাতার কলম চালানো থেকে অভিভাবকদের উৎসাহ, শিক্ষক-শিক্ষামহলের বিভিন্ন উদ্যোগ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালয়ে গিয়ে পড়তে যাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ততা, চিকিৎসকদের থেকে পাওয়া সুপরামর্শ যাতে সঠিক নিয়ম মেনে শিক্ষাঙ্গনে যত দ্রুত সম্ভব পড়ুয়ারা ফিরতে পারে এবং তদুপরি আশু স্কুল খোলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের অনড় মনোভাবের কারণে যেখানে রাজ্য সরকার জানায় ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারা এ বিষয়ে তাদের মতামত কোর্টকে জানাবে সেখানে অভূতপূর্ব চাপের মুখে ৩রা ফেব্রুয়ারি শিক্ষাঙ্গন খোলার ঘোষণা করে। সেখানে বলা হয় অষ্টম শ্রেণি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা উন্মুক্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জানাই এর মাঝে দু'বার আংশিক সময়ের জন্য নবম শ্রেণি থেকে খোলা হলেও অষ্টম শ্রেণি এই প্রথমবার খোলা হল। আর তার সাথেই 'পাড়ার শিক্ষালয়' নামে এক অযৌক্তিক ব্যবস্থাকেও সামিল করা হল অবশিষ্ট শ্রেণিগুলির জন্য। যদিও পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্বল করে অভিভাবকদের সংশয় থেকেই যাচ্ছিল, 'আবার সব বন্ধ হবে না তো?' তবে ইতিমধ্যেই ৯ই ফেব্রুয়ারি রাজ্যের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বাদবাকি সমস্ত স্কুল স্বাভাবিকভাবে বিধি মেনে খুলে দেওয়ার পক্ষে মতামত দেন। তাঁর কথায়, 'এখন কোভিডের যা পরিস্থিতি, তাতে যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত স্কুল খুলে দিতে হবে। বোর্ডের (পর্ষদের) সকলেরই এবিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই।' এবিষয়ে নিজেদের মতামত রাজ্য সরকারকে জানানোর কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'সকলে চাইছেন সমস্ত স্কুল খুলে যাক, সরকারও তা মানবেন সেটাই আশা করি।' এই মতামতের সপক্ষে করোনাকালে পড়াশোনার ক্ষতির উপর রাজ্যের পাঁচশ দশটি গ্রামে প্রায় কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রী কে নিয়ে সমীক্ষা করে 'লিভার ফাউন্ডেশন' এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থপনার মূল্যায়নকারী সংস্থা 'প্রথম'। এদের সমীক্ষায় উঠে আসে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন ও বুনিয়াদি শিক্ষার দুর্দশা। তাদের পর্যবেক্ষণানুযায়ী করোনার জেরে বিশ্বে টানা স্কুল বন্ধ রাখার নিরিখে একেবারে উপরের দিকেই রয়েছে ভারত। আবার তাতে অন্তত অনেক রাজ্যে যদি বা স্কুল পুরোদস্তুর খুলে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে তা হয়নি ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

হয়তো এসবেরই পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে ১৬ই ফেব্রুয়ারি বুধবার থেকে পুরোপুরি স্কুল খুলে দেওয়া হলো। স্কুল খোলার পর দেখা যাচ্ছে যে স্কুল বন্ধ থাকার সময়ে যে সমীক্ষা দেখে অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়কও উদ্বিগ্ন হন, প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণির ক্ষেত্রে সেই রিপোর্টের আশঙ্কাই সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে এবং সংখ্যা চেনার ক্ষেত্রেও তারা কতটা অপটু। ছোট হাতের এ,বি,সি,ডি থেকে যেকোনো বিষয়েই তারা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়েছে। শিক্ষকরা অনেকেই স্বীকার করছেন, এদের ক্ষেত্রে অনলাইন ক্লাসের কোনো প্রভাবই পড়েনি।

শিক্ষাব্যবস্থায় এতো ফাঁক সৃষ্টি হওয়ার পরও সংবাদ মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে, শিশু শ্রেণিতে টিকাকরণ না হওয়ার জন্য অভিভাবকরা অনেকেই উদ্বিগ্ন কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ স্কুলেই পড়ুয়াদের ৯০ শতাংশ উপস্থিতি সে কথা সমর্থন করে না। স্কুলে পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ততা, মিড-ডে মিলে অংশগ্রহণ, ক্লাস নেওয়ার উৎসাহ, শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাহচর্য এবং স্নেহের আশ্রয় পাওয়ার আর্তি, এ সবই যা এদের এতদিনের প্রাপ্য ছিল, তা যেন দু'হাত বাড়িয়ে, বুভুক্ষু দুমুঠোর মধ্যে একসঙ্গে পেতে চাইছে।

আমাদের সবার আশা, আর কখনও যেন কোনও অবস্থাতেই এ অন্ধকারের মধ্যে যেতে না হয়। আপাতত কিভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সে বিষয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রভাসপ্রসূন গিরি জানাচ্ছেন, 'পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মাস্কের প্রয়োজন নেই, পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সীদের মধ্যে যারা স্বচ্ছন্দে মাস্ক পরতে পারবে,তারাই পরবে, তবে খেলাধূলা বা অন্য কায়িক পরিশ্রমের সময় তা খুলে রাখতে হবে। তাঁর কথায়, সাধারণ পদ্ধতিতে হাত ধোওয়ার বিষয়টি বাচ্চাকে শেখাতে হবে। যে স্কুলবাস বা গাড়ি পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে তাকে নিয়মিত জীবানুনাশক দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে। জ্বর, সর্দির মতো কোনো উপসর্গ দেখা দিলে, বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানো উচিত হবে না। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।'

'ইনস্টিটিউট অব সাইকায়াট্রি'-র অধিকর্তা চিকিৎসক অমিত ভট্টাচার্যের কথায়, 'শিশুর স্কুলে যাওয়াটা অত্যন্ত জরুরি, স্কুলে গিয়ে মেলামেশার ফলে যেমন তাদের একাকিত্ব কাটবে তেমনই একটি বন্ধন তৈরি হবে। আবার বাড়িতে বাবামায়ের শাসনের বাইরে গিয়ে স্কুলে সকলের মাঝে স্বাধীন একটি জগৎ পাবে সে। এ সবের ফলে একটি শিশু যদি মানসিক ভাবে শক্তিশালী থাকে, তা হলে শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকতেও সুবিধা হবে।'

আর যেখানে পূজা পার্বণ, উৎসব বাড়ি, মল, দ্রষ্টব্য স্থানে, ভিড়ের মধ্যে গিয়েও তারা অসুবিধায় পড়ছে না, সেখানে কিছু সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অনুশাসন মেনে শিক্ষাঙ্গনে তাদের বেড়ে ওঠা, দেশ কাল নির্বিশেষে, যে কতটা প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুই বছরে, সাধারণ থেকে অতি সাধারণও, এ কথা হাড়েহাড়ে বুঝেছেন। অতএব আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের সুশাসনের মধ্যে বেঁধে নিয়ে উন্নত পরিষেবা পেতে ধৈর্যশীল থাকব। কোনও অশুভ শক্তিকে বিন্দুমাত্র সুযোগ দেব না, অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দিতে।

জীবন যতদিন থাকবে, থাকবে বহু নতুন রোগের আসা যাওয়া। তাকে নিয়েই চলতে হবে, ভয় না পেয়ে নিরাময়ের উপায় অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত কখনোই হতে দিতে পারি না, তা কোনো অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ শিক্ষার ক্ষতি হওয়ার অর্থ, সমগ্র মানবজাতির উন্নয়ন বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং বিশ্বের অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া।

সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরিক্ষার্থীরা ৭ই মার্চ থেকে সশরীরে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে পারলেন। আশা রাখি শুভ বুদ্ধি নিয়ে, শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় আমরা সবাই সংঘবদ্ধ থাকব। কারণ শিক্ষা নানাভাবে আক্রান্ত। ইতিমধ্যে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ ঘোষণা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। BIJU's প্রভৃতি কর্পোরেট সংস্থা ও Tutopia প্রমুখ Learning Apps শিক্ষাক্ষেত্রে আধিপত্যের দিকে এগোচ্ছে। রাজ্যে এপ্রিলের শেষে তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে স্কুলগুলিকে সকালে এগিয়ে নিয়ে আসার পরও হঠাৎ করে ২ মে থেকে শিক্ষাক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া পুনরায় অসন্তোষের জন্ম দিয়েছিল যেখানে ৩০ এপ্রিল থেকে রাজ্যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থা কী সত্যিই চেতনা জাগাতে পারছে এই প্রজন্মের মধ্যে

বরুণ দাস

মধ্য সত্তরে আমাদের কৈশোর ও যৌবনে শোনা বা উচ্চারিত একটা শ্লোগান এখনও ঠিক মনে পড়ে। অনেকেরই হয়তো-বা স্মরণে আছে। কী সেই শ্লোগান? 'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে মুক্তি।' তখনও ডিজিটাল যুগের প্রবর্তন হয়নি। দৃষ্টিনন্দন ফ্লেক্স-এর অতি-ব্যবহারও শুরু হয়নি। এমন কি, হোর্ডিংও তেমন একটা চোখে পড়ত না। ব্যানার-পোস্টার কিম্বা দেওয়ালই ছিল যাবতীয় শ্লোগান লেখার একমাত্র স্থান। তো যেকোনও রাজনৈতিক শ্লোগানই তখন দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হতো। লাল কিম্বা/ও কালো কালি দিয়ে।

যে বহুশ্রুত শ্লোগানটিকে কেন্দ্র করে এই নিবন্ধের শুরু, সে শ্লোগানটি ছিল কার্যতঃ বামপন্থীদের। যদিও অতি-বামপন্থীরা আবার প্রথাগত শিক্ষার বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। সাতষট্টির কৃষিবিপ্লব বা নকশাল আন্দোলনের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আঘাত হেনেছিলেন অতি-বামপন্থীরা। ভাঙচুর কিম্বা অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রথাগত শিক্ষাকে আঘাত হানতে তাঁরা মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। খুন হয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-মনীষীরাও। মুন্ডু ভাঙা হয়েছে বিদ্যাসাগরের মূর্তিরও। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে নেমে এসেছিল নৈরাশ্য।

বলাবাহুল্য, এখন আর কৈশোর ও যৌবনে শোনা শিক্ষা সংক্রান্ত দেওয়াল-রঞ্জিত বহুদৃষ্ট ওই জনপ্রিয় শ্লোগানটি বিশেষ একটা শোনা যায় না বা ফ্লেক্স-ফেস্টুন-ব্যানারে দেখা যায় না। তার মানে কী শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে আমাদের মধ্যে কাঙ্খিত 'চেতনা' এসেছে এবং সেই চেতনার উজ্জ্বল আলোয় 'বিপ্লব' ছুটে এসে আমাদের মুক্তি ঘটিয়েছে? বাস্তব কিন্তু তা বলে না। তাহলে কী শিক্ষার কোনও 'অগ্রগতি'ই ঘটেনি এই সময়ে? মতবাদ নির্বিশেষে দেশের শাসকবর্গ উচ্চকিত স্বরে বলবেন, শিক্ষার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' করছেন এই কলাম-লেখক।

আসলে এ দেশে, এ রাজ্যে রাজনৈতিক ঝান্ডা নির্বিশেষে সত্যের সপক্ষে কিছু উচ্চারণ করলেই তাকে সরাসরি সরকার-বিরোধী তকমা সেঁটে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সরকারি সুরে সুর মেলাতে না পারলেই আপনাকে ষড়যন্ত্র কিম্বা চক্রান্ত করার মিথ্যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে। এ প্রবণতা আগেও ছিল, এখন অবশ্য অনেকটা বেড়েছে। ডান-বাম-ডান সব আমলেই নিরপেক্ষতার পরিসর ক্রমশঃ সংকুচিত করা হচ্ছে। সঠিক কথা উচ্চারণ করলেই বিপদ। যদিও অনেক সময় আরটিআই করলে সঠিক তথ্য এখন হাতের মুঠোয়।

তবে এটাও বাস্তব, আরটিআই (রাইট টু ইনফর্মেশন) করলেই যে আপনি সবসময় সব বিষয়ে সব তথ্য পেয়ে যাবেন এমনটাও অবশ্য নয়। সরকার অনেক সময়ই 'তথ্য নেই' বলে এড়িয়ে যান। কিম্বা 'রাষ্ট্রের গোপনীয়তার স্বার্থে'র অজুহাত দেখিয়েও তা লুকিয়ে রাখেন। যাতে তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ্যে না আসে। ইদানিংকালে অনেক ক্ষেত্রেই এমন অনাকাঙ্খিত প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমন কি, মহামান্য শীর্ষ আদালতের কাছেও কেন্দ্রের মহামান্য সরকার বাহাদুর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লুকোচ্ছেন। 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তাজনিত গোপনীয়তার স্বার্থে'র কথা বলে।

যে 'জনদরদী' বামপন্থীরা এক সময় শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের আমলেও শিক্ষার অবস্থা বা মান তেমন উৎসাহব্যঞ্জক ছিল কী? এর উত্তর একটাই—না। একথা বললেই তাঁরা হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল বলে রে রে করে তেড়ে আসবেন। একথা ঠিক যে, তাঁদের আমলে শিক্ষকদের বেতন একটা সম্মানজনক অবস্থায় এসেছে। বিয়ের আসরে পাত্র হিসেবে তাঁরা আর অচ্ছুৎ নন। বরং পাত্রীর পরিবারের কাছে বেশ কাঙ্খিতও। এটা নিঃসন্দেহে বাম আমলের অবদান। কিন্তু শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে তাঁরা কোনওরকম নজরই দেননি।

এগুলো কিন্তু কুৎসা নয়। বাস্তব ঘটনা। নজর দিয়েছেন কেবল শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে। দলীয় রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাড়ে সর্বনাশ ঘটিয়েছেন। যার (কু) ফল এখন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের পোতা বিষবৃক্ষের ফল গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমান সরকারও পুরনো জুতোতেই পা গলিয়ে চলেছেন। 'বামাদর্শ'কে সামনে রেখেই 'পরিবর্তনের সরকার' রাজ্যের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতির নির্ভরযোগ্য আখড়া গড়ে তুলেছেন।

নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন, শিক্ষা সংক্রান্ত যে শ্লোগানটি একসময় বামপন্থীরা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, সরকারে এসে বুঝতে পারলেন, তাঁদের চিন্তাধারায় কোথাও যেন একটা 'ভুল' হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা সম্ভবতঃ এটাও বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষাকে বাড়তি গুরুত্ব দিলে বিপদ ডেকে আনা হবে। রাজনৈতিক চেতনা নয়, তাঁদের চাই আসলে 'দলীয় চেতনা'। শিক্ষার বিকাশ বা প্রসার হলে মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন রাজনৈতিক চেতনা বাড়বে, অন্যদিকে দলীয় চেতনার অবসান হবে। যা কোনও ভাবেই বুর্জোয়া সংসদীয় পথে চলা বামপন্থীদের কাম্য নয়।

আচ্ছা বলুন তো, নিজেদের বিপদ কে-ই বা ডেকে আনতে চান? তার চেয়ে বেতন বাড়িয়ে ও সুবিধাজনক ট্রান্সফার ও পোস্টিং এর ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের দলের প্রতি 'আস্থাভাজন' করাতে পারলে দলীয় গন্ডির মধ্যেই তাঁদেরকে বেঁধে রাখা তো যাবে। দলের অনুগত হয়ে থাকবেন তাঁরা। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই তাঁদেরকে নিজেদের দিকে টেনে রাখবে। সুতরাং প্রয়োজনীয় পঠন-পাঠন তথা গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বা পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে বাড়িয়ে লাভ কী? শিক্ষকেরা দলীয় আনুগত্য হারালে আর রইলো কী? অতএব সচেতনভাবেই শিক্ষার পরিকাঠামোর দিকটি অবহেলিত রয়ে যায়।

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ২০১১-তে ঝান্ডার রঙ বদল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। অন্যদিকে দিল্লী তথা কেন্দ্রেও ঝান্ডার রঙ বদল হয়েছে। রাজ্যে ঘাসফুল আর কেন্দ্রে পদ্মফুল বিকশিত হয়েছে। 'গণতান্ত্রিক' পথেই। দেশের মানুষই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এই রদ-বদল ঘটিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কী কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে? এর উত্তর একটাই না। কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই ঘটেনি রাজ্য কিম্বা কেন্দ্রে। বরং আগের থেকেও পরিস্থিতির অবনমন ঘটেছে। দলীয় রাজনীতির আগ্রাসী থাবায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিপন্ন।

একদম পরিবর্তন যে করেননি তা বলা যাবে না। ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে গৈরিকীকরণ চলছে। আর ২০১১তে তৃণমূল সরকার আসার পর রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অপরাধ, হিংসা, অরাজকতা, স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। আর দুই সরকারই শিক্ষাকে অবহেলার ও বেসরকারিকরণের সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছেন।

দিল্লীর কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় জেএনইউ কিম্বা বাংলার বিশ্বভারতীকে নিয়ে যাঁরা শোরগোল তোলেন, তাঁদের সে শোরগোল তোলার ন্যায্য অধিকার অবশ্যই আছে। দলীয় রাজনীতির উগ্র ও নগ্ন চেহারা সেখানে প্রকাশ্যে এসেছে। যা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। কিন্তু রাজ্য কী ওসব রাজনৈতিক নোংরামি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পেরেছে? না, একেবারেই নয়। রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়—সর্বত্রই দলীয় রাজনীতির অপখেলা চলেছে। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতের বারংবার হস্তক্ষেপই তার প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হলো, ঝান্ডার রঙ আলাদা হলেও শিক্ষাকে নিয়ে সব শাসকদলের চিন্তাভাবনায় কেন এই অন্তর্গত মিল বা সাযুজ্য? একথার উত্তরে ফিরে আসতে হয় আবারও ওই পুরনো শ্লোগানে—'শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব, বিপ্লব আনে মুক্তি।' সুতরাং চেতনাকে আঘাত হানতে গেলে সবার আগে শিক্ষাক্ষেত্রেই আঘাত হানতে হবে। যাতে উপযুক্ত শিক্ষায় কেউ আর শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারেন। শিক্ষার হাত ধরে কোনওভাবেই তরুণ-তুর্কি ছাত্রসমাজের চেতনার উদয় না ঘটতে পারে। তাই চেতনার জাগরণ বন্ধ করো।

কারণ আমরা কমবেশি সবাই জানি, 'চেতনা বিপ্লব আনে আর বিপ্লব আনে মুক্তি।' কোন শাসক কোন কালে শাসিত বা প্রজাদের মাথায় বিপ্লবের আগুন জ্বালাতে সাহায্য করেছে? শাসন ও শোষণের বন্দিশালা থেকে প্রজাকূলকে মুক্তি দিতে আগ্রহ দেখিয়েছে? কিম্বা প্রজাকূলকে 'আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে' গাইতে উদ্বুদ্ধ করেছে? আসলে ঝান্ডার রঙ যাই হোক না কেন, সব শাসকেরই প্রায় এক রা। হয়তো প্রজা নিপীড়নের পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। যুগ বদলায়। শাসন ও শোষণের ধরন বা রূপরেখাও কিছুটা বদলায় কিনা।

রাজ্যের প্রজাকূলকে কড়া শাসন বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে আনতে গেলে যে নিজেদেরই বিপদ। 'পাগলেও নিজের ভালোটুকু বোঝে' বলে একটা পুরনো প্রবাদ-বাক্য আছে। এটা কী আকাশ থেকে পড়েছে? জীবনের সামগ্রিক চালচিত্রকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল এসব। সেদিক থেকে বলা যেতেই পারে যে, শাসকদল যে রাজনৈতিক মতবাদেই বিশ্বাসী হন না কেন, তারা তো আর পাগল নন। যে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়োল মারবেন? গোদা বাংলায়

বলা যায়, যাঁরা অন্যদের পায়ে কুড়োল মারতেই অভ্যস্থ, তাঁরা কেন নিজেদের পায়ে কুড়োল মারবেন?

কিন্তু সেকথা তো আর প্রকাশ্যে বলা যায় না। তাই একটা আড়াল-আবডাল রাখতেই হয়। আমরা 'সর্বশিক্ষা অভিযান' বলে প্রচার চালাই। প্রতিটি স্কুলের গায়ে কথাগুলো লিখে দিই। যদিও 'সাক্ষরতা'র নজির হিসেবে শুধুমাত্র সাক্ষর করার ক্ষমতাকেই বুঝি। তা ফলাও করে প্রচারও করি। কোন জেলায় কত মানুষ 'সাক্ষর' হলেন (শুধু সাক্ষর করার ক্ষমতাটুকু অর্জন)-তা নিয়ে গলার শিরা উঁচু করে বক্তব্য রাখি। কিন্তু চেতনার উন্মোচন হোক—তা কখনও চাই না। তাই শিক্ষা থেকে নাগরিক সমাজকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার কুশলী প্রয়াস নিই।

যারা ভাবছেন এগুলো শুধু কথার কথা, সরকারের প্রয়াসকে অহেতুক সমালোচনা করার অপচেষ্টা মাত্র, তাঁরা একবার সরকারি পরিসংখ্যানের দিকেই না-হয় ফিরে তাকান। তাহলেই দেখতে পাবেন, ওপরের কথাগুলো নিছক কথার কথা—নাকি এর সঙ্গে বাস্তব চিত্রের কোনও মিল আছে? এখন তো আর সরকারি তথ্যের জন্য আপনাকে হয়রান হওয়ার প্রশ্ন নেই। নেট-যুগে হাতের কাছেই সব তথ্যভান্ডার মজুত আছে। একবার মুঠোভাষের ছোট্টো স্ক্রিনে টাচ করলেই বিশ্বের সবকিছুই আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠার জন্য অধীর অপেক্ষায়।

কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে কতোটা ব্যয়-বরাদ্দ? আর রাজ্যের বাজেটেই বা কতোটা ব্যয়-বরাদ্দ শিক্ষার জন্য—তা একবার দেখে নেওয়া যাক, তাহলেই গোটা বিষয়টা স্পষ্ট হবে আমাদের কাছে। মিথ্যে বা অপপ্রচার বলে দেগে দেওয়ার কোনও অবকাশই পাবেন না সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। না, কোনও গালগল্প নয়, সরকারি পরিসংখ্যানই বলছে, চলতি আর্থিক বছরে কেন্দ্রিয় সরকার শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন বাজেটের মোট অঙ্কের কতো শতাংশ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশের ১৩৯ কোটির জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেখে অবাক হতে হয়।

২০২১-২০২২ আর্থিক বছরের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় সরকারের টাকার অংকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ৯৩,২২৪ কোটি। এর মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতার জন্য ৫৪,৮৭৩ কোটি আর উচ্চশিক্ষার জন্য ৩৮,৩৫০ কোটি টাকা। জিডিপি (গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট)-র মাত্র ৩.৫ শতাংশ। যদিও ১৯৬৮-র ন্যাশনাল পলিসি অনুযায়ী প্রতি বছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমান হওয়ার কথা ৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, (OECD) -র সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, একমাত্র নরওয়ে শিক্ষাখাতে ব্যয় করে ৬.৭ শতাংশ। চিন ৪ এবং রাশিয়া ৩.৪ শতাংশ।

এবার আসা যাক এ-রাজ্যের শিক্ষাখাতে ব্যয়-বরাদ্দের হিসেবে-যাঁরা সবসময় কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে থাকেন তাদের কথায়। শিক্ষার বাজেট বরাদ্দ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপন্নের ২.৫ শতাংশ মাত্র। শিক্ষাখাতে এতো কম বরাদ্দ ভাবতেই পারা যায় না। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, ঝান্ডার রঙ যাই হোক না কেন, কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য, কোনও সরকারই চান না যে, দেশের নাগরিকেরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু পান। শিক্ষার সুযোগ পেলে তাঁরা যদি নিজেদের অধিকার বোধে সচেতন হয়ে ওঠেন তাহলেই বিপদ। কিছুতেই তাঁদেরকে আর বাগে রাখা যাবে না।

এটা যে একদম পারা যায় না তাও নয়। আসলে সদিচ্ছার অভাব। দিল্লী সরকার শিক্ষা কাঠামোর খোলনলচে পাল্টিয়ে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে (১৫,৮১৫ কোটি টাকা, বাজেটের ২৩%, ২০২০-'২১) দিল্লীর শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিয়েছেন।

'শিক্ষার অধিকার' আইন পাশ হয়েছে ২০০৯-এ। মহামান্য শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২০১২-র ১২ এপ্রিল তা সারা দেশে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু এই অধিকার দেশের সব প্রান্তের পড়ুয়া শিশু-কিশোররা পাচ্ছে কিনা- তা দেখার জন্য কোনও উদ্যোগ বা ব্যবস্থা নেই। ফলে আইন থাকলেও তা কার্যকরি করার ব্যাপারে অনীহা গোটা দেশেই। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে শাসকশ্রেণি তথা কেন্দ্র কিম্বা রাজ্য - সব সরকার বাহাদুরের অভিপ্রায় নিয়েই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগাটা স্বাভাবিক।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে দায়িত্ব সরিয়ে নিতে তৎপর সরকার

অনুপম কাঞ্জিলাল

দু'বছরের বেশি সময় ধরে করোনা অতিমারীর ভয়াবহ প্রকোপ এদেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর জঞ্জালসার চেহারাটা সামনে এনে দিয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে যতই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বের সঙ্গে একাত্ব করে দেখার চেষ্টা করা হোক না কেন, আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মাথায় বসে থাকা কর্তা-কত্রীরা বুঝিয়ে দিতে কসুর করছেন না—এ দায়িত্বের ভার তাঁরা আর বেশি দিন বহন করবেন না। সেই লক্ষ্যেই— তো কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বীমার অন্তর্ভুক্ত করে তোলার প্রয়াস শুরু করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বার বার চিকিৎসকদের একাংশের দাবিকে উপেক্ষা করে, গণস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো নির্মাণের বিষয়ে উদাসীনতা বজায় রাখাকেই শ্রেয় বিবেচনা করছেন। একই রকম প্রয়াসে মেতেছে রাজ্য সরকারও, স্বাস্থ্যসাথীর নামে তারাও স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বীমার আওতাভুক্ত করে বিনামূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে মুছে দিতে তৎপর।

মজার বিষয় হল, যেভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সরকার তার দায়িত্ব সরিয়ে নিতে চাইছে সেটাকেই আবার খুব কৌশলে জনকল্যাণকর সরকারি প্রকল্প বলে জনসমাজে প্রচার করে চলেছে। ভাবখানা এমন যেন সরকার মানুষের জন্য ভাবিত হয়ে স্বাস্থ্যপরিষেবায়

বীমাকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসলে যে এর ফলে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাবে, এবং বীমা কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রণ করবে স্বাস্থ্য পরিষেবা। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে 'আয়ুষ্মান ভারত' অথবা এ রাজ্যের ক্ষেত্রে 'স্বাস্থ্যসাথী' বীমা প্রকল্পের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা অবহেলার দিকেই মানুষকে এগিয়ে দেবে, এখানে কোন অস্পষ্টতার জায়গা নেই। মুশকিল হল, এই বিপদটা সম্পর্কে এখনও ততটা সচেতন হতে পারি নি আমরা। জনহিতের নামে যে ঘুরপথে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া জোর কদমে চলছে সাধারণ জনমানসে তার ছবি এখনও অস্পষ্ট। চিকিৎসকদের একটা অংশ এর বিরুদ্ধে বলছেন বটে, তবে যে সংগঠিত ও সার্বিক বিরুদ্ধাচরণের দরকার ছিল, তা এখনও দেখা যাচ্ছে না। এ রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প নিয়ে তো একাধিক চিকিৎসক সংগঠন ও ব্যক্তি চিকিৎসকও, যারা স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারের দায়িত্ব নিয়ে বরাবর বলে এসেছেন এবং এখনও বলছেন, তাদের মধ্যেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ ভাবছেন এর ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার একটা সুরাহা হল, আবার কেউ বলছেন, না এর ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিনামূল্যের বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই রাজ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে যে অরাজক অবস্থা তৈরি হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন হাসপাতালে সরকার কোটি কোটি টাকা বাকি রাখায়, প্রতিদিন রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, তাতে পরিষ্কার স্বাস্থ্যসাথী দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে প্রতিবাদী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং নাগরিকদের আরও সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার, তা না করতে পারলে, সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেবার যে কৌশল নিয়েছে, তা মসৃণ হয়ে যাবে।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের শর্ত থেকে স্বাস্থ্যকে পণ্য করে তোলার রাষ্ট্রীয় আয়োজনের বিরোধিতা করা দরকার।

স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারত নয় ভারতের মত একটা গরীব দেশে সরকারকে সব মানুষের চিকিৎসার ভার বিনা খরচে বহন করতে হবে, এই দাবি থেকে সরে আসার অর্থ সরকারকে স্বাস্থ্য-পরিষেবা থেকে হাত গুটিয়ে নেবার সুযোগ করে দেওয়া। বেসরকারি হাসপাতাল থাকবে কেউ কেউ তাদের অগাধ অর্থের জোরে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনবেও। কিন্তু তাতেও সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার দাবিকে মরচে পড়তে দেওয়া যায় না। জনস্বাস্থ্য বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি বার বার উঠেছে, এদেশের বিবেকবান চিকিৎসকরা এবং একাধিক চিকিৎসক সংগঠন সেই দাবি জানিয়ে এলেও এই করোনা কবলিত সময়কালে, যখন গোটা দেশের মানুষের কাছে প্রবল সংকট, সেই সময় কালেও জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে নতুন কোন ভাবনাকে আমল দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের এই ভাবনাই প্রমাণ করে তুমুল গণ-সচেতনতা ও প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন ছাড়া এদেশের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনমুখি করা সম্ভব নয়। একই রাস্তায় হাঁটছে রাজ্য সরকারও। ভেবে দেখুন যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডকে মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকারের অনুদান বলে প্রচার করা হয়ছিল, এখন যে কোন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হচ্ছে যাদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, তাদের সরকারি হাসপাতালে গেলে কার্ড করিয়ে দেওয়া হবে। এখান থেকে এই প্রশ্নটা তো স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে, কেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করার বিষয়ে সরকারের এত আগ্রহ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে রয়েছে, সরকারের আসল উদ্দেশ্য। সরকার বিনামূল্যে চিকিৎসার যে ভাবনা সেটাকে বাতিল করে দিতে চাইছে। এ রাজ্যের একাধিক চিকিৎসক সংগঠন বিরোধিতায় নেমেছে—মানুষকে এর বিরুদ্ধে পথে নামতে হবে, গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ। যদি সার্বিক বিরোধিতা না করা যায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় দায় থেকে সরকার পুরোপুরি হাত গুটিয়ে নেবে, এটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

একই কথা বলা চলে শিক্ষা প্রসঙ্গেও। করোনার ভয়াবহ প্রভাব কোন ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি, এই প্রশ্ন করলে তবে যে কেউই সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই বলে দেবে শিক্ষাক্ষেত্র। প্রায় দু'বছরের বেশি সময় শিক্ষাক্ষেত্রকে শুধু বন্ধ করে রাখা হয়েছিল তাই নয়, এই সময় কালের মধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ভাবনা কিভাবে নিয়ে আসা যায় তার নীল নকশাও তৈরি করে ফেলা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে একদিকে যেমন হিন্দুত্ববাদের প্রসার ঘটানোর প্রক্রিয়া চলছে, অন্যদিকে তেমনি, অন-লাইন ও অ্যাপ নির্ভর শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে একটা বড় অংশকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে চিরদিনের মতো ছেঁটে ফেলার প্রয়াসও শুরু হয়ে গেছে।

এ রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রের হালটা যে কতটা বেহাল, তা গত দেড় বছরে শিক্ষা দফতরের সামনে চলতে থাকা—অনশন ও ধর্না-মঞ্চের উপস্থিতি দেখেই বোঝা যায়। এক দিকে রাজ্যে অসংখ্য স্কুল শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে—আর অন্যদিকে চাকরির দাবিতে এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশ করে আসা হবু শিক্ষকরা অনশন করছেন—কখনো বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন এমন দৃশ্যও আমরা দেখেছি। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে শিক্ষতার যোগ্যতার উত্তীর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে, আর তারই মধ্যে সম্প্রতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, সরকার এবার থেকে চুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করবে, সেই নিয়োগের দায়িত্বও সরকার এনজিওগুলিকে দেবে। এক বছরের জন্য শিক্ষক নিয়োগ হবে। না, আমি একটুও বানানো কথা বলছি না। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরে সরকারি মাদ্রাসার জন্য এনজিও সংস্থাকে চুক্তি ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে রাজ্য সরকার। এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তিও বের করা হয়ে গেছে। অনেকেই বলছেন—সরকারি মাদ্রাসা দিয়ে শুরু হল, এটা এবার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। এ রাজ্যের সরকারি স্কুল গুলোর যা অবস্থা যেকোন দিন সেগুলো বন্ধ করে

দেবে সরকার—অথবা এখানে নতুন করে বেসরকারি উদ্যোগ ডেকে নেওয়া হবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সরকারি পরিষেবাকে বন্ধ করা বা সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ নিয়ে আসার জন্য, সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোকে রুগ্ন করে ফেলা হয়। সেই রুগ্নতার সরকারি কর্মচারীদের অদক্ষতা কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয়, সাধারণ মানুষের কাছে বেসরকারীকরণের যুক্তি এভাবেই গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে বার বার। এবার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে।

এখানে সবচেয়ে লক্ষ্য করার মত বিষয় হল রাজ্য ও কেন্দ্র দুটো আলাদা দলের শাসন। নিয়ম মাফিক তারা পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নীতি নিয়ে খোঁচাও দেয়। অথচ দু'দলেরই ভাবনা শেষ বিচারে এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়। ভেবে দেখুন কেন্দ্রীয় সরকারের 'আয়ুষ্মান ভারত' ও রাজ্য সরকারের 'স্বাস্থ্য সাথী' শেষ পর্যন্ত একই লক্ষ্যে ধাবিত। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির মধ্যে যে বেসরকারিকরণের উদ্যোগ, রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই---এনজিও মারফত চুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। তাই এদের লড়াইটা শুধু ভোটের লক্ষ্যে, আর মানুষদের লড়তে হবে, তার জীবনের স্বার্থে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বেঁচে থাকার অপরিহার্য অবলম্বন। তাকে হাত ছাড়া করা মানে অর্থহীন জীবন যাপন, তাই লড়াইটা জীবনের মানে খোঁজার লড়াই।

দুর্নীতির গ্রাসে রাজ্যের শিক্ষা

হরিবাসর বাগদি

স্কুল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল হয়েও শিক্ষিত যুবক যুবতীরা চাকরি না পেয়ে কলকাতা মহানগরীর ময়দানে গান্ধী মূর্তির নীচে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন দীর্ঘদিন। মেরিট লিস্টে থেকেও তাঁদের চাকরি মেলে নি, অথচ লিস্টে না থেকেও চাকরি করছেন অন্যরা। এই অভিযোগ থেকে তাঁদের বিক্ষোভ অবস্থান।

রাজনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সামগ্রিক এক অবক্ষয়ের চিত্র বিরাজমান। শিক্ষাক্ষেত্রও তার থেকে বাদ যায় কিভাবে? বিশৃঙ্খলা অরাজকতায় পুরুষতন্ত্রের কদর্য রূপ সমাজকে গ্রাস করেছে। পেশীতন্ত্র ও বেহিসেবি অর্থের যুগলবন্দিতে দলতন্ত্র শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সহজ সরল শান্ত জনজীবন রাজনীতির কুটিল ও জটিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান। শিক্ষাক্ষেত্রেও অধোগমন সমাজজীবনের সামগ্রিক চালচিত্রে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। দলতন্ত্রের ঘেরাটোপে বন্দি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থাও। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে শিক্ষাতে দলতন্ত্র যেভাবে শিকড় ছড়িয়েছিল 'পরিবর্তনের সরকারে'র ক্ষমতায় উপর্যুপরি তিন তিনবার অধিষ্ঠিত হওয়ায় দলতন্ত্রের শিকড় শিক্ষাকেও কুক্ষিগত করে ফেলেছে। দলতন্ত্র যেহেতু স্বজনপোষণ ও অন্যকে শোষণ করে ফলে দুর্নীতি এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমাজজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি টাকার জোরে যা কিছু করে নিতে পারে কিন্তু যে যুবকের পিতামাতা দু'বেলা খাবার সংস্থানও না রেখে পুত্র বা কন্যাকে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দলতন্ত্রের খপ্পরে পড়ে যান তাঁদেরকে দেখবে কে? সরকার, দল, অসরকারি সংস্থা?—না তাঁদের দেখার কেউ নেই। উৎকোচ না দিয়ে শিক্ষিত যুবক যুবতীর শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। এটি কেবল স্কুল সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। উচ্চশিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। তা সে বিশ্ববিদ্যালয়ের, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যে কোন পদের ক্ষেত্রে এমন কি পাবলিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। গণমাধ্যমে এসব দুর্নীতির যেটুকু প্রকাশ পায় তা হিমশৈলের চূড়াটুকু মাত্র!

শিশু কোলে আন্দোলনরত শিক্ষক প্রার্থী

বিদ্যার সিন্ধু সেঁচে মুক্ত মিলবে না। এই আলোচনা অবশ্য সীমাবদ্ধ থাকছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে ও নিয়মের ক্ষেত্রে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগে ২০২২-এর মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই উচ্চ আদালতে মামলার রায়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলে রাজ্যজুড়ে হইচই পড়ে যায়। এমন কি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় দুর্নীতি যে সময়ে ঘটেছিল সেই সময়কার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও হেফাজতে নিয়ে জেরা করা যেতে পারে তাঁর রায়ে বলেছিলেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে চার সপ্তাহ শ্রী চট্টোপাধ্যায় এক রায়ে স্থগিতাদেশ পেয়েছিলেন। এর আগে অবশ্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতির মামলাতেও শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তৎকালীন স্কুল সার্ভিস কমিনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মণ্ডলকে বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। অধ্যাপক মণ্ডলের অপরাধ ছিল যোগ্যতামানে অনুত্তীর্ণদের চাকরিতে নিয়োগ দিতে আপস না করা। অধ্যাপক মণ্ডল সরাসরি পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বলেছিলেন যে কোন প্রার্থী (দল মনোনীত) যোগ্যতামানে (সেই সময় শিক্ষাগত যোগত্য, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিকে যে বা যাঁরা ৫০ নম্বর পেয়েছেন) পৌঁছেছে এমন যে কোন প্রার্থীকে তিনি চাকরিতে সুপারিশ করবেন।

দলের নেতারা এই জন্য তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কেন না তাঁরা বহু প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। যদিও যোগত্যামানে অনুত্তীর্ণ কোন প্রার্থীই চাকরি পেতে নেতাদের টাকা দিয়েছেন কবুল করেননি। কবুল করার কথাও না। কিন্তু বিষয়টি গোপন হলেও সবার জানা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ওপেন সিক্রেট'। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এও দেখা যেতে পারে যে মেরিট লিস্টে থাকা (যাঁদের চাকরি পাওয়া ন্যায় সঙ্গত) প্রার্থীদেরও উৎকোচ দেওয়ার বিনিময়েই চাকরি মিলছে। গল্পের গরু গাছে ওঠে এইরকম প্রবাদ আছে। সেইরকম গল্প হলো—প্রাথমিকে চাকরি পেতে গেলে নেতারা বা তাঁদের নজরদারিতে গড়ে ওঠা চক্রের দাবিতে ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা প্রত্যাশী প্রার্থীকে দিতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পেতে হলে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রত্যাশীকে এবং মহাবিদ্যালয়ে চাকরি পেতে ৫০ লক্ষাধিক টাকা দিতে হবে। এসব কথা কোনও প্রত্যাশী, প্রত্যাশীর শুভার্থী নেতাদের মুখে শোনা যাবে না। কিন্তু কথা হাওয়ায় ভাসে, যা ভাসছেও।

আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মী

যাঁরা অর্থের বিনিময়ে চাকরি পেলেন তাঁদের মাইনে থেকে টাকাটা উশুল করতে পাঁচ থেকে ছয় বা সাত বছর লেগে যেতে পারে। এইসময়ে বা ভবিষ্যতে তাঁদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ শিক্ষাদান সম্ভব? যেমন সম্ভব নয় এই মহানগরীর যাদবপুরে অবস্থিত কৃষ্ণ প্রদীপ চৌধুরী (কেপিসি) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রী যে বা যাঁরা ৫০ লক্ষ বা এক কোটি টাকার বিনিময়ে ডাক্তার হয়ে উঠছেন—তাঁদের পক্ষে সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব? কারণ তাঁরা তাঁদের পরিবার যে টাকা লগ্নি করে একজন চিকিৎসক তৈরি করলেন তাঁরা কি চাইবেন তাঁদের পুত্রকন্যারা কম পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন? অন্যান্য প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে শোনা যায় আরও বেশি টাকা ক্যাপিটেশন ফি দিতে হয়।

এতো গেল মুদ্রার একপিঠের গল্প। অন্য পিঠের গল্পও আছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন)-র নির্দেশিকা তৈরি হয়ে আছে যে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী না হলেও যে সমস্ত শিক্ষকপদ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে খালি আছে তা অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। কোন রাজ্য কি তা মানবে বা মানছে? এমন কি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তা কি মানা হচ্ছে? নতুন শিক্ষানীতিতে রাষ্ট্র তার দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। শিক্ষাকেও পণ্য করার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। প্রতিষ্ঠানকে স্বোপার্জিত পথেই চলতে হবে এরকমই নিদান দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাইনে/বেতন প্রতিষ্ঠানকেই সংস্থান করতে হবে। শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সব আয়োজন শেষ হয়েছে। শিক্ষার বেসরকারিকরণ হলে তা আর সার্বজনীন থাকছে না। যাঁর/যাঁদের অর্থ আছে তাঁরাই শিক্ষার সুযোগ পাবেন। অবশ্য আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ধনী, উচ্চমধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও কতিপয় মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানসন্ততিরই সুযোগ মেলে। নিম্নবর্গ ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কাছে উচ্চশিক্ষা আজও অধরা।

বর্তমান সময়ে শিক্ষায় দুর্নীতি এই রাজ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যদিও এই রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসককুল শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অন্যান্য দুর্নীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ভুল স্বীকার না করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে সংঘটিত দুর্নীতির তুলনা টানেন। বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষায় দুর্নীতির তুলনা তাঁরা করছেন না। যদিও বাম জমানার শেষে প্রাথমিকে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি সামনে চলে এসেছিল। আদালতের রায়ে জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিকে চাকরি প্রার্থীদের লিস্ট বামফ্রন্ট সরকার বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। পরিবর্তনের সরকারের জমানায় দুর্নীতি ছড়িয়েছে শিক্ষাকর্মী (গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি) নিয়োগ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও। যার ফলে প্যানেলে থেকেও যে সব শিক্ষাকর্মী/ শিক্ষক মেরিট লিস্ট অনুযায়ী চাকরি পান নি তাঁরাই জনস্বার্থ মামলা করেছেন সিবিআই চেয়ে দুর্নীতি উদ্ঘাটনে।

আগে শিক্ষক নিয়োগে রিজিওনাল লেভেল সিলেকশন টেস্ট বা আরএলএসটি দ্বারা পরীক্ষা সংগঠিত হতো। পরে নিয়ম পরিবর্তন করে তৈরি হল স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট বা এসএলএসটি। সাম্প্রতিক এসএলএসটি-র মাধ্যমে তৈরি হওয়া শিক্ষক নিয়োগের যে প্যানেল বর্তমান সেটিই বিশেষভাবে চর্চিত এবং এতে যাঁরা যুক্ত তাঁদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ। এস এল এস টি দুর্নীতির সঙ্গে গোচরে আসে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দুর্নীতি। স্মর্তব্য এসএলএসটি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশের পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি কর্মচারি নিয়োগ সংক্রান্ত মেধা তালিকা। চাকরি প্রার্থীরা শুরু থেকেই নানান অভিযোগ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই সময় এসএসসি চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রী সুবীরেশ ভট্টাচার্য। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সিনেট ও সিণ্ডিকেট বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডিলিট দেওয়ার পক্ষে প্রস্তাব করেন যা শ্রী দীপক কর সমর্থন করলে মিটিং-এ তা পাশও হয়ে যায়। মমতা সেই বছর (২০১৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে ডিলিট ডিগ্রিও

পান যা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে। অথচ কনভোকেশন হওয়ার কথা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই। উপাচার্য সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি কবি ও সম্পাদক নীরেন চক্রবর্তীর মেয়ে হিসাবে ও আমলা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী হওয়ার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট অন্য প্রার্থীদের তুলনায় খারাপ থাকা সত্ত্বেও) প্রথা ভেঙে নজরুল মঞ্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন অনুষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার পর সুবীরেশ পুরস্কার পান উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে এবং দীপক কর পুরস্কৃত হন পুরুলিয়ার সিধো কানহু বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ পেয়ে। এছাড়া সুবীরেশ ছিলেন এসএসসি চেয়ারম্যান ও দীপক কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান (যে পদে তিনি এখনও বহাল আছেন)। তিনি গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি নিয়োগ সংক্রান্ত প্যানেলের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং প্যানেলের স্বচ্ছতার পক্ষেই সওয়ালও করেছিলেন। এসএসসি থেকে প্রত্যাশী প্রার্থীরা সমস্যা সমাধানে কোন সুরাহা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন অর্থাৎ তাঁরা উচ্চ আদালতে আবেদন করেন।

উচ্চ আদালতের (হাইকোর্ট) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যালয়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে পরপর কয়েকটি যুগান্তকারী রায় দেন। এই রায় দানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের শাসক দলের উকিলেরা (অ্যাডভোকেট) তাঁকে লাঞ্ছনাও করেন—বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রশ্নে যা গর্হিত অপরাধ। দুর্নীতি যাচাইয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি যথাক্রমে ৫৭৩ ও ৩৫০ জনের চাকরি থেকে অপসারণ (বরখাস্ত) ও বেতন বন্ধের নির্দেশ সহ সিবিআই তদন্তের নির্দেশও দেন। উল্লেখ্য, যাঁদের বরখাস্ত ও বেতন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁদের নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়টি সামনে চলে আসে। পরবর্তীতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়ের উপর ডিভিশন বেঞ্চে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিবিআই-এর পরিবর্তে গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি মামলার তদন্ত ভার ন্যাস্ত হয় একটি কমিটির উপরে। এই কমিটি তৈরি হয়েছিল প্রাক্তন বিচারপতি আর কে বাগ ও শিক্ষা দফতরের কয়েকজন আধিকারিকদের নিয়ে। প্রাক্তন বিচারপতি বাগ সেই কমিটির নেতৃত্বেও ছিলেন। বিচারপতি বাগের নেতৃত্বে তদন্ত অনুযায়ীও দেখা যায় গ্রুপ-ডিতে প্যানেল বহির্ভূত ৬০৯ জনের নিয়োগ হয়েছে। এস এল এস-টির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের মামলা এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগের মামলার প্রাথমিক তদন্তে এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পাওয়া যায়। এই নিয়োগ দুর্নীতিতে সরাসরি যুক্ত একটা কমিটি। এই কমিটি তৈরি হয়েছিল তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কমিটির সদস্যরা ছিলেন শ্রী শান্তিপ্রসাদ সিনহা (উপদেষ্টা, স্কুল সার্ভিস কমিশন), প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় (অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি), সুকান্ত আচার্য (ব্যক্তিগত সচিব, শিক্ষামন্ত্রী), অলোক সরকার (ডেপুটি ডাইরেক্টর) ও শ্রী তাপস পাঁজা (বিকাশভবন ল সেকশন)। অভিযোগ, এই কমিটির হাতযশেই তৈরি হয়েছিল অবৈধ নিয়োগের ছক। আদালতে বিষয়টি উঠতেই শান্তিপ্রসাদ কম্পিউটারের গোলযোগ সংক্রান্ত আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে পরিত্রাণ পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। সত্য কখনও চাপা থাকে না, পরে তা দিনের আলোর মতই প্রকাশ পায়।

গণ মাধ্যমে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত যে কমিটি সদস্যদের সূক্ষ্ম হাতের খেলায় জাল হয়েছে রিকমেনডশন লেটারের সই, পোড়ানো হয়েছে ও এম আর শিট, ডিলিট করা হয়েছে কম্পিউটারের সমস্ত ডেটা। এতে করে রাজনৈতিক প্রভাব না খাটালে দুর্নীতির মামলাটি ঐতিহাসিক হয়ে উঠতে পারে। এই অবৈধ নিয়োগে বাদ পড়ছেন না স্কুল সার্ভিস কমিশনে পদ অলঙ্কৃত করা প্রাক্তনরাও। যাঁদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান শ্রী সুবীরেশ ভট্টাচার্য, স্বল্পকালীন সময়ের অস্থায়ী চেয়ারম্যান শর্মিলা মিত্র (যিনি রিজিওনাল কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন), মহুয়া বিশ্বাস (রিজিওন্যাল কমিটির চেয়ারম্যান), শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় (রিজিওনাল কমিটির চেয়ারম্যান) ও শেখ সিরাজউদ্দিন (রিজিওনাল কমিটির চেয়ারম্যান)। স্কুল সার্ভিস কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা, তার উপর খবরদারি করানোর জন্য কমিটি গঠন সম্পূর্ণ বেআইনি—অন্তত আইন ব্যবসায় জড়িত বিশেষজ্ঞদের অভিমত তাই। ইতিমধ্যে দুর্নীতির নানা মুখ খুলে গিয়েছে। একটা মুখ বন্ধ করতে গেলে অন্যটা খুলে যাচ্ছে।

উচ্চ আদালতের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ১২ এপ্রিল ২০২২, এই দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দফতরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলে তৃণমূল দলের আইনজীবীরা শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর চড়াও হয়ে তাঁর এজলাসে পথ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরে ডিভিশন বেঞ্চে স্থগিতাদেশ পেয়ে শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সিবিআই জেরা থেকে সাময়িক রেহাই পেয়েছেন। প্রথমে একদিনের স্থগিতাদেশ পরে আরও চার সপ্তাহ স্থগিতাদেশ তিনি পেয়েছেন। ইতিমধ্যে বিচারপতি শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে চিঠি লিখে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে জানিয়েছেন কোন রায় ঘোষণার পর ডিভিশন বেঞ্চ পরপর স্থগিতাদেশ কিভাবে দিতে পারে? এভাবে একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি সামনে চলে আসলে চাকরি প্রার্থীরা বিশেষ করে সফল প্রার্থীরা কোথায় যাবে? রাজ্য শিল্পায়ন দীর্ঘদিন বন্ধ আছে। শিল্পে চাকরির/কর্মসংস্থানের সুযোগ একেবারে নেই, শিক্ষিত যুবক যুবতীদের কাছে এসএসসির মাধ্যমে যেটুকুও বা সুযোগ ছিল তা যদি অর্থের খেলায় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাঁরা যাবেন কোথায়? একের পর এক কেলেঙ্কারি সামনে চলে আসলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হবে। বিজেপি তো ওত পেতে বসে আছে। সংঘের রাজনীতির মোকাবিলা করার সঙ্গে এই ধরনের দুর্নীতি চলতে থাকলে সরকার সবকিছু সামলাতে পারবে তো? ১৩ মে '২২ বিচারপতি বাগ কমিটি যা রিপোর্ট দেন তাতে ৩৮১ জনকে বেআইনি নিয়োগ করা হয়েছে যাদের মধ্যে ২২২ জনের নামই কোন তালিকায় ছিল না। ভুয়ো সুপারিশ ও নিয়োগপত্র। পরীক্ষার খাতা নষ্ট করা হয়েছে। প্যানেলের মেয়াদ ফেরোনোর পর

নিয়োগ। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের তৈরি মনিটারিং কমিটি বেআইনি। সংশ্লিষ্টরা অপরাধী, ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ। ইতিমধ্যে আদালতের নির্দেশে সিবিআই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষা দফতরের আরেক মন্ত্রী (প্রতিমন্ত্রী) পরেশ অধিকারীকে জেরা করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বহুমুখ খুলে যাওয়ায় আদালত প্রাথমিকেও দুর্নীতির সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে বন্ধ আছে সব নিয়োগ প্রক্রিয়া। শিক্ষিত বেকাররা এখন কি করবেন? কে তাদের চাকরি দেবে?

[প্রবন্ধটি প্রেসে যাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা কেলেঙ্কারির এক কদর্যতম রূপ দেখা গেছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান, দলীয় মুখপত্রের সম্পাদক প্রভৃতি দায়িত্বে থাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তার বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটে'র হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। তাদের বহু সম্পত্তি, ব্যবসায়িক সংস্থা, অনেকগুলি ফ্ল্যাট, নগদ ৫০ কোটি টাকা, প্রচুর বহুমূল্য গয়না ও সোনার বাট, বিদেশী মুদ্রা এবং অনেক নথি উদ্ধার হয়েছে। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে তদন্ত চলছে।—সম্পাদকমণ্ডলী।]

গোয়া বিধানসভা নির্বাচন ২০২২

মোট আসন ৪০, প্রদেয় ভোট ৮০%– জয়ী: বিজেপি জোট

- বিজেপি: ২৩ আসন (৩৩%ভোট), গতবারের চেয়ে ৭টি আসন বেশি
- কংগ্রেস জোট—
  - * কংগ্রেস: ১১ আসন (২৪%ভোট), গতবারের চেয়ে ৬টি আসন কম
  - * গোয়া ফরোয়ার্ড পার্টি: ১টি আসন (২% ভোট), গতবারের চেয়ে ২টি কম
- আম আদমি পার্টি: ২টি আসন (৭% ভোট), গতবারের চেয়ে ২টি বেশি
- তৃণমূল জোট—
  - * তৃণমূল: কোন আসন পায়নি (৫% ভোট)
  - * মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি: ২টি আসন (৮% ভোট), গতবারের চেয়ে ১টি কম
- এনসিপি-শিবসেনা জোট—
  - * এনসিপি: কোন আসন পায়নি (১.১%), গতবার ১টি আসন পেয়েছিল
  - * শিবসেনা: কোন আসন পায়নি (০.২%)
- রেভেলিউশনারি গোয়ানস পার্টি: ১টি আসন (৯%), গতবারের চেয়ে ১টি বেশি
- নির্দল: ৩টি আসন (১০%ভোট) গতবারের চাইতে ৩টি বেশি
- নির্বাচনের ফলাফল বেরোনোর পর তৃণমূল জোটসঙ্গী মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি ও নির্দলের বিজেপিকে সমর্থন

মণিপুর বিধানসভা নির্বাচন ২০২২

মোট আসন: ৬০, প্রদেয় ভোট: ৮৯%, জয়ী: বিজেপি

- বিজেপি : ৩২ টি আসন (৩৮%), ভোট গতবারের চেয়ে ১১ টি আসন বেশি
- কংগ্রেস - সিপিআই জোট-
  - * কংগ্রেস: ৫টি আসন (১৭% ভোট), গতবারের চেয়ে ৩টি কম
  - * সিপিআই: কোন আসন পায়নি (০.০৬%) ভোট
- জনতা দল (ইউনাইটেড): ৬টি আসন (১১% ভোট)
- নাগা পিপলস্ ফ্রন্ট: ৫টি আসন (৮% ভোট), গতবারের চেয়ে ১ টি বেশি
- ন্যাশনাল পিপল্স পার্টি: ৭টি আসন (১৭% ভোট), গতবারের চেয়ে ৩টি আসন বেশি
- কুকি পিপলস্ এলায়েন্স: ২টি আসন (৮% ভোট), গতবারের চেয়ে ২টি আসন বেশি
- নির্দল: ৩ (২% ভোট), গতবারের চেয়ে ২টি আসন বেশি

"হাউ ডেয়ার ইউ!" থেকে "আপরুট দ্য সিস্টেম" : পথই পথের নির্দেশক

তপন সামন্ত

গ্রেটা থুনবার্গ এখন অনেকের কাছেই পরিচিত নাম। প্রথমে একা শুরু করেছিল। ওই রবি ঠাকুর একটা গান লিখেছেন না—"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।" ব্যাপারটা ওই রকমই। প্রথমে বন্ধুদের সঙ্গ চেয়েছিল। বন্ধুরা রাজি হয়নি। তো

গ্রেটা থুনবার্গ

কি আর করা যাবে। একলাই শুরু করল গ্রেটা। পরে অবশ্য একলা থাকেনি। দু-এক বছরের মধ্যে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল তার নাম —ছোট্ট একটা নবম শ্রেণিতে পড়া মেয়ে তোলপাড় করে দিয়েছে বিশ্বকে। এখন অবশ্য ও আর একটু বড়, ক্লাশ টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ড। আর গ্রেটা এখন একলা নয়, তার সঙ্গে এখন কোটি কোটি তরতাজা কচিকাঁচা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ছাত্রজীবন পেরিয়ে আসা পূর্ণবয়স্করাও। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের পরিবেশ ধর্মঘটের মাধ্যমেই গোটা পৃথিবীতে গ্রেটার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তবে তারও আগে ২০১৯ এর ১৫ ই মার্চের জলবায়ু ধর্মঘটে ১১২টি দেশের ১.৪ মিলিয়ন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল যার মূলেই ছিল গ্রেটা। এক স্কুলছাত্রী কিশোরী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে তাদের দায়িত্বহীনতার কথা তুলে তাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলছে, এটা দেখে আমরা যারপরনাই রোমাঞ্চিত হচ্ছি। এখন দেখা যাক— গ্রেটা একাজটা কিভাবে করতে পারল বা বলা ভাল, কিভাবে কাজটা করে যাচ্ছে।

গ্রেটার পুরো নাম গ্রেটা টিনটিন ইলেওনোরা এর্ণম্যান থুনবার্গ। আশ্চর্যের বিষয় হল, গ্রেটা জন্মেছে সুইডেনের স্টকহোমে। নিশ্চয়ই প্রশ্ন—এতে আশ্চর্যের কি আছে? সবার তো জন্মস্থান একটা থাকবেই, গ্রেটারও আছে। আশ্চর্যের বিষযটা হল স্টকহোম এই নামটা পরিবেশ আন্দোলনের আঁতুড়ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে পরিবেশ যে একটি মাথা ঘামানোর বিষয় তা-ই আমরা জানতাম না। তখন অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানী পরিবেশ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন, আর সেই চিন্তায় রাষ্ট্রসংঘ ভাবিত হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ ই জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হল প্রথম বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। ইংরাজিতে যার পোশাকি নাম—United Nations Conference on the Human Environment। এই সম্মেলনের শুরুর দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সারা পৃথিবীজুড়ে ৫ই জুন পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এই স্টকহোমে যেখানে পৃথিবীর মরণ-বাঁচনের আলোচনার সূত্রপাত হল, সেখানেই তিরিশ বছর পরে ২০০৩ সালের ০৩ জানুয়ারিতে জন্মাল গ্রেটা থুনবার্গ।

কৈশোরটা ছিল না মসৃণ

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের লড়াইয়ের সঙ্গে গ্রেটার লড়াইয়ের কিছুটা মিল রয়েছে। গ্রেটাদের পরিবার শিল্পী-পরিবার। ঠাকুরদা ওলফ থুনবার্গ অভিনেতা ও পরিচালক। গ্রেটার বাবা সোভান্তে থুনবার্গ, পেশায় অভিনেতা। মাও অপেরা শিল্পী। নাম মালেনা এর্ণম্যান। তিনি পেশার জন্য দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ান। আর পাঁচ জন শিশুর মত সব ঠিকঠাকই চলছিল গ্রেটার। তবে একটু বেশি যেন স্পর্শকাতর। আবেগটা বড্ড বেশি। আট বছর বয়সে পারিপার্শ্বিক নানা রকম আলোচনা থেকে গ্রেটা বুঝতে পারে পৃথিবীটা ঠিক নেই। বড়দের কাছে থেকে পৃথিবীর পরিবেশের বিপদের কথা, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ঐ বয়সে শুনেছে ঠিকই, কিন্তু সবটা বুঝে উঠতে পারেনি। ঐ বয়সে সবটা বোঝাও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কিছুটা বুঝে কিছুটা না-বুঝে, গ্রেটা আসন্ন বিপদের কথা ভেবে একেবারে মনমরা হয়ে পড়ল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে গ্রেটা এগারো বছর বয়সে মানসিক অবসাদের মধ্যে ডুবে গেল। ঐ সময় সে কারুর সঙ্গে কথা বলত না। তার খেতে ইচ্ছে করত না। তার ওজন ১০ কেজি কমে গেল। ডাক্তারি ভাষায় মানসিক এই অবস্থাকে বলা হয় অ্যাসপারজার সিনড্রোম, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, সিলেকটিভ মিউটিজম। তিন-চার বছর লড়াই করে গ্রেটা অবসাদ কাটিয়ে উঠে মনের জোর ফিরে পেল। স্টিফেন হকিং লড়েছিলেন দৈহিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে, আর গ্রেটা লড়েছে মানসিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে।

কিশোরী মনে প্রশ্ন জাগে

চোদ্দ-পনের বছর বয়সে সুস্থ হওয়ার পর গ্রেটা পরিবেশের বিপদটা ঠিক কি ধরনের তা বুঝতে পারল, যেটা সে আট বছর বয়সে বুঝতে পারেনি। বোঝার পর সে অনুভব করল যে, পরিবেশকে বাসযোগ্য

রাখতে গেলে রাষ্ট্রনেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। পরিবেশের বিপদের মূলে রয়েছে রাষ্ট্রনেতাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করার পদ্ধতি। আসলে রাষ্ট্রনেতাদের বেশিরভাগই পরিবেশকে সুন্দর করার প্রশ্নে মোটেই আন্তরিক নয়। তারা পরিবেশ রক্ষার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে না। কেন গ্রেটা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল এটা বোঝার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন দেশের সরকারের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীরা আজ পর্যন্ত পরিবেশ রক্ষায় কি ভূমিকা পালন করেছে, তা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

পরিবেশ : শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরে

পরিবেশের আলোচনায় শিল্প বিপ্লবের আগে ও পরের পরিবেশের পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি ঘুরে ফিরে আসে। কারণটা কি? প্রাকৃতিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশের পরিবর্তন রোধ করতে মানুষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু মানুষের কারণে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তনগুলি হয়, সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষ। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতিকে কাজে লাগিয়ে দেশে দেশে বহু রকমের কলকারখানা গড়ে ওঠে। এই কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, দূষিত জল যেমন পরিবেশকে দূষিত করেছে তেমন কলকারখানা, শহর, বন্দরসহ নানা রকমের প্রতিষ্ঠান, বসতি প্রভৃতি গড়ে তোলার জন্য জল-জঙ্গল-খেত-খামার-পশুচারণভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ক্ষতি যে শিল্প-বিপ্লবের আগে একেবারে হয়নি তা নয়। তবে এই ক্ষতি শিল্প-বিপ্লবের পর এত বিপুল পরিমাণে হয়েছে যে তার কোন তুলনাই শিল্পবিপ্লবের আগের অবস্থার সঙ্গে চলে না। তাই শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরে পরিবেশের পরিবর্তনের তুলনা করা হয়। দুটি উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে। বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সহ আরও কয়েকটি গ্যাস তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য সবগুলিকেই কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বাতাসে ১৮০০ সালে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএমভি (পার্টস পার মিলিয়ন বাই ভলিউম)। ১৯৫৮-তে সেটা হয় ৩১৫ পিপিএমভি, ২০০০ সালে হয় ৩৮০ পিপিএমভি, ২০১৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হয় ৪০২.২৮ পিপিএমভি। সভ্যতার যে পথ ধরে আমরা এগোচ্ছি তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির সম্পর্ক সমানুপাতিক। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ছবিটা হল—

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)
১৮০০	৯৮
১৮৫০	১২৬
১৯০০	১৬৫
১৯৫০	২৫৩
২০০০	৬১৪
২০২০	৭৮০

উপরের দুটি তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৮৫০ সালের তুলনায় ২০২০তে জনসংখ্যা ছয় গুনের বেশি বাড়ায়, বিপুল মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও বিলাসী জীবনযাপনের জন্য পৃথিবীর সম্পদ ও শক্তির যারপরনাই ব্যবহারের জন্য বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ১২০ পিপিএমভি বেড়ে গিয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন-এর ফলে ১৮৫০ সালে বায়ুমন্ডলে যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে এখন ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রভাব পড়ছে জলবায়ুতে। সেকারণেই এত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে। তাই এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে, চেষ্টা করা উচিত ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে ধরে রাখতে। না হলে পৃথিবীর কত দেশ জলের তলায় চলে যাবে তার ইয়ত্তা নেই। জল স্থলের বাস্তুতন্ত্র সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। এই যখন অবস্থা, তখন রাষ্ট্রনায়কেরা পৃথিবীকে কোন বিপদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, যা দেখে গ্রেটা দেশে দেশে প্রতিবাদ সংগঠিত করছে, সে আলোচনা পরে করব।

উন্নত বিশ্বের উন্নতি

যে দেশে যত বেশি কলকারখানা হয়েছে ও শহর-বন্দর গড়ে উঠেছে, সে দেশ তত বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড নির্গত করেছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে গত শতকের ছয় বা সাত দশক পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সব কলকারখানা গড়ে উঠেছে তার বেশিরভাগ বা বলা যেতে পারে প্রায় সবটাই হয়েছে ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, ফ্রান্সের মত উন্নত দেশগুলিতে। সুতরাং পরিবেশে এই সময়ে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত হয়েছে তা করেছে উন্নত দেশগুলি। বিনিময়ে তারা পৃথিবীজুড়ে নানারকম পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। আর তাদের দেশের মানুষেরা বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনের অনেক বাইরে গিয়ে কাটাচ্ছে অত্যন্ত বিলাসী জীবন। তথ্যও সেটাই প্রমাণ করে। কয়েকটি দেশের মেগাটনে (Mt) কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের তথ্যে দেখা যায়—

	বছর				
দেশ	১৯৬০	১৯৮০	২০০০	২০১০	২০১৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৬৬০	৫১৮০	৬১২০	৫৭৮০	৫১০৭
জার্মানি	৮৪০	১১৩০	৯০০	৮৩৩	৭৯৭
ইংলন্ড	৬২৪	৬০৫	৫৬৮	৫১৩	৩৭৯
রাশিয়া	৯৪০	২৩৭০	—	—	১৭৬৫
চীন	৮২৯	১৫৩০	৩৫০০	৮৮৭০	১০৮৭৭
ভারত	১৬৭	৩৫৪	১০৬০	১৬১০	২৪৫৫

এখন চিন সবথেকে বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করছে। কিন্তু ২০০০ সালেও মার্কিনি যুক্তরাষ্ট্র সবার থেকে বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করেছে। ভারত ১৯৬০ এর তুলনায় অনেকটা বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ বাড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তারাও শিল্প-বিপ্লবের পর ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ ক্রমাগত বাড়িয়ে গেছে। এই ২০২০ সালেও জন প্রতি কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক

এগিয়ে। আমেরিকা নিঃসরণ করে ১৫.৫৩ মেট্রিক টন, চিন করে ৬.৫৯ মেট্রিক টন, ভারত করে ১.৫৮ মেট্রিক টন। রাশিয়া, জাপান, জার্মানির জন প্রতি কার্বন নিঃসরণও চিনের থেকে অনেক বেশি।

কোন দেশ ১৭৫০ সাল থেকে ২০১০ সাল অবধি কতটা কার্বন নিঃসরণ করছে, তার চিত্রটা হল—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র - ২৪.৯ শতাংশ, চিন — ১৩.১ শতাংশ, রাশিয়া- ৬.৮ শতাংশ, জার্মানি- ৫.৪ শতাংশ, ইংল্যান্ড - ৪.৬ শতাংশ, ভারত - ২.৩ শতাংশ।

এই তথ্যগুলি খেয়াল রাখলে, পরিবেশ ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রশ্নে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ধ্বংসাত্মক আচরণসহ প্রচন্ড ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যগুলির বিপরীতে গ্রেটা কেন রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করছে, তা বোঝা যায়।

কিয়োটো প্রোটোকল

১৯৭২ সালের পর বিশ্বে পরিবেশকে নিয়ে অনেক সম্মেলন ও

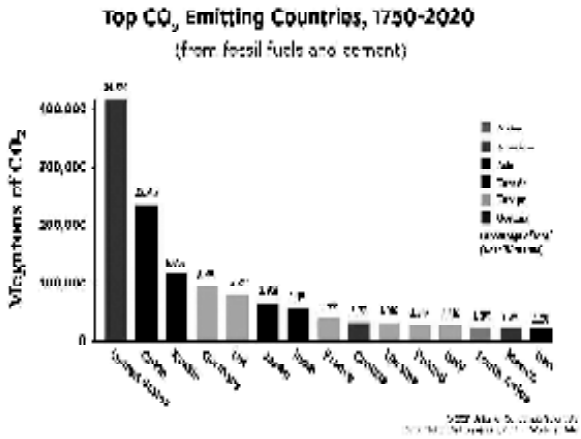

অধিবেশন হয়েছে। আমি সেসব কচকচানিতে যাব না। শুধু তিনটি অধিবেশনের কথা আলোচনা করলেই বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা মুখে যাই বলুন, আসলে কী চাইছেন তা স্পষ্ট হবে।

প্রথমে যে অধিবেশনের কথা বলব সেটা কিয়োটো প্রোটোকল নামে পরিচিত। এটি আসলে জাপানের কিয়োটো শহরে ১লা - ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত COP-3 (কনফারেন্স অফ পার্টিজের তিন নম্বর) এর আন্তর্জাতিক বৈঠক। COPটা কি? ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ৩-১৪ই জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় আর্থ সামিট। এতে ১৭২ টি দেশ উপস্থিত ছিল। এই সামিটেই জলবায়ু সম্পর্কিত কনভেনশনের নাম দেওয়া হয় ''ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC)। সিদ্ধান্ত হয় যে UNFCCC এর অধীনে জলবায়ু বিষয়ে আলোচনার জন্য বিশ্বের দেশগুলির সভা বা সম্মেলন প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাগুলিই COP। এখন তিন নম্বর সভায় বা COP-3 তে বা কিয়োটো প্রোটোকলে পরিবেশ রক্ষায় সবথেকে ভাল সমাধানযোগ্য সূত্র নীতি হিসেবে গৃহীত হয়। নীতিটি হল—''দায় যার দায়িত্ব তার।'' অর্থাৎ পরিবেশের বিপদ সবার হলেও, যে সমস্ত দেশ বায়ুমন্ডলে

গ্রেটা সমাবেশে

যত বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করেছে তাদের তত বেশি দায়িত্ব হচ্ছে পরিবেশ থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড কমানোর। এই কাজটি কিভাবে হবে? কাজটি করার সূত্র হল—৩৮ টি শিল্পোন্নত দেশকে, তারা ১৯৯০ সালে যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করেছিল, তার থেকে ৫.২ শতাংশ কমাতে হবে। আর একাজ করতে হবে ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নতিকামী দেশগুলিকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাদের গুরুত্ব কম। ১৯৯৮ এর ১৬ই মার্চ দেশগুলির স্বাক্ষরের জন্য প্রোটোকলটি পেশ করা হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রোটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ পৃথিবীর মোট নিঃসরণের ৫৫% হলে তবেই প্রোটোকল কার্যকরি হবে। পৃথিবীর উন্নত-দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানেরা কতখানি উদাসীন দেখুন—প্রোটোকল কার্যকরি করতেই তারা সাত বছর লাগিয়ে দিলেন। ২০০৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কিয়োটো প্রোটোকল কার্যকরি হয়। সবথেকে উল্লেখ করার বিষয়, জলবায়ু দূষণের প্রধান উৎস যুক্তরাষ্ট্র প্রোটোকলে স্বাক্ষর করেনি। ফলে প্রকৃতপক্ষে কিয়োটো প্রোটোকলের বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে গেল। কাজের কাজ কিছুই হল না। ফলে ২০০৫ সালেই দেখা গেল কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ শিল্পোন্নত দেশগুলি কমানোর বদলে বাড়িয়েছে।

INDC

কিয়োটো প্রোটোকলের প্রথম পর্যায় ২০১২ সালে শেষ হওয়ার পর এবং সদিচ্ছার অভাবে প্রকৃতপক্ষে কিয়োটো প্রোটোকল ব্যর্থ হওয়ায়, নতুন করে আলোচনা শুরু হল কনফারেন্স অফ পার্টিজে। COP-13 থেকে COP-20 পর্যন্ত বিশ্ব অধিবেশনগুলিতে জলবায়ু পরিবর্তনের

বিষয়ে করণীয় কি, তা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। ২০১১ সালে ডারবান শহরে অনুষ্ঠিত COP-17 থেকেই আমেরিকাসহ শিল্পে উন্নত দেশগুলি কিয়োটো প্রোটোকল সম্পূর্ণ বাতিল করে নতুন চুক্তির জন্য সওয়াল করতে থাকে। ২০১৩ সালে পোল্যান্ডে COP-19 এ কিয়োটোতে গৃহীত বাধ্যতামূলকভাবে কার্বন-ডাইঅক্সাইড কমানোর নীতির পরিবর্তে স্বেচ্ছায় হ্রাসের নীতি গৃহীত হয়। দেশের দায়িত্ব ও নীতিবোধের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এটাই চাইছিল শিল্পোন্নত দেশগুলি। কারণ তারা দায়িত্ব ও নীতির ধার ধারে না। বলা হল—প্রত্যেক দেশ নিজে নিজেই কতটা কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমাবে, তা ঘোষণা করবে। এই ঘোষণাপত্রকে বলা হল Intended Nationally Determined Contribution (INDC)। আরও বলা হল সব দেশকে COP-21 এর আগে ২০১৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে INDC জমা দিতে হবে। রাষ্ট্রনায়কেরা দায়িত্বের কি পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

প্যারিস সম্মেলন

আগেই COP-17 এর কথা উল্লেখ করেছি। এই সম্মেলনেই নতুন চুক্তির একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং ঠিক হয় এই খসড়াটি আলোচনা করে ২০১৫ তে প্যারিসে COP-21 এ চূড়ান্ত করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যারিসে ২০১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কনফারেন্স অফ পার্টিজের ২১তম সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে থেকে বহু টালবাহানার পর একটি চুক্তি গৃহীত হয়, যা প্যারিস চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তিটি দ্বিচারিতায় ভরা আর চুক্তিতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক ভাল ভাল কথা বলা আছে। যেমন—শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীর যে তাপমাত্রা ছিল তার থেকে কিছুতেই ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না। বরং চেষ্টা করতে হবে যাতে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যেই থাকে। অথচ সম্মেলনের আগে পৃথিবীর সব দেশ যে INDC জমা দিয়েছিল তা যোগ করলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। ভাবুন, বলা হচ্ছে ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি বেঁধে রাখতে হবে অথচ INDC অনুযায়ী সেটা হয়ে যাচ্ছে ৩.৭ ডিগ্রি। আর এই বিষয়টা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্যই হল না ১৩ দিনের এই সম্মেলনে। রাষ্ট্রপ্রধানদের দ্বিচারিতার ছবিটা নিশ্চয়ই এবার স্পষ্ট হয়েছে। গ্রেটার প্রশ্নটা এখানেই, পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রপ্রধানদের সততা নিয়ে। তাঁরা কি আদৌ জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করতে আন্তরিক?

প্যারিস চুক্তিতে ছেলে-ভুলনো আরও অনেক কথা বলা হয়েছে। যেমন—INDC এর প্রতি দায়বদ্ধতা থাকতে হবে, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর INDC জমা দিতে হবে, উন্নত দেশগুলিকে গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিকে দিতে হবে, এই সাহায্যের জন্য ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের ফান্ড তৈরি করা হবে ইত্যাদি। সবই ''করা হবে'' করা না হলে কী করা হবে, সেসবের কোন প্রসঙ্গই নেই চুক্তিতে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধে বাধ্যতামূলক কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হল না চুক্তিতে। প্রকৃতপক্ষে প্যারিস চুক্তি একটি অশ্ব-ডিম্ব প্রসব করেছে। কিন্তু কেন? ''কেন'' এই প্রশ্নটাই সমস্ত তরুণ হৃদয়ে তুলে দিতে চেয়েছে গ্রেটা থুনবার্গ।

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—''আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়। তবে গ্রেটা সেটাই করেছিল। সে বাড়ি থেকেই প্রতিবাদটা শুরু করেছিল এবং সফল হয়েছিল। বাড়ির লোকজনকে ভেগান (পুরো নিরামিষাসী) হতে, জীবাশ্ম জ্বালানিবিহীন যান ও সাইকেল ব্যবহার করতে বাধ্য করেছিল। গ্রেটা বাড়ির লোকজনদের বলত—''এটা না করার অর্থ তোমরা আমার ভবিষ্যৎ চুরি করে নিচ্ছ।'' গ্রেটার মাকে পেশার কারণেই বিমানে চড়তে হত। কিন্তু গ্রেটার তীব্র আপত্তি বিমান চড়াতে। তাই বাধ্য হয়ে গ্রেটার মা অপেরা গায়ক হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়া পেশাটাই ছেড়ে দিলেন। গ্রেটা নিজের ক্ষেত্রেও এই প্রবাদটি প্রয়োগ করেছে। পরিবেশ রক্ষায় সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ও দেশের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি দেশের প্রতিটি নাগরিকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নত, অনুন্নত ও উন্নতিকামী দেশের মানুষদের প্রত্যেকেরই উচিত নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করে ডিজেল পেট্রলসহ সব রকমের জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার যথা সম্ভব কমিয়ে ফেলা। পৃথিবীর তাপমাত্রা কমাতে আমাদের এ কাজ করতেই হবে।

অপ্রতিরোধ্য গ্রেটার পথচলা শুরু

এবারে গ্রেটার আন্দোলনের প্রসঙ্গে আসি। গ্রেটা তার মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠার পর, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য মনে মনে কিছু একটা করতে চাইছিল। 'ডেমোক্রেসি নাও' পত্রিকার অমি গুডম্যানের (Amy Goodman) সঙ্গে সাক্ষাতকারে গ্রেটা জানিয়েছে যে, ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকায় একটি শ্যুট আউটের কথা জেনে পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে স্কুলে না যাওয়ার ভাবনা আসে। আমেরিকার ফ্লোরিডার পার্কল্যান্ডের একটি স্কুলে ২০১৮ এর ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে এক বন্দুকধারী গুলি করে ১৭ জনকে হত্যা করে। তখন ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে চাইছিল না। স্কুলে না যেতে চাওয়ার বিষয়টি গ্রেটার আন্দোলনের প্রাথমিক পথ নির্দেশ করে। ঐ বছরের মে মাসে সুইডিস খবরের কাগজ Svenska Dogbladet আয়োজিত আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয় গ্রেটা। এই প্রবন্ধে যে কথাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সেটি হল—''আমি নিরাপদে আছি এই অনুভূতি নিয়েই বাঁচতে চাই। কিন্তু আমি কী করে সে অনুভূতি পাব যখন আমি জানি যে মানব ইতিহাসের চরমতম সঙ্কটের মধ্যে আমরা রয়েছি?'' এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ায় সেটি বো থোরেনের (Bo Thoren) নজরে আসে। উনি 'ফসিল ফ্রি ডালসল্যান্ড' নামে পরিবেশ রক্ষার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। থোরেনই গ্রেটাকে ছাত্রদের জলবায়ু ধর্মঘটের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরামর্শটি গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় গ্রেটা প্রথমে বন্ধুদের নিয়ে ধর্মঘটের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন কোন বন্ধুকেই পাশে পায়নি। সুতরাং ''একলা চল রে''।

৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ ছিল সুইডেনের সাধারণ নির্বাচন। ২০ শে আগষ্ট তারিখে গ্রেটা সিদ্ধান্ত নিল—সে সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত স্কুলে যাবে না। সে বছর সুইডেনে তীব্র গরম পড়েছিল। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছিল। কারণ সুইডেনের ২৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল। আশপাশের দেশ ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়েতেও অনেক দাবানলের ঘটনা ঘটেছিল। সুইডেনে মে-আগস্টে মাত্র ১৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল। পরিসংখ্যান বলে ২৬২ বছর পর সুইডেনে এত গরম পড়েছিল। গ্রেটা সুইডিশ সরকারের কাছে দাবি করেছিল—প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী দেশে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। এই দাবী নিয়ে সে সুইডেনের সংসদ ভবন রিখসডাগ (Riksdag) এর সামনে 'জলবায়ু'র জন্য স্কুল ধর্মঘট এই ব্যানার নিয়ে বসে থাকত। এই ভাবে কাটিয়েছে তিন সপ্তাহ। তখন সে নবম শ্রেণিতে পড়ে। তবে আনন্দের কথা, এই আন্দোলনে গ্রেটাকে একা থাকতে হয়নি। গ্রেটা প্রথম দিনের ধর্মঘটের ছবি ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে দিয়ে দেয়। ঝড়ের গতিতে তরুণ প্রজন্ম সেগুলি শেয়ার করে। দ্বিতীয় দিনে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট করে। প্রতিদিনই সংখ্যাটা বাড়তে থাকে। দু-এক দিনের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে গ্রেটার অনুগামীর সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে প্রিন্ট মিডিয়ায়। স্থানীয় খবরের কাগজে ধর্মঘটের কথা বেরোতে থাকে। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রেটা থুনবার্গ আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়ে যায়। বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে, নির্বাচনে প্যারিস চুক্তি যাতে যথাযথভাবে অনুসৃত হয় তার জন্য জনমত তৈরি করে চাপ সৃষ্টি করা ছিল এই আন্দোলনের কৌশল। অবশ্য গ্রেটার স্কুলে না গিয়ে ধর্মঘট করার বিষয়টি সবাই ভাল ভাবে নেয়নি। শিক্ষকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। গ্রেটার বাবাও পছন্দ করছিলেন না। তবে তিনি জানতেন, এ কাজ থেকে গ্রেটাকে বিরত করলে গ্রেটা খুব মনোকষ্টে দিন কাটাবে। তাই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তবে সাধারণ মানুষেরা এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছিল।

২০১৮ সালের ৩-১৪ই ডিসেম্বর পোল্যান্ডের কাটোওয়াইজে (Katowise) COP-24 এর বৈঠক বসে। সেখানে গ্রেটা চলে গিয়েছিল। এই বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে (plenary session) তার একটি বক্তব্য বহুল আলোচিত হয়। বক্তব্যটি ছিল—''সম্মেলনে উপস্থিত বিশ্বনেতারা পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থাটা বলার মত পরিণত হননি।'' রাষ্ট্রনেতাদের কথাটাকে হজম করতে হয়েছিল।

২০১৮ সালের অক্টোবরের পর আন্দোলনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনে গ্রেটা। সে বুঝতে পারে স্কুল ধর্মঘট প্রতিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইউরোপের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সংহতিমূলক প্রতিবাদের আহ্বান জানায়। ডিসেম্বরের পরে কেবলমাত্র সপ্তাহের একটি দিন শুক্রবারে স্কুল ধর্মঘটের ডাক দেয় গ্রেটা। এই ডাক ইউরোপ ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ মাসেই পৃথিবীর ২৭০টি শহরের কুড়ি হাজার ছাত্রছাত্রীর ধর্মঘটে সামিল হয়। এই আন্দোলনটি ''ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার'' বলে খ্যাতিলাভ করে।

২০১৯ এর জানুয়ারিতে ওয়ার্লড ইকোনমিক ফোরামে গ্রেটার বক্তব্যের মূল কথা ছিল—''আগুনের মধ্যেই আমাদের বাড়ি।'' ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে লক্ষ্য করেই কথাটি বলেছিল। ছোট্ট একটা মেয়ে ভয় পায়নি একটুও। পৃথিবীর দেশে দেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে গিয়ে বন্ধ হয়নি নিজের দেশের আন্দোলন। দেশে ফিরেই প্রতি শুক্রবারে সংসদ ভবনের সামনে বসেছে ধর্নায়।

এত কাজের মধ্যেও লেখাপড়ায় কিন্তু ফাঁকি দেয়নি গ্রেটা। নিম্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল গ্রেড নিয়েই পাশ করেছে সে।

লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি

গ্রেটার নেতৃত্বে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে দেশ বিদেশে। আন্দোলনের ব্যাপ্তি অনুভব করে গ্রেটা দেশে দেশে তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে তার এই আন্দোলনকে আরও প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়। উন্নত দেশগুলি বিপুল পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে। তাই ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ কাজ করতে গেলে স্কুলে লেখাপড়া থেকে সাময়িক বিরতি নিতে হবে। গ্রেটা বছর খানেকের জন্য তাই ছুটি নিল। ওদেশে এ ধরনের বিরতি নেওয়ার সুযোগ আছে। সে ২০১৯ এর জুলাই থেকে স্কুল যাওয়ায় বিরতি নিল। কিন্তু এত দূর দূর দেশ যেতে গেলে বিমানে চাপতে হবে। আর বিমানে উড়ান মানেই বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি করা। কিন্তু গ্রেটা তো সেটা করবে না। গ্রেটা সৌরশক্তিচালিত ৬০ ফুটের রেসিং ইয়ট জলযান Malizia II তে চেপে প্লাইমাউথ, ইংল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল। এই যাত্রাটি ''কার্বন—নিরপেক্ষ আটলান্টিক অতিক্রমণ'' (Carbon-neutral trans-atlantic crossing) নামে ঘোষিত হয়েছিল।

হাউ ডেয়ার ইউ!

১৮ই সেপ্টেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু সঙ্কটের জন্য গঠিত কমিটির কাছে গ্রেটা একটি বিবৃতি পেশ করেছিল। ২৩শে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের ''ক্লাইমেট অ্যাকশান সামিট'' এ যোগ দেয় গ্রেটা। সেখানে একেবারে চোখে চোখ রেখে চাঁছাছোলা ভাষায় সুতীব্র আবেগে আক্রমণ করে রাষ্ট্রনায়কদের। গ্রেটার সেই বক্তব্য ''কি স্পর্ধা তোমাদের!'' (How dare you!) শিরোনামে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। গ্রেটার বক্তব্যটি ছিল—সব কিছুই ভুল হচ্ছে। আমার তো এখন এখানে থাকার কথা নয়। এখন তো আটলান্টিকের অপর তীরে আমার স্কুলে যাওয়া উচিত। কি স্পর্ধা তোমাদের! তোমরা তোমাদের শূন্যগর্ভ কথা দিয়ে আমার স্বপ্ন, আমার শৈশব চুরি করেছ। পৃথিবীর মানুষেরা ভুগছে এবং মারা যাচ্ছে। সমগ্র বাস্তুতন্ত্র চুপসে যাচ্ছে। প্রজাতিগুলির গণ-বিলুপ্তিকরণ শুরুর মুখোমুখি আমরা। আর তোমরা টাকা এবং অবিশ্রান্ত অর্থনৈতিক বাড়-বৃদ্ধির গালগল্প শোনাচ্ছ। কী স্পর্ধা তোমাদের!'

জলবায়ু ধর্মঘট

ঐ একই দিনে UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) একটি সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রেটাকে আপ্যায়ন করে। গ্রেটা পনেরো জন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিশোরদের নিয়ে ঐ সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেয় এবং কার্বন নিঃসরণ কমাচ্ছে না এরকম দেশ আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ফ্রান্স ও জার্মানির বিরুদ্ধে যথাবিধি অভিযোগ দায়ের করে। ২৭শে সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে স্কুল ধর্মঘটে গ্রেটা যোগ দিয়েছিল। মনে রাখা দরকার এই সময় ২০-২৭ সেপ্টেম্বর পৃথিবীজুড়ে চলছিল ছাত্রছাত্রীদের জলবায়ু ধর্মঘট। এই আট দিনের মধ্যে যেকোন একদিন ধর্মঘট করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে অল ইন্ডিয়া পিপলস সায়েন্স নেটওয়ার্কের ডাকে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সহ অনেক সংগঠনই তাদের সাংগঠনিক তৎপরতায় এই জলবায়ু ধর্মঘট ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘটিত করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল।

বিজ্ঞানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হও

চিলির সান্তিয়াগোতে COP-25 অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ২০১৯ এর ডিসেম্বরে। কিন্তু চিলির আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এই সম্মেলন স্পেনের মাদ্রিদে স্থানান্তরিত হয়। এই সম্মেলনে যোগ দিতে চায় গ্রেটা। কিন্তু যাবে কিসে? বিমানে তো গ্রেটা চাপবে না! এবারেও ব্যবস্থা হয়ে গেল। রিলে হোয়াইটলাম ও এলেইনা ক্যারাসু নামে এক অস্ট্রেলীয় দম্পতি ৪৮ ফুটের জলযান লা ভ্যাগাবন্ডে পৃথিবী ভ্রমণ করছিলেন। ঐ জলযানেই ১৩ই নভেম্বরে গ্রেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাম্পটন থেকে যাত্রা শুরু করে পর্তুগালের লিসবনে ৩রা ডিসেম্বরে পৌঁছায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার আগে সেখানকার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে গ্রেটার বার্তা ছিল—''বিজ্ঞানের জন্য সংঘবদ্ধ হও এবং বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই সব কাজ কর।'' লিসবন থেকে মাদ্রিদে পৌঁছে গ্রেটা COP-25 এ যোগ দেয় এবং 'ভবিষ্যতের জন্য শুক্রবার' জলবায়ু ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিলিত হয়। এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমরা এক পরিণত গ্রেটাকে দেখতে পেলাম। সে জানাল—''স্কুল ধর্মঘট করে আমরা কিছুই পাইনি। এখনও গ্রীন হাউস গ্যাসগুলির নিংসরণ ৪ শতকরা হারে বাড়ছে।'' গ্রেটা ফলপ্রসূ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের ডাক দেয়। গ্রেটা স্কুল-বিরতি শেষ করে আবার স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু তার লড়াই থেমে নেই।

ভারতের কৃষকের পাশে

গ্রেটার পৃথিবীকে চেনার দৃষ্টি ক্রমশ স্বচ্ছ হচ্ছে—সমস্যার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছে গ্রেটা, পৃথিবীর সচেতন মানুষ তা বুঝতে পারছেন। আমরা ভারতবাসীরা তো এটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এক বছরের বেশি সময় দিল্লির সীমান্তে বসেছিলেন দেশের অন্নদাতারা। শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলেই খোলা আকাশের তলায় রোদ বৃষ্টি শীত উপেক্ষা করেই তাঁরা বসেছিলেন দেশের সংসদে পাশ হওয়া তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবীতে। কৃষকদের ভাবনা—এই আইন চালু হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না, কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি হবে। গ্রেটা সমর্থন করল কৃষকদের। এর জন্যই আমাদের দেশের সরকার গ্রেটার ওপর প্রচন্ড খাপ্পা। আনন্দের কথা সরকার পিছু হটেছে। কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে গ্রেটা। আর সকলেই জানি, শাসকের বিরুদ্ধে ন্যায্য কথা বললে শাসকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এটাই সত্যি কি ভারতে, কি অন্য জায়গায়। এই উপলব্ধি নিয়েই সামনের দিকে এগোচ্ছে গ্রেটা।

আপরুট দ্য সিস্টেম

অবিরাম পথে থেকে ও ''জীবনে জীবন যোগ করে'' গ্রেটা 'হাউ ডেয়ার ইউ' বলে যেমন বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছে, তেমনি আরও অনেকটা পরিণত হয়ে 'ফ্রাইডেজ ফর ফিউচার' এর মাধ্যমে সমস্যার মূলে আঘাত করে ২৪শে নভেম্বর, ২০২১-এ বিশ্ব জলবায়ু ধর্মঘটে 'আপরুট দ্য সিস্টেম' বা 'ব্যবস্থাটা উপড়ে ফেল' বলে শ্লোগানে মুখরিত করাতে পেরেছে বিশ্ববাসীকে।

তথাকথিত উন্নয়নের ধাক্কায় আদিবাসী জনজাতিদের যাবতীয় জীবন-জীবিকা, কৃষ্টি সব ধূলিস্যাৎ হয়ে এসেছে। পশ্চিমবাংলার দেউচা-পাচামিতেও খোলামুখ কয়লা খনির মাধ্যমে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা জোরকদমে শুরু হয়েছে। এই এলাকাটি আদিবাসী অধ্যুষিত। সারা বিশ্ব যখন কয়লা ব্যবহার বন্ধ করার দিকে হাঁটছে বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা ভেবে, তখন আমাদের রাজ্যে কয়লা উত্তোলনের পক্ষে আগ্রাসী প্রচার চলছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কয়েক হাজার আদিবাসী মানুষ উচ্ছেদ হবেন বাস্তুভিটা ও তাদের বংশপরম্পরায় সংরক্ষিত বাস্তুতন্ত্র থেকে।

এই অসাম্য ও বৈষম্যের জন্যই উন্নয়নের ছিটেফোঁটাও যাদের কাছে পৌঁছায় না তারাই হয় উন্নয়নের কারণে উদ্বাস্তু। এই বাস্তুচ্যুত মানুষদের ''জলবায়ু রিফিউজি'' বলে চিহ্নিত করে 'fridaysforfuture.org' এ জহ্নাভু পালসোদুকর ও আদ্রিনা ক্লুৎডরন জানিয়েছেন—জলবায়ু রিফিউজিদের চিহ্নিত করার কোন আইনই নেই পৃথিবীতে। জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করতে গেলে এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। লড়তে হবে জাতিবাদ, পুরুষতন্ত্র ও শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে। লেখকদ্বয় বৈষম্যের আলোচনায় ছ'টি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যার থেকে 'ব্যবস্থাটা উপড়ে ফেল' শ্লোগানের উৎস পাওয়া যায়। সেগুলি হল— ১) টিকা (কোভিড) পাওয়ার অন্যায্যতা (Vaccine Injustice) : ২৩/০২/২২ তারিখে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় ২ শতাংশ, তাঞ্জানিয়ায় ৩ শতাংশ, সুদানে ৪ শতাংশ, কেনিয়ায় ১৩ শতাংশ, ঘানায় ১৪ শতাংশ মানুষের সম্পূর্ণ কোভিড টিকাকরণ হয়েছে। ২) জলবায়ু রিফিউজি (Climate Refugees) : ২০২০ সালে কোভিড অতিমারী বছরে ৩০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন জলবায়ু সঙ্কটের কারণে। ৩) আদিবাসী মানুষ (Indigenous People) : এই মানুষেরাই পৃথিবীর আশি শতাংশ জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে, অথচ তারাই আক্রান্ত হয়। ৪) জলবায়ু

পরিবর্তন রোধে দায়িত্বের রকমফের (Varying Climate Responsibilities) : উত্তর গোলার্ধের দেশগুলি পৃথিবীর ৯২ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ করছে, দায়িত্বটা তাদেরই বেশি নিতে হবে। ৫) জলবায়ুর ক্ষতিপূরণ (Climate Reparation) : এতদিন দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তর গোলার্ধে অর্থের প্রবাহ ঘটেছে, এখন উল্টোটা দরকার। ৬) সংখ্যালঘুদের উপর সামাজিক প্রভাব (Social Impacts on minority groups) : সবথেকে বেশি জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এই শোষিত মানুষগুলি। এই মানুষদের সঙ্গে নিয়েই পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

গ্লাসগো সম্মেলন

৩১/১০/২১-১২/১১/২১ তে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল কনফারেন্স অফ পার্টিজের ২৬ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। প্যারিস সম্মেলনের মতই এই সম্মেলনেও চায়ের কাপে তুফান উঠেছে। সম্মেলনের সভাপতি ব্রিটেনের মন্ত্রী অলোক শর্মা বলেছেন—বিশ্বের তাপমাত্রা কমানোর এই সম্মেলন শেষ সুযোগ। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন—"পরিবেশের সঙ্গে টয়লেটের মত আচরণ করছি"। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে ভর্তুকি ১০ বছরের বদলে ৫ বছরে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়েছে। অথচ তথ্য হচ্ছে জার্মানি ছাড়া কোন উন্নত দেশই কয়লা খনি বন্ধ করেনি। ভারত, বাংলাদেশ উন্নত দেশগুলিকে দূষণ কমানোর জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের পরামর্শ দিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ২০৩০ সালের মধ্যে রেলে এবং ২০৭০ সালের মধ্যে দেশে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনবেন বলেছেন। কিন্তু তার যে পরিকল্পনা তিনি সম্মেলনে উপস্থাপনা করেছেন তাতে প্রচুর ফাঁকফোকর আছে। যারা যে INDC দিয়েছিল, তার কোন পর্যালোচনা হয়নি। পরিবেশদূষণ রোধে গরীব দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্য উন্নত দেশগুলিকে যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গড়ার কথা প্যারিস সম্মেলনে বলা হয়েছিল সেটাকে আবার বাস্তবায়িত করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কাজটা কেন হল না তার জবাবদিহি করতে হয়নি। ২০৩০ এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৮ শতাংশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৫৫ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ কমাবে বলে প্যারিস সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় সেই কাজটা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্যই এগিয়েছে। কেন এগোল না ছয় বছরে তার কোন পর্যালোচনাই হল না। গ্লাসগোতে নতুন করে প্যারিসের ঘোষণাই আবার করা হল, বলা যায়। তবে কিছু নতুন ঘোষণা হয়েছে—২০১০ এ নির্গত গ্রিনহাউস গ্যাসের ৪৫ শতাংশ হ্রাস করতে হবে ২০৩০ সালের মধ্যে এবং কার্বন নিঃসরণ নেট-জিরোতে আনতে হবে ২০৫০ সালের মধ্যে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দ্বীপ-রাষ্ট্র সহ অনুন্নত ও উন্নতিকামী দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতে হবে উন্নত দেশগুলিকে। এখন দেখার এগুলি প্যারিসের মত ঘোষণাই থেকে যায় না কি বাস্তবায়িত হয়। তবে একটা বিষয় পরিষ্কার—'ব্যবস্থাটা উপড়ে ফেল' শ্লোগানটি উত্থাপন করে গ্রেটারা জলবায়ু পরিবর্তন রোধের জন্য যে সকল অসাম্য দূর করতে চেয়েছেন, পরোক্ষে হলেও সেগুলিকে আলোচনার বাইরে রাখতে পারেনি রাষ্ট্রসংঘ তথা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি।

আঠারো আসুক নেমে

এখন গ্রেটার বয়স আঠারো। এই বয়সটা নিয়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য খুব আশাবাদী ছিলেন। তাই তাঁর কলম দিয়ে লেখা হয়েছিল—"এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।" এই বয়সটা কোন বাধা নিষেধ মানতে চায় না। এই বয়সটাতেই অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারক ভাঙ্গতে হয়। সুন্দর পৃথিবী গড়বার স্বপ্নগুলো এই বয়সেই বেশি বেশি করে ধরা দেয়। আঠারোর গ্রেটা থুনবার্গ পথ দেখাচ্ছে। আমাদের সকলকেই গ্রেটার কণ্ঠস্বরকে এমন জোরালো করতে হবে যাতে রাষ্ট্রপ্রধানেরা কার্বন-ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমাতে বাধ্য হয়। আজ যে শিশুটি জন্মাচ্ছে, ভবিষ্যতে যে শিশুরা পৃথিবীর আলো দেখবে তাদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবীটা রেখে যাওয়ার মরণ-পণ লড়াইটা এখনই শুরু করা দরকার। পৃথিবীর তাপমাত্রা যারা প্রতিদিন বাড়াচ্ছে, তাদের চোখে চোখ রেখে, আসুন সাহস করে বজ্রনির্ঘোষে বলি—"হাউ ডেয়ার ইউ!" ব্যবস্থাটা উপড়ে ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করি।

সূত্র :

১. Wikipedia ২. The History of Carbon Dioxide Emission- by Johannes Friedrich & Thomas Damasa, May 21, 2014 (wri.org/insights/history) ৩. পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্যারিস সম্মেলন বিষয়ক কর্মশালার নোট (১৭/০১/২০১৬) ৪. প্যারিস জলবায়ু চুক্তির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি—বাসব বসাক (নন্দন, ৪ জানুয়ারি ২০১৬) ৫. fridays fortitude.org ৬. "গ্লাসগো সম্মেলন" কি আরেকটি কথা না রাখার সম্মেলন? - তপন সাহা (জনবিজ্ঞানের ইস্তাহার, নভেম্বর - ২০২১) ৭. List of Countries by Carbon dioxide Emission- Wikipedia

বর্জ্য সংবাদ

কলকাতার দৈনিক বর্জ্যের উৎপাদন	প্রায় ৪,৫০০ টন	
কলকাতায় দৈনিক বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণ হয়	৫১৫ টন	
কলকাতায় প্রতিদিন বর্জ্য জমে থাকে	৩৯৮৫ টন	
দেশে দৈনিক উৎপাদিত বর্জ্য	১,৪৩,৪৯৯ টন	(২০১৫)
দেশে দৈনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ	১৫,৪৫০ টন	
দেশে দৈনিক জমে থাকা বর্জ্য	১,২৯,০৪৯ টন	

FIAM সম্পর্কে কিছু কথা

চিন্ময় দাস

FIAM (Forum for Indigenous Agricultural Movement) একটি সেকশন-৮ সংস্থা অর্থাৎ কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি নথিভুক্ত সংস্থা। কর্পোরেট আইডি নম্বর-U85300WB ২০২০ WP2241467, ২০১৩ সালে কোম্পানি আইন অনুযায়ী। ২০০৯-১০ সালে দেশি ধানের প্রাকৃতিক চাষ ও সংরক্ষণ এর মধ্য দিয়ে এর কাজ শুরু হয়। পরম্পরা চাষ পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, হাজারো হারিয়ে যাওয়া বা হারাতে চলা বীজ বৈচিত্র্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে, অনেক অনেক মানুষের কাছে জৈব চাষ ও বিষমুক্ত খাবার কে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে, সর্বোপরি প্রযুক্তি বা তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ধারার কৃষি ব্যবস্থাপনার বিকল্পে সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে। যে কৃষি ব্যবস্থায় কৃষকরা দেশজ বীজবৈচিত্র ও কৃষি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিষমুক্ত জীবন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলবে এবং পরিবারের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বজায় রেখে কৃষি জমির উর্বরতা টিকিয়ে রাখবে এবং সাথে সুস্থায়ী গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে তুলবে।

এই সংস্থা গত এক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে দেশজ বীজ বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং জৈব চাষ প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত আছে। এবং হাজারো কৃষকদের জৈব চাষে উদ্বুদ্ধ করে তাদের উৎপাদিত ফসল বিপণনের জন্য মার্কেট লিংকেজ এর ব্যবস্থা করছে। বর্তমান সময়ে যেখানে পেট্রোকেমিক্যাল নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা সমগ্র কৃষি বাস্তুতন্ত্র কে গ্রাস করে ফেলছে, সেখানে FIAM কাজ করে চলেছে পরম্পরা গত কৃষি জ্ঞান ও কৃষি কৌশলকে নতুন বিন্যাসে কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করতে।

FIAM বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নিয়ে ৩০০-র ও বেশি কৃষি মানুষদের নিয়ে প্রায় ৭০০ বিঘা জমিতে জৈব চাষ এর কর্মকান্ড এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কৃষি কাজের সাথে সাথে অনেকেই প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত আছে। কেউ গো-পালন, দুধ উৎপাদন, কেউ পনির বা ডিম উৎপাদন, কেউ ডালের বড়ি বা রাসায়নিক উপাদান ছাড়া ফিনাইল উৎপাদন, ধূপকাঠি, কেউবা শাক সবজি চাষের পাশাপাশি গৃহভিত্তিক কেঁচো সার উৎপাদন কাজের সাথে যুক্ত। মহিলা কৃষি মানবীরা বাড়িতে চাষের কাজে সরাসরি সাহায্য করার পর আলুর পাপড়, চালের পাপড়, বীজ সংরক্ষণ, বীজ ব্যাংক তৈরি, চালের গুড়া তৈরি ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে প্রতিনিয়ত।

বর্তমানে FIAM-এ ৪০০ এর বেশি ধান, ৪০ রকমের গম, ১২ রকমের আলু, ১৬ রকমের টমাটো, ১৪ রকমের বেগুন, ১২ রকমের লঙ্কা, ছয় রকমের ডাল, চার রকমের সরিষা সহ হাজারো দেশজ বৈচিত্র সংরক্ষণ করে চলেছে। এই দেশজ বীজগুলি শুধু সংরক্ষণই শেষ কথা নয়, এগুলির মধ্যে যেটি যেই অঞ্চলের চাষের পক্ষে উপযোগী সেগুলি সেই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং ফসল উঠে গেলে সেখান থেকে বীজ আবার পরের বছরের জন্য সংরক্ষণ করা হয়, নতুন চাষীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য।

বীজসংরক্ষণ এবং ঘরে ঘরে জৈব সার তৈরির ব্যবস্থাপনার জন্য অভিজ্ঞ চাষীদের নিয়ে আলাদা আলাদা কমিটি আছে যারা প্রতিটি উৎপাদকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রেখে সমস্ত ব্যবস্থাপনা নজরদারি করে। ফসল নির্বাচনের জন্য প্রতিটি মরশুমের আগে বিভিন্ন ইউনিটে চাষীদের নিয়ে একটি মিটিং সংঘটিত হয়। উৎপাদিত ফসলের গুণমান যাচাই করে তা পাঠানো হয় FIAM-এর বিষমুক্ত পণ্যের বিপণন কেন্দ্র 'চাষী ঘর' রায়গঞ্জ, সুপার মার্কেটে। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সংস্থা যারা এতটা বড় স্কেলে একসাথে উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ বিপণনের দায়িত্ব পালন করছে ক্লান্তিহীনভাবে। এবং প্রতিটি স্তরে সুস্পষ্ট নজরদারি রাখা হয় গুণমান ঠিক রাখার জন্য। Conservation cannot sustain without consumption। তাই আমাদের ক্রম সাইকেলে সেই সমস্ত জাতি গুলিকে নির্বাচন করা হয় যেগুলির একদিকে যেমন খাদ্যগুণ থাকবে অন্যদিকে তার চাহিদাও থাকবে। আর সেই দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করছে 'চাষী ঘর'।

আমাদের বীজ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি কোন ক্ষেত্র থেকে কোন ফান্ড গ্রহণ করিনি। তবে কৃষকদের জৈব চাষের পরিকাঠামো তৈরি করে দিতে কৃষি দপ্তর প্রভূত সহযোগিতা করে চলেছে। FIAM-এর কাজ চলছে রায়গঞ্জ ব্লকের হাতিয়া, ভট্ট দিঘী, মহারাজপুর, অভিনগর, বালিয়া, দশমাইল বিন্দোল, বড়ুয়া, মহারাজা, ইটাহার ব্লকের পালইবাড়ি, কেওটাল, অভিনগর, হেমতাবাদ ব্লকের কলুয়া, কালিয়াগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুরের বেশকিছু গ্রামে। FIAM seed diversity conservation centre -এর মূল কাজকর্ম চলে হাতিয়া গ্রামে এবং কিছুটা বালিয়া মৌজায় ও শুরু হয়েছে।

FIAM-এর বিভিন্ন কাজকর্ম সুস্থায়ী কৃষি ও পরিবেশ নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম 'উত্তর-দক্ষিণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বেশ কিছু বই ও বুকলেট ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। কৃষিকাজ যেহেতু অর্থনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত তাই জৈব চাষ করে একটি পরিবার কিভাবে সচ্ছলভাবে ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে তা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে FIAM। এক্ষেত্রে সমুদ্রমন্থনের সময় মহাদেব যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো এই সংস্থা সেই ভূমিকা পালন করছে প্রতিনিয়ত। অর্থাৎ কোন নতুন জিনিস আগে কখনোই চাষিদের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হয়না। বর্তমানে FIAM স্বপ্ন দেখে অসংখ্য ছোট ছোট স্বনির্ভর গ্রাম, কৃষি মানুষ এবং বাস্তুতন্ত্রে বৈচিত্র সংরক্ষণ এর কর্মযজ্ঞ, কৃষি পাঠশালা রূপায়ণ যেখানে অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কৃষি মানুষদের থেকে কৃষিজ্ঞান সঞ্চারিত হবে নতুন নতুন কৃষি মানুষদের মধ্যে, FIAM-র উৎপাদন বিপণনের মঞ্চ 'চাষীঘর'কে আরো সংগঠিত ও নিয়মিত করে উৎপাদক ও ভোক্তাদের পাশে থাকবে।

বীজ সংরক্ষণ ও বীজ ব্যাঙ্ক :

বীজ সংরক্ষণ দিয়েই আমাদের প্রথম পথ চলা শুরু হয়, শুরু হয় দেশি ধান বৈচিত্র সংরক্ষণ কর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের বীজ ব্যাংক বানানোর স্বপ্ন দেখা। প্রথম বছর চারটি দেশি ধানের জাত সংগ্রহ-সংরক্ষণ, দ্বিতীয় বছর ১৪ টি ধান চাষ, তৃতীয় বছর ২৫ টি এইভাবে ৫০ -১০০ -১৫০ করে ৫০০, আস্তে আস্তে পরিচয় হয় ডঃ অনুপম পাল, সমীক ব্যানার্জি, কৃষ্ণপ্রসাদ গোবিন্দ, জ্যাকব নালিথ্রামন, অভ্র চক্রবর্তী, ভৈরব সাহানি প্রমুখ মানুষের সাথে যারা FIAM-এর বীজ বৈচিত্র সম্ভার গড়ে তোলার পেছনে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা করেছে। ডঃ অনুপম পাল প্রতিনিয়ত অভিভাবকের মতো আমাদের সংরক্ষণ ও বিস্তারের কাজে সহযোগিতা করেছেন। বর্তমানে FIAM-এর সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় অসংখ্য দেশি প্রজাতির ও তাদের জাত সংযুক্ত হয়েছে। রায়গঞ্জ ব্লকের হাতিয়া গ্রামে গড়ে উঠেছে FIAM Seed Diversity Conservation Centre। বর্তমানে এখানে যে ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠেছে তার চিত্র তুলে ধরা হলো —

FIAM এর বীজ বৈচিত্র :

ফসল	ফল	ধান	গম/যব	ডাল	তৈলবীজ	সব্জী	শাক	কন্দ
প্রকার	১৮	৪৩০	৪৫	১২	১৫	৩০	১৩	১০

বীজ বিনিময় ও বিপণন:

বীজ বৈচিত্র যত বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যাবে তত বেশি বীজ বৈচিত্রের প্রাচুর্য ঘটবে। FIAM প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল চাষী বীজে স্বনির্ভর হবে। মাত্র কয়েক দশক আগের কথা অর্থাৎ ১৯৬০ সালের আগে ভারতে একটিও বীজ কোম্পানি ছিলনা এবং ১৯৫০ সালের আগে পৃথিবীতে কোন বীজ কোম্পানি ছিল না অথচ পৃথিবীতে বৈচিত্রের প্রাচুর্য ভরপুর ছিল কেমন করে? আসলে বীজ কোম্পানি গুলো আসার পরে একদিকে যেমন সরকারি ও বেসরকারি মদতে মনো ক্রপিং করতে লাগলো অন্যদিকে কৃষকরা বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এর অভ্যাস ভুলে যেতে লাগলো। আমরা প্রথমে দেশি বীজ ছড়িয়ে দেবার জন্য বীজের দত্তক প্রথা চালু করি। এই ব্যবস্থার পদ্ধতি ছিল এটাই যে যদি কোন কৃষককে বীজ দেওয়া হয় এবং কৃষকরা সেই বীজ নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে তবে তার দাম নেয়া হবে না। তবে ফসল উঠলে সম পরিমাণ বা তার থেকে বেশি বীজ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কয়েক বছর এরকম চালানোর পর ঠিক করা হয় বহুজাতিক যদি বীজ বিক্রি করতে পারে তবে কৃষকরা নয় কেন? শুরু হয় বীজ দত্তক ও বিনিময়ের সাথে বীজ বিপণন। বিপণনের লক্ষ ছিল যত বেশি পরিমাণ কৃষি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, কৃষকরা যাতে চাষের আগে, আগের বছরের বীজ বিক্রি করে চাষের খরচ কিছুটা তুলে নিতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে সংরক্ষণ যাতে করে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আমরা মনে করি বহুজাতিক এর বিকল্প যদি কোন ব্যবস্থা না তৈরি করা যায় তবে স্লোগান দিয়ে কোন লাভ নেই। সে ব্যবস্থাপনা যত ছোটই হোক না কেন। ধরা যাক এই কাজের জন্য আমন মরসুমে ৫০০ চাষি তার দুই হাজার বিঘা জমিতে দেশি ধান চাষ করল তাহলে (২০০০×৫)=১০০০০ কেজি অর্থাৎ ১০ টন বীজের বাজার বীজ কোম্পানি হারালো যার বাজার দর নেহাত কম নয়। নিচে ২০২০ সালে শুরু ফিয়ামের বীজ হস্তান্তরের চিত্র তুলে ধরা হলো—

অচাষকৃত ফসল ও তার বিপণন (Uncultivated food and marketing) :

আমাদের কাজকর্ম এবং 'চাষি ঘরে'র বিপণনের একটা অন্যতম দিক হলো অচাষকৃত ফসল সম্ভার চিহ্নিতকরণ এবং তার বিপণন ব্যবস্থা করে চাষীদেরকে সহযোগিতা করা। যে জিনিসটা গ্রামে অবিক্রিত বা খুবই সামান্য দাম অথচ সেগুলি পারিবারিক পুষ্টি চক্রের অন্যতম অংশ এবং অবশ্যই যাদের খাদ্যগুণ খুবই উচ্চ মানের, সেগুলি চাষিদের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে সংগ্রহ করে বিপণনের ব্যবস্থা করা। যেমন ধরুন FIAM এর এক সদস্য চাষি বিজয়চন্দ্র বর্মন এর বাড়িতে চারটি বেল গাছ আছে এবং মোট প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ পিস বেল ধরে। তিনি স্থানীয় পাইকারকে এতদিন ৮০০-১০০০ টাকায় বিক্রি করে দিতেন কিন্তু এখন তা অনেক বেশি দামে বিক্রি করতে পারছেন। এতে করে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে গ্রামের কৃষকেরা তাদের বাড়ির মান কচু, মৌ শিম, লাউ, কুমড়ো, নারকেল, আতাফল, সীতাফল, মোচা থেকে শুরু করে অসংখ্য জিনিস পারিবারিক ভোগের পর 'চাষী ঘরে'র মাধ্যমে বিপণন করা সম্ভব হচ্ছে।

FIAM এর বর্তমান কার্যক্রম যেগুলি চলছে :

১. FIAM SEED DIVERSITY CONSERVATION CENTRE এবং সদস্য কৃষিমানব কৃষি মানবীদের নিয়ে হাজারো দেশজ বীজের সংরক্ষণ।
২. নতুন নতুন চাষিদের মধ্যে দেশি বীজের বিনিময় এবং বন্টন।
৩. জৈব পদ্ধতিতে কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থাপনা।
৪. প্রতি কৃষি মরসুম এর আগে নতুন ও পুরনো কৃষকদের মধ্যে ট্রেনিং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করানো হয়। বেশির ভাগটাই হয় হাতে কলম।
৫. কৃষি মানুষদের ঘরে ঘরে জৈব সার উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া।
৬. ঘরে ঘরে দেশি গরু প্রতিপালন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।
৭. প্রতিটি ফসল চাষ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সরাসরি মনিটরিং করা।
৮. দুধ ও দুগ্ধজাত উৎপাদনের সাথে সাথে হাঁস মুরগি প্রতিপালন এবং ছাগল প্রতিপালন।
৯. বিভিন্ন প্রজাতির দেশজ বীজ নিয়ে সিড ব্যাংক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সিড ব্যাংকে একসাথে এত বৈচিত্রের বীজ দেখার সুযোগ পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই।
১০. মহিলা কৃষাণীদের নিয়ে গৃহভিত্তিক সবজির বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ বিপণন এবং তাদের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তিস্থাপন।

FIAM-এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

I. কৃষি পাঠশালা নির্মাণ ও সক্রিয়ভাবে সচল রাখা। যে ব্যক্তি হেডমাস্টার হবেন তিনি FIAM এর একজন কৃষক। যেখানে জৈব চাষের পদ্ধতি ও কৌশল শেখাবে FIAM এর অভিজ্ঞ চাষীরা। যার পাঠক্রম তৈরি করবে কৃষকরা নিজেরা সভা করে। সেই প্রক্রিয়া যদিও চালু হয়ে গেছে।
II. বছরে তিনবার নির্দিষ্ট সময় ধরে খুবই সামান্য খরচে ন্যাচারাল ফার্মিং কোর্স চালু করা এবং চাষীদের কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কোন কোর্স ফ্রি নেওয়া হবে না।
III. সয়েল টেস্টিং ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলা যেখানে স্থানীয় কৃষকরা সহজেই মাটি পরীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট (ph, temparature, N.P.K, C.N Ratio) ইত্যাদি করতে পারে।

আমাদের দাবি

১. দেশিবীজ কে সরকারিভাবে জার্মিনেশন টেস্ট করে সরকারি সার্টিফিকেশনের আওতায় নিয়ে আসা। বর্তমানে দেশী বীজকে T.L seed হিসেবে গণ্য করা হয়।
২. কৃষিক্ষেত্রে GM SEED কে কোন ভাবেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। প্রসঙ্গত বলে রাখি আজ পর্যন্ত কোন GMO Variety আবিষ্কৃত হয়নি যার উৎপাদনশীলতা Non GMO Variety থেকে বেশি।
৩. সরকারিভাবে ফসল বীমা করার নীতি ও পদ্ধতি সহজ গতিশীল করতে এবং বাস্তব ক্ষয়ক্ষতি GSP/GIS software এর মাধ্যমে বিচার করে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৪. কৃষিক্ষেত্রে ঘাসমারা বিষ শুধু গ্লাইকোসাইড, প্যারাকায়েট নয় বাজার চলতি অন্যান্য যাদের ক্ষতিসাধন করার ক্ষমতা আরও বেশি তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।
৫. এলাকা ভিত্তিক ফসল বৈচিত্র টিকিয়ে রাখতে জেলা স্তরে উপকৃষি অধিকর্তার নেতৃত্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৬. দেশে প্রতিবছর দু লক্ষ কোটি টাকারও বেশি রাসায়নিক সার ভর্তুকি দেওয়া হয়। জৈব চাষিরা যেহেতু জল মাটি বাতাস তথা সামগ্রিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করে চলে তাই তাদের জৈবচাষে ভর্তুকি রাসায়নিক চাষ থেকে মাথাপিছু আরো বেশি দিতে হবে।
৭. জৈব চাষের উৎপাদিত ফসলের সরকারিভাবে শংসাপত্র প্রদান ও ধারাবাহিক মনিটরিং করতে হবে এবং সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশি উচ্চমানের কিন্তু তা সহজ ও গতিশীল করতে হবে।
৮. প্রতিটি জেলা সদরে একটি সরকারি বাজার বা আদর্শ স্থান যেখানে জৈব চাষীদের বিপণনের জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে এরকম ব্যবস্থাপনা চলমান।
৯. খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে সরকারি দপ্তরগুলিতে আরো বেশি সতেজ হতে হবে।
১০. ধানের নাড়া পোড়ানো বন্ধ করার সঠিক ব্যবস্থা।

"গত এক দশকে রাজনৈতিক হিংসার চরিত্রে গুণগত বদল ঘটেছে। রামপুরহাটের বগটুইতে-তে যা ঘটেছে তা আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবনমন। এই পরিস্থিতি তখনই ঘটে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের মধ্যে যখন কেন্দ্রীয় স্থান নেয় অর্থ।"

"আমরা কবিতা নিয়ে সাহিত্য নিয়ে পার্বণ করি, মঞ্চ আলো করে বসে থাকেন গুণীজনরা। আমরা হাথরস, আরা পিপারিয়া ঝুনুঝুনু নই। আমরা গোধরা নই। শোনা যায়, বগটুই এর নিহতরা মৃত্যুর আগে, পুড়ে মরার আগে পুলিশি সাহায্য চেয়েছিল। পায়নি। পুলিশ আসতে পারেনি।"

—অনিতা অগ্নিহোত্রী

ছত্রিশগড়ের বস্তার আজও অন্ধকারে

অন্তরা ঘোষ

১

বস্তার ডিভিশনের সুকমা ও বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা এলাকা জোন্নাগুড়া। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর এসেছে কমাণ্ডো ব্যাটেলিয়ন ফর র‍্যাপিড অ্যাকশন'এর (CoBRA) কাছে যে, মাওবাদীদের গেরিলা বাহিনীর ব্যাটালিয়ন, নাম্বার ওয়ানের লিডার হিড়মা এই জঙ্গলে তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। হিড়মা একজন দুর্ধর্ষ মাওবাদী নেতা ও দক্ষিণ বস্তারের অনেক মাওবাদী হামলার মাস্টারমাইন্ড। যার জন্য সরকারি তরফ থেকে ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। অপারেশনের জন্য পুরোপুরি তৈরি হয়ে STF, CRPF, DRG, কোবরা কমান্ডো, বস্তার ব্যাটেলিয়ানের প্রায় পনেরোশ নিরাপত্তা বাহিনী এগিয়ে চলে সীমান্তবর্তী জঙ্গলের উদ্দেশ্যে। সুকমা ও বিজাপুর সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মধ্যে দিয়ে সেদিন সকালে যেতে যেতে তারা লক্ষ্য করে যে গ্রামের ঘরগুলো একেবারে ফাঁকা। টেকালগুড়া গ্রামে যখন তারা পৌঁছয় তখন দেখে চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ থমথমে পরিবেশ। যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। শুধুমাত্র গ্রামের ঘরগুলোর কাছে কাছে কিছু গৃহপালিত পশু রয়েছে যাদের ডাক শোনা যাচ্ছে। এরাও যেন বিপদের ইঙ্গিত পেয়েছে। ঠিক যেমন ভূমিকম্প হওয়ার আগে প্রাণীজগৎ বুঝতে পারে অনেকটা তেমনই। তখনই একটু সন্দেহ জাগে নিরাপত্তা কর্মীদের মনে যে, কিছু একটা গন্ডগোল আছে। কিন্তু তখন তারা অনেক দূর চলে এসেছে। প্রায় পাহাড়ের উপর উঠে কাউকে না পেয়ে তারা যখন দুপুরবেলা পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করে তখন ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে দেখে যে মাওবাদীরা পাহাড়ের নিচে ইউ শেপে তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। নিরাপত্তা কর্মীরা বুঝতে পারে যে, তারা ফেঁসে গেছে এবং হিড়মার এখানে থাকার যে খবরটা তারা পেয়েছিল সেটাও আসলে মিথ্যে খবর ছিল। কিন্তু তখন তারা চক্রব্যূহ এর মধ্যে পড়ে গেছে। ফেরার পথ নেই, জীবন বাজি রেখে লড়াই করে যেতে হবে। পাহাড় থেকে নামার সময় পাহাড়ের উপর থেকে মাওবাদীদের ব্যাটেলিয়ান ওয়ান বাহিনী ফায়ারিং শুরু করে। আর্মিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পাহাড়ের নিচে নামতে থাকে। কিন্তু তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাহাড়ের নিচে থেকে মাওবাদীরা গুলিবর্ষণ করে। নিরাপত্তা কর্মীরাও মরিয়া হয়ে লড়তে থাকে। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে মাওবাদী ও নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয় শুধু গুলি-বোমার আওয়াজ। টেকালগুড়াতে গ্রামবাসীদের খালি ঘরগুলোতে নিরাপত্তা কর্মীরা যখন নিজেদের বাঁচাতে ঢুকে পড়ে তখন আগে থেকেই মাওবাদীরা ওই ঘরগুলোতে লুকিয়ে ছিল। অর্থাৎ সমস্ত গ্রামবাসীদের আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের ঘরগুলিতে নিরাপত্তা কর্মীরা জীবন বাঁচাতে ঢুকতে গেলে মাওবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারায়। পাথরের পিছনে গাছের তলায় সব জায়গায় আগে থেকে মাওবাদীরা লুকিয়ে ছিল। নিরাপত্তা কর্মীরা নিজেদের বাঁচাতে সেসব জায়গায় গেলে মাওবাদীদের গুলিতে তাদের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইউপিজিএল, রকেট লঞ্চার, ইনসাস, একে ফরটিসেভেন এর মত অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার করে মাওবাদী গেরিলা বাহিনী। ২২ জন কমাণ্ডো নিহত হয়, ৩১ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়। মৃত সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র পোশাক জুতো ওয়াকিটকি সব লুট করে নিয়ে যায় মাওবাদীরা। পড়ে থাকে তো শুধু রক্তাক্ত মৃত শবদেহগুলি। নিরাপত্তা কর্মীদের রক্তে লাল হয় বস্তারের মাটি।

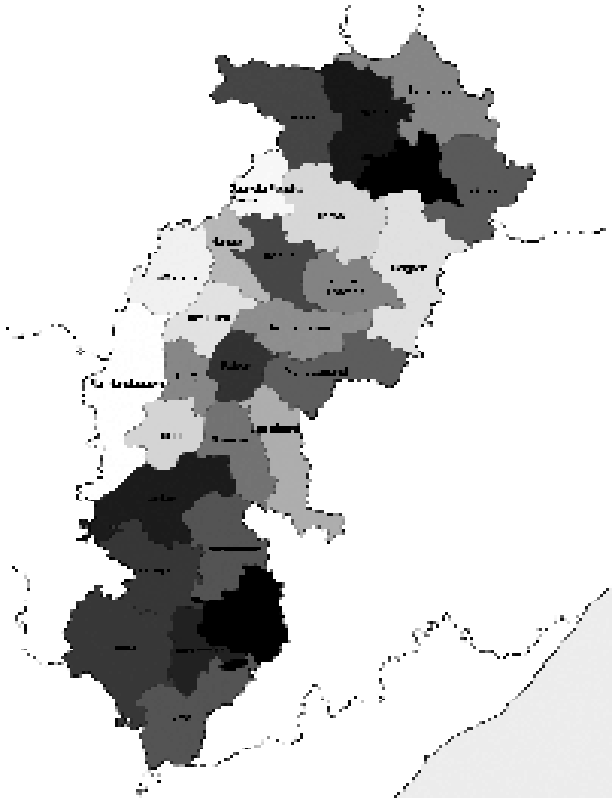

ছত্তিশগড় রাজ্য ও বস্তার ডিভিশনের ম্যাপ

এটি গত বছরের ২ এপ্রিলের ঘটনা। বারবার এইভাবে মাওবাদী আর কমাণ্ডোদের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হয়েছে বস্তার। ছত্তিশগড়ের সাত জেলা যথাক্রমে বস্তার, কোডাগাঁও, নারায়নপুর, সুকমা, দন্তেওয়াড়া, জগদলপুর ও কাঙ্কের নিয়ে এই বস্তার ডিভিশন, যা মাওবাদী বা মাওবাদী অঞ্চল নামে খ্যাত। অবুঝমারকে কেন্দ্র করে পাহাড় দিয়ে

ঘেরা ঘন অরণ্যে চলে তাদের শাসন। এখানে কোন সরকারি পরোয়ানা কাজ করে না, ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের কোন রকম প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এখানে চলে না। ছত্তিশগড়ের রেড করিডোর হচ্ছে এই জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলগুলো, যেখানে মাওবাদীদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি ভিতরে যেতে পারে না। অবুঝমারের ভিতরে চার হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, গভীর জঙ্গল ও আদিবাসীদের গ্রাম। এই অঞ্চলের সরকারিভাবে কখনও সার্ভে হয়নি। এই পিছিয়ে পড়া আদিবাসী এলাকাগুলোতে সরকারি উদাসীনতার জন্য কোনরকম উন্নয়ন হয়নি—যার সুযোগ নেয় মাওবাদীরা। এখন এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মাওবাদীর জনতনা সরকার চলে। অবুঝমার এলাকায় ঢুকলেই গাছের গায়ে নির্দেশনামা দিয়ে গাছের সঙ্গে আটকানো মাওবাদীদের কাগজ চোখে পড়বে; যেখানে জল, জঙ্গল, জমির উপর শুধুমাত্র আদিবাসীদের অধিকারের কথা ও নানান রকম নির্দেশাবলী লেখা আছে। অবুঝমারের ভিতরে গভীর জঙ্গলে ঢোকার দুঃসাহসিকতা দেখানো মানে মৃত্যুকে সমাদর করে ডেকে আনা। কোথায় যে মাটির তলায় ল্যান্ডমাইন বা প্রেসার বম্ব লুকোনো আছে তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। পা পড়লেই সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এই চার হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় রয়েছে প্রায় ৩৮ হাজার আদিবাসী। কেমন আছে এই আদিবাসীরা? মাওবাদীদের দাবি যে তারা এই আদিবাসীদের দেখাশোনা করে। কতটা ভালো আছে এই পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষগুলো?

দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এই মানুষগুলোর একদিকে মাওবাদী আর অন্যদিকে পুলিশের রক্তচক্ষুর মাঝে পড়ে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। গ্রামগুলিতে কোথাও কোথাও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নেই। কোথাও আবার দু'কিলোমিটার দূর থেকে জল আনতে হয়। কোথাও কোথাও আরো দূর থেকে জল আনতে হয়। উন্নয়নের ছিটেফোঁটা নেই। সরকার থেকে রাস্তা বানানো বা কোনরকম উন্নয়নের চেষ্টা করা হলে মাওবাদীরা আবার তাতে প্রবলভাবে বাধা দেয়। যেটুকু যা সবজি উৎপাদন করে বা জঙ্গলে তেন্দু পাতা সংগ্রহ করে বিক্রি করে গরিব মানুষগুলো যতটুকু লাভ করে তার একটা অংশ মাওবাদীদের দিতে হয়।

কখনও পুলিশ, মাওবাদী সন্দেহে মা-বাবার থেকে তার সমর্থ জোয়ান ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে থানায় টর্চার করে মেরে দিচ্ছে আবার কখনও মাওবাদীরা পুলিশের চর সন্দেহে কোন আদিবাসীকে জনতার আদালতে গাছের সঙ্গে বেঁধে পাথর মেরে নৃশংস ভাবে খুন করছে। ফলে মাওবাদী ও পুলিশদের মাঝে পড়ে আদিবাসীদের জীবনধারণ করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

২

বস্তারে মাওবাদী আন্দোলনের উৎপত্তি ও চরিত্র জানতে গেলে বস্তারের আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু ওয়াকিবহাল হতে হবে। চারদিকে পাহাড় ও ঘন জঙ্গলে ঘেরা অনেক গ্রামে আদিবাসীরা এখনো নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এখনো গিয়ে পৌঁছয়নি বস্তারের ঘন গভীর জঙ্গলের মধ্যে গ্রামগুলিতে। বস্তারের আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম আজও বনজ উৎপাদন ও কৃষিকাজ। ব্রিটিশ আমল থেকেই এই আদিবাসীদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হত সম্পূর্ণ বনজ দ্রব্য সামগ্রী যেমন তেন্দু পাতা সংগ্রহ, মহুয়া সংগ্রহ, ফলমূল ও শিকার এবং অল্পবিস্তর জমিজমার ওপর। জঙ্গলে কিছু অংশ কেটে সেই জায়গাটা পুড়িয়ে সেখানে একসাথে অনেকগুলো ফসল একই জায়গায় চাষ করে আদিবাসীরা যাকে বলা হয় পেডা ক্ষেতি। এটা অনেকটা ঝুম ফার্মিং এর মতন। জল জঙ্গল জমি এটুকুই গ্রামবাসীদের সম্পদ। এর ওপরেই তাদের দৈনন্দিন জীবন চলে।

সরল নিরক্ষর আদিবাসীরা জমিদার মহাজন জোতদারদের দ্বারা বারবার শোষিত ও প্রতারিত হত। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কি এই সভ্য সমাজ থেকে দূরে গভীর অরণ্যে ভরা গ্রামগুলিতে আদিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে? সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা শহরের মঞ্চে বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন যে তারা বস্তার ডিভিশনের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছেন। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছেন, তাদের শিক্ষা জীবিকার সবন্দোবস্ত করেছেন, তাদের আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতে হয় না।

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা একেবারে বিপরীত। জেলা শহরগুলির আশেপাশে গ্রামগুলিতে সরকারি সাহায্য পৌঁছালেও অবুঝমারের ঘন জঙ্গলের ভেতর বহু গ্রামে সরকারি সাহায্যের আশ্বাসনটুকু পৌঁছানোর আগেই তার অপমৃত্যু ঘটে। বস্তারের স্থানীয় রিপোর্টার বিকাশ তিওয়ারি বস্তারের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যান রিপোর্টিং করে সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আদৌ কী দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ঘটেছে? অবুঝমারের কুতুল গ্রাম যাকে বলা হয় মাওবাদীদের গড় বা রাজধানী—চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা এই গ্রামে আসার পাহাড়ি পথ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এখানে ব্যাপারীরা নারায়ণপুর থেকে আসে গ্রামের গরিব আদিবাসীদের থেকে ফসল কিনতে। যেখানে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয় গরিব মানুষদের থেকে ২৫ টাকা কিলো চাল সরকার কিনবে সেখানে এই ব্যাপারীরা গরীব মানুষগুলোকে ঠকিয়ে মোটা চাল কেনে ১১ বা ১২ টাকা কিলো আর ফাইন চাল কেনে ১৫ টাকা কিলো। এছাড়া ডাল, মক্কা, রাই, সরষে, আমলা, খোদো কুটকি, কালা কসড়া, সফেদ কসড়া ইত্যাদি সবই অনেক কম দামে গ্রামবাসীরা ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই ব্যাপারীরাই শহরে গিয়ে দ্বিগুণের বেশি দামে এই কৃষিজ ও বনজ দ্রব্য বিক্রি করে। তার কারণ গ্রামবাসীদের জমির পাট্টা না থাকায় সরকার এদের কাছ থেকে চাল বা কৃষিজ দ্রব্য কেনে না। গ্রামবাসীদের কথায় তারা বহু অনুনয়-বিনয় করেছে ব্যাপারীদের যে সরকারি রেটে না হোক আর একটু বেশি দামে যেন তারা ফসল ক্রয় করে। কেননা গত ৭/৮ বছর ধরে একই

দামে তারা ব্যাপারীদের কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ শোষণের ব্যাপারটা একই রয়ে গেছে। ইংরেজ আমলের জমিদার মহাজনরা গরিব মানুষদের শোষণ করতো আর এখন ব্যাপারীরা করে। এই সরল আদিবাসীদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড অবধি নেই। এরা কখনো ভোট দেয়নি। বিধায়ক ও সরপঞ্চকে এরা চোখে দেখেনি। বিধায়কের তরফ থেকেও গ্রামের উন্নতি করার চেষ্টা দেখা যায় না। কেননা এই গরীব আদিবাসীদের ভোট ছাড়াই তিনি বিধায়ক হয়ে যাচ্ছেন। যেহেতু এদের আধার কার্ড নেই এরা ভোট দেয় না তাই সরকার থেকেও এই গ্রামগুলিতে সবরকম উন্নয়নের জন্য কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। এখানে ব্যাপারীরাই সরকার। অবুঝমারের গভীর জঙ্গলে আরো একটি গ্রাম হলো 'তোকে'। এখানে এখনো রাস্তা তৈরি হয়নি। পাহাড়ি পথ ঘুরে ঘুরে গ্রামে পৌঁছানো যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এই গ্রামে দেড়শোর উপর বাচ্চা স্কুলে যায় না। কোন কোন বাচ্চার পরনে স্কুলড্রেস চোখে পড়বে কিন্তু তারা স্কুল যায় না। গ্রামবাসীরা জানায় যে এখানে একটা আশ্রম (বিদ্যালয়) ছিল। কিন্তু সেই আশ্রম উঠে গেছে। সরকারি পক্ষ থেকে বলা হয় যে মাওবাদীরা নাকি বিদ্যালয়ের সব জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয়। এখানে কোন বিদ্যালয় চালানোর পরিস্থিতি নেই তাই এখান থেকে বিদ্যালয়টি সরিয়ে নারায়ণপুরে করা হয়।

গ্রামবাসীদের কথায় এখানে আশ্রমের (বিদ্যালয়ের) জিনিস এখনো পড়ে আছে। পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা মিথ্যে। অর্থাৎ মাওবাদী বিষয়টি কোথাও কোথাও এক বাহানাও বটে। নারায়ণপুর যেতে দুদিন লাগে। গ্রামের ছোট বাচ্চাদের পক্ষে দুদিন পায়ে হেঁটে গিয়ে ক্লাস করা সম্ভব না। তাই তারা বাধ্য হয়ে নিরক্ষরতার জগতকেই বেছে নিয়েছে। এই গ্রামে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল নেই। হাসপাতাল রয়েছে এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। কেউ হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হলে বা গর্ভবতী মহিলাকে খাটে করে শুইয়ে পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানকার ফসল ও বনজ দ্রব্য বিক্রি করার জন্য পায়ে হেঁটে যেতে হয় অনেকটা পথ।

সোনি সোরি

অবুঝমারের গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত বেশিরভাগ গ্রামগুলিতে রাস্তাঘাট অত্যন্ত খারাপ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, কোথাও কোথাও স্কুল নেই, জল আনতে হয় গ্রাম থেকে বহু দূরের কোন নল থেকে। কোন গ্রামে টিউবয়েল নেই, আবার কোন গ্রামে টিউবয়েল থেকেও অকেজো। সরপঞ্চ গ্রামে থাকে না, সারাবে কে? এমনকি এদের আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড নেই। কোন কোন গ্রামে ভোটের স্বার্থে ভোটার কার্ড করা হয়েছে কিন্তু এদের হাত ধরে ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপে দেওয়া হয় এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অনেক গ্রামে গ্রামবাসীদের ভোট দিতে অনীহা অথচ বাধ্য হয়ে দিতে হয়। কারণ ভোট না দিলে সরকার পক্ষ থেকে কোন রকম সুযোগ-সুবিধা দেবেনা বলা হয়। আবার ভোট দিলে মাওবাদীদের রোষানলে পরতে হয়। অর্থাৎ আদিবাসীদের শাঁখের করাতের মতো অবস্থা।

বস্তার ডিভিশনে ৪২ রকমের আদিবাসীদের বসবাস। তার মধ্যে গোণ্ড, অবুঝমারিয়া, ভাতরা, হালকা, ধুরবা, মুরিয়া, বাইসন হর্ন মারিয়া, দেরিয়া, ডানডামি মারিয়া, ডোরলা প্রধান। স্থানীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হালবি, ভাতরি ও গোণ্ডি।

৩

দরিদ্র আদিবাসীদের পুলিশকে সমর্থন না করার একটা অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে যেসব গ্রামের কাছে পুলিশ ক্যাম্প আছে সেখানে ক্যাম্প থেকে মাঝে মাঝে পুলিশ গ্রামে গিয়ে মাওবাদী সন্দেহে নিরীহ গ্রামবাসীকে তুলে এনে জেলে ভরে দেয়। অনেক সময় মেরেও ফেলা হয়। মাওবাদী অপবাদ দিয়ে অনেক মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়। এই সমস্ত অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে গ্রামের আদিবাসীরা মনে করেন মাওবাদীরই আত্মরক্ষার উপায়।

স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প ও মাওবাদীদের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ বস্তারের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীরা সংঘটিত হয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। যেমন **গুংপার আন্দোলন**। এখানে বেশ কিছু গ্রামবাসীকে মাওবাদী সন্দেহে মারা হয়, মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। মেরে ফেলা হয়। নয়তো মাওবাদী তকমা দিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হয়।

বস্তারের বিভিন্ন আন্দোলনের নেতৃত্ব যিনি দেন সেই মানবাধিকার কর্মী ও আম আদমি পার্টির আদিবাসী নেত্রী সোনি সোরি এখানেও আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন। সোনি সোরি কিভাবে একজন শিক্ষিকা থেকে আদিবাসীদের আন্দোলনের নেত্রী হয়ে উঠলেন সে কাহিনিও চমকপ্রদ। সোনি সোরি ছিলেন দান্তেওয়াড়া জেলার একটি মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলের সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ও আবাসিক প্রধান। মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই সন্দেহে পুলিশ ২০১১ সালে সোনি সোরিকে গ্রেপ্তার করে তার নামে বিভিন্ন ধারার কেস দেয়। তিন বছর তিনি জগদলপুর, রায়পুর, কলকাতা ও তিহার জেলে কাটান। জেলে তার ওপর অমানবিক অত্যাচার করা হয়। তাকে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হতো, যখন তখন বিবস্ত্র করা হতো। এমন কি গুপ্তাঙ্গে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, পাগল সাজাবার চেষ্টা হয়। তবুও তিনি ভেঙে পড়েননি। আইনের প্রতি আস্থা রেখে লড়ে গেছেন। তার স্বামীকেও গ্রেফতার করা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে

পুলিশের অত্যাচারে তার স্বামী মারা যান। তিনি জেলের কয়েদিদের দুর্বিষহ জীবনযাত্রা নিজের চোখে দেখেছেন, প্রতিবাদও করেছেন। গ্রামের অনেক আদিবাসী মহিলা ও নাবালিকা মেয়েকে মাওবাদী সন্দেহে তুলে এনে জেলে ভরা হয়েছে। তারপর তাদের উপর চলেছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। অনেক মহিলাই অত্যাচারের দরুন শারীরিক বিকৃতির জন্য জেল থেকে বেরোবার পর পরিবারে ফিরে না গিয়ে বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে মাওবাদী হওয়ার কথা ভেবেছেন। সোনি সোরি বুঝিয়েছেনে যে লড়তে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে।

শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হয়েছে। তিন বছর জেলে থাকার পর সোনি সোরি মুক্তি পেয়েছেন। যদিও পরিবার-পরিজন ততদিনে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। স্বামী মারা গেছেন। তবুও তিনি মনোবল হারাননি। সোনি সোরির কথায় তার হারাবার মতো কিছু নেই। জেলে যেতেও তিনি আর ভয় পান না। তাই যেখানেই অন্যায় অবিচার ধর্ষণ বা গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের কথা শোনেন তিনি সেখানে ছুটে যান। গ্রামবাসীদের বেশিরভাগ আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

গুংপার আন্দোলনের সংবাদ কভার করতে স্থানীয় সাংবাদিক বিকাশ তিওয়ারি গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত গুংপার যান। ২৭ দিন ধরে আদিবাসীদের প্রতিবাদ চলছিল। মঞ্চ করে গুংপার এবং আশেপাশের যেসব গ্রামবাসীদের মাওবাদী সন্দেহে পুলিশ হত্যা করে বা মহিলাদের ধর্ষণ করে তাদের জন্ম মৃত্যু তারিখ লিখে ছবি দিয়ে মঞ্চে রাখা হয়। নরসংহার বন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ এই আন্দোলন। সোনি সোরি মঞ্চে বসেছিলেন। তার কাছ থেকেই জানা যায় মাড়কম হিড়মে নামে একটি কম বয়সী মেয়ের ধর্ষণ ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর কথা। মেয়েটির বিয়ের পর বাপের বাড়ি এসেছিল বিয়ের কিছু রীতি রেওয়াজ পূরণ করতে। তার মায়ের সাথে ঘরে শুয়ে ছিল সে। সোনি সোরির কথা অনুযায়ী ডিআইজি পুলিশ এসে মেয়েটিকে ঘর থেকে টেনে বার করে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে। তারপর মাঠের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। তারপর নকশালদের পোশাক পরিয়ে তাকে ফেলে রেখে যায়। মেয়েটির মা সুপ্রিমকোর্ট অবধি গিয়ে লড়ছে। এরকম অনেককে মাওবাদী সন্দেহে হত্যা করা হয়। তাদের ছবিগুলো দেখলে সত্যি চোখ ভিজে আসবে।

কিছুদিন আগে সুকমা ও বিজাপুরের সীমান্তবর্তী জায়গায় **সিলগের আন্দোলনে** জমায়েত হয় হাজার হাজার গ্রামবাসী। আন্দোলনের কারণ সেখানে সিআরপিএফের পুলিশ ক্যাম্প বসবে এবং রাস্তা তৈরি হবে। গ্রামবাসীদের দাবি এখানে কোন পুলিশ ক্যাম্প বসানো যাবে না। কারণ পুলিশরা গ্রামে এসে মাঝেমাঝেই আদিবাসীদের উত্যক্ত করে, মাওবাদী সন্দেহে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে কাউকে হত্যা করে, কাউকে জেলে ভরে অত্যাচার করে, মহিলাদের ধর্ষণ করে।

রিপোর্টার বিকাশ তিওয়ারি গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে। গ্রামবাসীরা জানায় তাদের আরও দাবি আছে যে তাদের গ্রামগুলিতে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রেশন দোকান, পুকুর কিছুই নেই। এমনকি গ্রামসভাও নেই। অনেকের আধার কার্ড নেই। গ্রামবাসীদের দাবি কার্ড করাতে গেলে তাদেরকে মাওবাদী সন্দেহে জেলে ভরে দেয়।

বিকাশ তিওয়ারি তাদের বলেন যে তারা রাস্তা তৈরি করতে বাধা দিচ্ছে কেন। গ্রামগুলিতে উন্নয়ন ও বিকাশ করতে গেলে রাস্তা তৈরি অনিবার্য। গ্রামবাসীরা বলে তাদের রাস্তা তারা নিজেরাই তৈরি করবে। সিআরপিএফ এর তরফ থেকে বলা হচ্ছে আসলে মাওবাদীরা গ্রামবাসীদের সামনে এগিয়ে দিয়ে রাস্তা তৈরি বন্ধ করতে চাইছে। কেননা রাস্তা হওয়া মানে তা মাওবাদীদের জন্য বিপদ। তারা যখন তখন যাতায়াত করতে পারবেনা গ্রামগুলিতে।

এটাও দেখা গেছে যতবারই রাস্তা তৈরি চেষ্টা হয়েছে মাওবাদীরা কোনো না কোনোভাবে সেই রাস্তা তৈরির উপকরণগুলো লুটেছে ও রাস্তা নির্মাণ বানচাল করেছে। সেই জন্যই ক্যাম্প তৈরি করে সড়ক নির্মাণের কথা সরকার থেকে ভাবা হয়েছে।

সোনি সোরির কথায় জানা যায় যে তারবল্লা গ্রামে ২০১৯ এর ৭ই ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসীদের কিছু উৎসব চলছিল। সেই সময় পুলিশ ফোর্স চারদিক থেকে ঘিরে গুলি চালায়। মহিলাদের পায়ে গুলি মারে। তারপর নিষ্ঠুরতার সাথে তাদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হয় তারা মাওবাদী এই অপবাদ দিয়ে। গ্রামের সাধারণ নিরীহ মানুষকে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে হত্যা করা হয়। সোনি সোরি বলেন যে এরা কেউই মাওবাদী ছিলেন না।

শুধু সোনি সোরি নয় আরও একজন সমাজসেবী বেলা ভাটিয়া সব সময় আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন হলেই তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন ও প্রতিবাদ করেছেন। সমাজসেবী হিমাংশু কুমার দান্তেওয়াড়ায় ২২ বছর কাজ করেছেন।

তবে যাই হোক না কেন মাওবাদী ও সরকারি পুলিশের সংঘর্ষে কিন্তু মাঝখান থেকে ক্ষতি হচ্ছে গ্রামবাসীদের। মাওবাদীদের কথা শুনে না চললে জনতার আদালতে তাদের বিচার হয়। মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়। আবার পুলিশ এসে যেকোন নিরীহ গ্রামবাসীকে মাওবাদী সন্দেহে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে তেন্দু পাতা সংগ্রহ করা, শিকার করা আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ থেকে হয়ে আসছে। তারা তীর-ধনুক এবং হাতে তৈরি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যায় শিকার করতে। কিন্তু তাদের হাতে বন্দুক দেখলেই পুলিশ সিআরপিএফ মাওবাদী সন্দেহে তাদের গ্রেপ্তার করছে কিংবা গুলি করে প্রাণে মেরে দিচ্ছে।

বস্তারের গভীর জঙ্গলের ভিতরে গ্রামগুলি অনুন্নয়নের অন্ধকারে নিমজ্জিত। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, পুকুর কিছুই নেই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধাগুলো থেকে তারা বঞ্চিত। এমনকি স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও তাদের ঠকাচ্ছে। সরপঞ্চ থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের বাইরে শহরে থাকে। বিধায়ককে কেউ চেনে না। ভোট এরা ইচ্ছে মত দিতে পারেন না। অনেকের ভোটার আইডি নেই। তাই সরকারি সাহায্য জঙ্গলের ভেতরে গ্রামগুলিতে গিয়ে পৌঁছায় না। মাওবাদী সন্দেহে তুলে নিয়ে যাওয়া

গ্রামবাসীরা পুলিশের অত্যাচারে অনেক সময় রাগে ক্ষোভে বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে চলে যায় মাওবাদীদের গড়ে মাওবাদী হবার জন্য।

সরকার থেকে বলা হচ্ছে গ্রামের আদিবাসীদের উন্নতিকল্পে বহু কিছু করা হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় রিপোর্টাররা যখন গভীর জঙ্গলে থাকা তোকে, কুতুল, গুংপার, টিকল গুঁড়া, বেদরে, তারবল্লা এইসব গ্রামগুলিতে গিয়ে আদিবাসীদের সাথে কথা বলে রিপোটিং করছেন তখনি গ্রামের আদিবাসীদের দুর্বিষহ জীবন ও অনুন্নয়ন এর আসল চেহারাটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর উপর নতুন বিপদ খোলা মুখ খনির জন্য কর্পোরেটরা সরকারের সাহায্যে একের পর এক জঙ্গল ও আদিবাসী গ্রাম দখল করে নিচ্ছে। পিতৃপুরুষের ভিটে থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে আদিবাসীদের। এছাড়া খনির জন্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে পাহাড়, অরণ্য ও নদী, হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। অথচ জীবনধারণের জন্য আদিবাসীরা এই প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৪

এবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের উৎপত্তি ও সক্রিয়তা সম্পর্কে দু-চার কথা বলি।

২০০৪ সাল থেকে ছত্তিশগড়ে মাওবাদীরা ভীষণভাবে সক্রিয় ও একের পর এক সিআরপিএফ ও কোবরা বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদের প্রাণনাশ করছে ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুটপাট করছে। ২০০৭ এ দন্তেওয়াড়াতে পুলিশ চৌকি আক্রমণ করে ৫৫ জন পুলিশকে মাওবাদীরা মেরে ফেলে। ২০১০ এ দন্তেওয়াড়াতে ৭৫ জন পুলিশ কর্মী মারা যান মাওবাদী আক্রমণে। ২০১৩ তে সুকমার জিরম ঘাঁটিতে কংগ্রেস ও 'সালোয়া জুডুম' নেতা মহেন্দ্র কর্মা, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা সহ বেশ কিছু বড় বড় নেতার ওপর মাওবাদী আক্রমণ হয় ও তাদের মেরে ফেলা হয়। এরপর বিজাপুরে সিআরপিএফদের চারদিক থেকে ঘিরে আক্রমণ করে

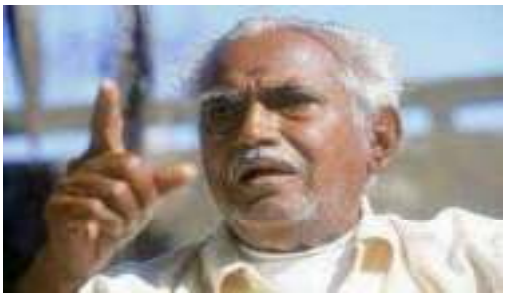

সীতারামাইয়া

মাওবাদীরা। ২২ জন পুলিশকর্মী মারা যায় ও ৩০ জনের উপর আহত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এত পুলিশ ও কোবরা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তারা বারবার মাওবাদীদের কাছে আক্রান্ত হচ্ছে কেন? এর একটা প্রধান কারণ, ঘন গভীর জঙ্গল যা মাওবাদীদের হাতের তালুর মতো চেনা এবং যেখানে পুলিশের জন্য পদে পদে মৃত্যু অপেক্ষা করছে সেখানে গিয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে লড়াই করা খুবই দুঃসাধ্য।

তদুপরি গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পুলিশরা পায় না, বরং গ্রামবাসীরা মাওবাদীদের সমর্থন করে। পুলিশদের গ্রামবাসীরা কেন সমর্থন করেনা সে কথা আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু মাওবাদীরা কীভাবে গ্রামের গরিব আদিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল সেটা জানতে গেলে আমাদের একটু অতীতে ফিরে যেতে হবে।

এই দণ্ডকারণ্যে মাওবাদীদের প্রবেশ ও বিস্তার কীভাবে হয়েছিল সেটা বুঝতে গেলে একটু ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিঙ জেলায় ও সেখানকার নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলন এবং তারপর সত্তরের দশকে নকশালপন্থী ছাত্র-যুবদের পশ্চিমবঙ্গের এবং কয়েকটি রাজ্যের কয়েকটি পকেটে সশস্ত্র আন্দোলন তদানীন্তন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট ও কংগ্রেস সরকার কঠোর হাতে দমন করার পর, বিশেষত এই আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা চারু মজুমদারের গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর পর নকশাল আন্দোলনের উগ্রতা স্তিমিত হয়ে গেলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কৃষক ও আদিবাসী সমাজের একটি অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এই আন্দোলন। অন্ধ্রপ্রদেশে ওড়িশায় চন্দ্রপুল্লা রেড্ডি, নাগভূষণ পট্টনায়ক, আপ্পালাসুরি প্রমুখ নকশাল নেতারা ছিলেন। এরমধ্যে অধ্যাপক কোন্ডাপল্লি সীতারামাইয়া, ডাঃ কোল্লুরি চিরঞ্জীবি প্রমুখরা নতুন করে সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। সীতারামাইয়া চারু মজুমদারের মতো সকল ধনী বুর্জোয়া শ্রেণিকে চিহ্নিত করে মারার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, প্রথমে সংগঠন মজবুত করতে হবে। তারপর কৃষক ও আদিবাসীদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। এক্ষেত্রে কেউ যদি তাদের চলার পথে বাধা দিতে আসে তাহলে তাকে হত্যা করে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সীতারামাইয়া নতুন পার্টি গঠন করেন যার নাম CPIML People's War । সীতারামাইয়াকে এই পার্টির প্রথম জেনারেল সেক্রেটারি করা হয়। পার্টি থেকে ঠিক করা হল জনসংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের জন্য গেরিলা বাহিনী গঠন করা হবে। গড়ে ওঠে পিপলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)। সীতারামাইয়া উপলব্ধি করেছিলেন যে সরাসরি পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ সমরে গেলে মাওবাদীদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তাই সুরক্ষিত স্থানে লুকিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করতে হবে। নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য চাই গোপন আশ্রয়। তার জন্য ঘন জঙ্গল সবথেকে ভালো জায়গা। প্রথমদিকে ছাত্রসংগঠন 'আর.এস.এফ', আদিবাসী সংগঠন 'রায়তু কুলি সঙ্গম', সাংস্কৃতিক সংগঠন, নাগরিক সংগঠন প্রভৃতির মাধ্যমে গণআন্দোলন করে পি.ডব্লিউ.জি. বা 'জনযুদ্ধ' গোষ্ঠী অন্ধ্রে বিশেষত তেলেঙ্গানা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পরে সশস্ত্র আন্দোলন প্রাধান্য পায়। একসময় সীতারামাইয়া বহিষ্কৃতও হন, পরে

তার মৃত্যু হয়। সংগঠনের হাল ধরেন মুপ্পালা লক্ষণা রাও (গণপতি)। যার সময়ে পিডব্লিউজি, সিপিআইএমএল (পার্টি ইউনিটি), এমসিসি প্রভৃতি কয়েকটি নকশাল গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তৈরি হয় সিপিআই (মাওয়িষ্ট)। ২০১৮ থেকে এই দলের সাধারণ সম্পাদক নামবালা কেশভ রাও। ২০০৪-এ সমর্থন দিয়ে জেতানো অন্ধ্রের কংগ্রেসের রাজশেখর রেড্ডি সরকার যখন তাদের কোনঠাসা করে এবং তাদের প্রধান দপ্তর নালিমেলার জঙ্গল থেকে হটিয়ে দেয় তখন তারা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গলগুলিতে আশ্রয় নেয়। এর জন্য দণ্ডকারণ্যের এক লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলি বেছে নেওয়া হলো। মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক হরগোপাল, একজন আত্মসমর্পণকারী আশির দশকের মাওবাদী নেতার কাছে শুনেছিলেন যে কীভাবে তারা গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল।

বস্তারের পাহাড়ে ঘেরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে আদিবাসীদের গ্রামগুলি ছিল শহরের সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিদ্যুৎ নেই, খাবার নেই, রাস্তা নেই, পরনের কাপড় নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই ... ভাত ফুটিয়ে নুন দিয়ে খাওয়া এবং ক্ষেত খামারে লাগানো কিছু সবজি দিয়ে এদের জীবন কোনরকমে চলত। আমাদের সংবিধানে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অধিকার ও উন্নয়নের জন্য অনেক কিছুই আছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের উদাসীনতা। এর উপরে কর্পোরেটের স্বার্থে তাদের জল জমি জঙ্গল গ্রাম দখল, গ্রাম থেকে উচ্ছেদ এবং সরকারের মদতে তৈরি 'সালোয়া জুডুম' সশস্ত্র গুণ্ডাদলের অত্যাচার। এই পরিস্থিতিকেই কাজে লাগাল মাওবাদীরা।

আশির দশকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলিতে পৌঁছে গেল মাওবাদীরা। তারা বলল যে, তারা আদিবাসীদের জল, জমি, জঙ্গলের অধিকারের জন্য তাদের হয়ে লড়াই করতে এসেছে। গ্রামবাসীরা বলল যে, তাদের দিন যেভাবে কাটছে সেভাবেই কেটে যাবে তারা কোন লড়াই চায় না। কিন্তু মাওবাদীরা তো নাছোরবান্দা। তাদের তো জঙ্গলে আশ্রয় এবং গ্রামবাসীদের পূর্ণ সমর্থন চাই। তারা সেদিন দিনরাত গ্রামেই থেকে গেল না খেয়ে আকাশের নিচে শুয়ে। পরদিন গ্রামবাসীরা ওদের না খেয়ে দেয়ে পড়ে থাকতে দেখে ভাবল ''সত্যিই হয়তো এরা আমাদের অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই করতে এসেছে।'' তাদের মনের দরজা একটু হলেও যেন খুলল মাওবাদীদের জন্য। তারা মাওবাদীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করল।

ছত্তিশগড়ে আদিবাসীদের আয়ের একটা অন্যতম উৎস হচ্ছে তেন্দু পাতা। তেন্দু পাতাকে বলা হয় বস্তারের সবুজ সোনা। এই তেন্দু পাতা আদিবাসীরা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে ঠিকাদারদের কাছে এক বান্ডিল তেন্দু পাতা তিন পয়সায় বেচতো। মাওবাদীরা আদিবাসী ও ঠিকাদারদের এক জায়গায় ডেকে তেন্দু পাতার দাম তিন থেকে ছয় পয়সা করে দিল। অর্থাৎ কিনা একদম দ্বিগুণ। ঠিকাদাররা মাওবাদীদের চাপে পড়ে বাধ্য হল মেনে নিতে। না খেতে পাওয়া গরিব আদিবাসীদের কাছে এ যেন ছিল স্বপ্নের মত। মাত্র তিন পয়সায় বিনিময়ে কিন্তু মাওবাদীরা আদিবাসীদের মনে জায়গা করে নিল। এই সরল দরিদ্র আদিবাসীরা একবার যাদের মনে জায়গা দিয়ে দেয় তাদের সঙ্গ কখনও ছাড়ে না।

তারা মাওবাদীদের নিজেদের সরকার বলে মেনে নেয়। মাওবাদীরা জঙ্গলের চাষযোগ্য জমি আদিবাসীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। জল, জঙ্গল, জমির ওপর শুধুমাত্র আদিবাসীদের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়। 'জনতনা' সরকার অর্থাৎ জনতার জন্য সরকার গঠন করা হয়। জনতার আদালতও গঠিত হয়। গ্রামের পঞ্চায়েত সরপঞ্চ নিয়ে মাওবাদীদের নেতৃত্বে গ্রাম্য কাউন্সিল গঠন হয়। মাওবাদীদের প্রাথমিক কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল সংগঠনের বিস্তার। এর জন্য তারা 'চেতনা নাট্যমণ্ডল' বা 'সিএনএম' গঠন করল। এই 'নাট মণ্ডল' গ্রামে গিয়ে নানান রকম নাচ গান নাটকের অনুষ্ঠান করত। এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দেখানো হতো যে জমিদার মহাজন সরকার কিভাবে গ্রামবাসীদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। নাচ গান আদিবাসী কিশোর ও যুবক যুবতীদের খুবই আর্কষণ করতো। তারা তখন অনুপ্রাণিত হয়ে মাওবাদীদের দলে যোগ দিত। ১৩/১৪ বছরের কিশোররা মাওবাদী কর্মপন্থা ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জঙ্গলে চলে যেত, 'বাল সঙ্গমে' ভর্তি হত এবং তারা পূর্ণবয়স্ক হলে তাদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হত।

২০০৪ সালের পর থেকে মাওবাদী ও সিআরপিএফের সংঘর্ষে যে ধরনের হিংসাত্মক ঘটনাবলি ও আধা সামরিক বাহিনীর মৃত্যু খবরের কাগজের হেডলাইন হচ্ছে তাতে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই মনে করছেন যে, যে আদর্শ ও নীতি নিয়ে মাওবাদীরা এখানে আন্দোলন শুরু করেছিল তার থেকে যেন অনেকটাই তারা সরে গিয়ে ক্রমশ সশস্ত্র আন্দোলন ও হিংসায় জড়িয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বস্তারের ঘন জঙ্গলে মাওবাদীদের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চার হাজার পেরিয়ে গেছে। এই মাওবাদীদের বেশিরভাগই কিন্তু আদিবাসী। এদের মধ্যে কিন্তু মহিলা এবং অল্প বয়সের কিশোররাও রয়েছে। এদের কাছে রয়েছে এ কে ফরটিসেভেন, আরপিজি (রকেট প্রোফাইল গ্রেনেড), থ্রি নট থ্রি, এসএলআর, হ্যান্ড গ্রেনেড, প্রেসার বম্ব ইত্যাদি অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র। বেশ কয়েকটা প্রশ্ন উঠে আসে যে মাওবাদীরা আদিবাসী কিশোর-কিশোরীদের কিভাবে সংগঠনে যোগদান করাচ্ছে, জঙ্গলে এদের জীবনযাত্রা কী রকম, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য এরা অর্থ কোথা থেকে পাচ্ছে ইত্যাদি।

৫

বস্তারের প্রথম আদিবাসী নকশাল কমান্ডার বদ্রুনা একজন আত্মসমর্পণকারী নকশাল। বর্তমানে জগদলপুরের শহীদ পার্কে মালির কাজ করে। ১৯৮৭ সালে বদ্রুনা ওরফে রমেশ মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেয়। আর ২০০০ সালে আত্মসমর্পণ করে। বস্তারের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বদ্রুনা জানায় তার মাওবাদী হয়ে ওঠার কাহিনি। বস্তারের কোন এক গ্রামের দরিদ্র

পরিবারের ছেলে ছিল বদ্রুনা। গ্রামে গরু ছাগল চড়িয়ে বেড়াত। ১৯৮৬ সালে যখন তার বয়স ১৪ কী ১৫ সেই সময় তাদের গ্রামে কিছু মাওবাদী আসে যারা ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের। তারা গ্রামীণ এলাকায় নাচ-গান করে সকলের মনোরঞ্জন করে। বদ্রুনা নাচ গানের আকর্ষণে তাদের সঙ্গে মিশত, তাদের চা জল দিত। তারা গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস করত যে স্থানীয় প্রশাসন তাদের উপর অত্যাচার করে কিনা। সেই সময় গ্রামের কোতোয়াল পুলিশের সঙ্গে এসে প্রায়ই গ্রামবাসীদের নানাভাবে শোষণ কখনও কখনও অত্যাচার করত। অন্যদিকে নকশালরা গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে যে, জল জমির উপর কেবল আদিবাসীদের অধিকার এবং তারা আদিবাসীদের ন্যায় দেবে। বদ্রুনা তাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ১৯৮৭ সালে মাওবাদীদের সংগঠনের যোগদান করে।

বদ্রুনার কাছ থেকে জানা যায় যে মাওবাদীরা গ্রামে নাচ-গান নাটক অথবা নানা রকম খেলা দেখিয়ে গ্রামের কিশোর ও যুবা আদিবাসীদের আকর্ষণ করে। তারপর তাদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাল সঙ্গমে ভর্তি করে। জঙ্গলের স্কুলে পড়ানো হয় সঙ্গে সঙ্গে তাদের বোঝানো হয় যে, সরকার তাদের কোন রকম উন্নতি বা বিকাশ করবে না। জল, জঙ্গল, জমির উপর শুধু তাদেরই অধিকার এবং এই অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের লড়াই করতে হবে। এইভাবে যুবকদের হাতে বন্দুক তুলে দেওয়া হয় ও তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়।

বদ্রুনার স্ত্রী লতাও মাওবাদী ছিল। দুজনে একসঙ্গে আত্মসমর্পণ করে।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক আশুতোষ ভরদ্বাজ ১০ বছর ধরে বস্তারের আদিবাসী ও মাওবাদীদের ওপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি তিন বছর ধরে মাওবাদী উপদ্রুত আদিবাসী এলাকাগুলিতে থেকে আদিবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তারপর জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে ২৩ দিন ছিলেন। কেন না তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মাওবাদীদের কাছে পৌঁছতে গেলে তাকে গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। কেন না গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাওবাদীদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। আশুতোষ তার ''বস্তার ডায়েরি'' বইতে মাওবাদীদের জঙ্গলে জীবনযাত্রা, তাদের সরকারের তথা পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম, তারা হাতিয়ার কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করে সেই সম্পর্কে এবং সালোয়া জুডুম, জন আদালত, গ্রামের আদিবাসীদের দুর্বিষহ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন।

আশুতোষ বলছেন মাওবাদীদের অর্থ সংগ্রহ লেভি বা কর সংগ্রহের মাধ্যমে হয়। কোন ফরেস্ট অফিসার যদি সরকারি চাকরি নিয়ে আসে তাহলে তার মাইনের বেশ কিছুটা অংশ মাওবাদীদের দিতে হয়। এছাড়া গ্রামে যাদের দোকান আছে, বা ব্যবসা আছে তাদের সকলকে মাওবাদীদের কর দিতে হয়। তেন্দু পাতার ব্যবসায়ীদের লাখ লাখ টাকা কর দিতে হয় মাওবাদীদের। এছাড়া যদি কোন অটো বা ট্যাক্সি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায় তাহলে কর দিতে হবে মাওবাদীদের, তবেই যেতে পারবে। কোন ফ্যাক্টরি খুলতে গেলে ঠিকাদারকে বড় অংকের কর দিতে হয় মাওবাদীদের। এইভাবে মাওবাদীদের অর্থ সংগ্রহ হয়। এই অর্থ কিন্তু কোন একজন নিজের কাছে রেখে দেয় না। মাওবাদীদের ছোট ছোট নানান গ্রুপ থাকে। প্রথমে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সমস্ত অর্থ যায়। তারপর সেখান থেকে ছোট ছোট গ্রুপ লিডারদের তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয়। কোন গ্রুপের যদি অর্থ বেঁচে যায় তাহলে সেটা সে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ফেরৎ দিয়ে দেয়। একটা গ্রুপ এর অন্তর্গত মাওবাদীরা তাদের প্রয়োজন মতো, যেমন সাবান, তেল, চিরুনি, পাউডার ইত্যাদি একটা কাগজে লিখে দেয় তাদের গ্রুপ লিডারকে। গ্রুপ লিডার সেগুলো আনিয়ে দেয়। কিন্তু কাউকে কোন রকম মাইনে বা পয়সা দেওয়া হয় না।

আশুতোষ এবং বদ্রুনা দুজনেই বলছেন মাওবাদীরা তিনটি সোর্স থেকে হাতিয়ার সংগ্রহ করে। প্রথমত, শত্রুকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করে অস্ত্র সংগ্রহ করা। তাই পুলিশ বা জওয়ানদের ওপর অ্যাটাক করে তাদের মেরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র এমনকি ড্রেস, হেলমেট, ওয়াকিটকি সব লুট করে । ৭০% অস্ত্র তারা এভাবেই পায়।

দ্বিতীয়ত, তারা পয়সা দিয়ে বাইরের লোকের কাছে হাতিয়ার কেনে।

তৃতীয়ত, তারা নিজেরাই জঙ্গলে হাতিয়ার, হ্যান্ডগ্রেনেড, দেশি বন্দুক ইত্যাদি বানায়। প্রয়োজনে বাইরে থেকে মেকানিক নিয়ে আসে যারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা বানানো শেখায়। জঙ্গলে বাইরে থেকে প্রয়োজনে ডাক্তারও নিয়ে আসা হয়।

আশুতোষ তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলছেন যে, প্রত্যেকটা গ্রুপের হেড ভোর পাঁচটা নাগাদ উঠে সিটি বাজায় যাতে সকলে উঠে যায়। তারপর সকালে ফ্রেশ হবার পর রোলকল হয়। তারপর পিটি করানো হয়। এরপর সকলে বন্দুক নিয়ে হাঁটা দেয় জঙ্গলের মধ্যে। সকলের পিঠে একটা ব্যাগ থাকে যার মধ্যে সাবান তেল চিরুনি, মাওবাদীদের কিছু বই, ফার্স্ট এইড বক্স, বিস্কুটের প্যাকেট, একটা ড্রেস ইত্যাদি থাকে। সাধারণ মাওবাদীদের কাছে থ্রি নট থ্রি, এস এল আর ইত্যাদি থাকে। এছাড়া প্রত্যেক গ্রুপের কাছে একটা করে রেডিও থাকে। এই রেডিও হচ্ছে ওদের বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। রেডিও ওরা গাছের ডালে ঝুলিয়ে শুনতে থাকে। সকালবেলা হাঁটতে হাঁটতে যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কোথাও গাছের নিচে বা কোন পরিত্যক্ত খামারে আশ্রয় নেয়। সেখানেই কাঠ জ্বালিয়ে সকাল বেলার রান্না হয়। রান্নার জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম ওরা গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে। গ্রুপ লিডার কিছু মেম্বারকে কাজ ভাগ করে দেয়। কেউ কর সংগ্রহ করতে যায়, তো কেউ চাল ডাল আনতে যায়। আবার কেউ গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিটিং অংশগ্রহণ করতে যায়। বাকিরা জঙ্গলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। সকালের খাওয়া দাওয়ার পর আবার হাঁটা দেয়। সন্ধ্যে হবার আগে খোলা আকাশের নিচে থাকে নয়তো কখনও কখনও তাম্বু খাটায়।

মাওবাদী যুবক-যুবতীদের মধ্যেও ভাব ভালোবাসা হয় এবং

বিয়েও দেওয়া হয় রীতিমতো উৎসব করে প্রথা মেনে ধুমধাম করে। তবে বিয়ের আগে পাত্রের 'নাশবন্দী' করিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাদের কোন বাচ্চা না হয়। তাদের বোঝানো হয় যে বাচ্চা হলে তারা আন্দোলনে মন দিতে পারবে না। সব সময় বাচ্চার দিকে মন পড়ে থাকবে। তাছাড়া জঙ্গলে বাচ্চা মানুষ করাও কঠিন। তাই বিয়ে করতে গেলে পুরুষদের 'নাসবন্দী' করতেই হবে। আত্মসমর্পণ করা মাওবাদী মহিলাদের সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, মাওবাদী সংগঠনে যোগদানকারী আদিবাসী মেয়েরা অনেক সময় কিন্তু শারীরিক ও যৌন নিগ্রহের শিকার হয়। মাওবাদী পুরুষেরা জঙ্গলের কঠিন জীবনযাত্রায় তাদের যে যৌন ক্ষুধা তা চরিতের জন্য অনেক সময় আদিবাসী মাওবাদী মহিলাদের ধর্ষণ করে। সেই মহিলা গর্ভবতী হলে জোর করে তাঁর গর্ভপাত করানো হয়।

২০০৫ সাল থেকে মাওবাদী আন্দোলন পুরোপুরি হিংসাত্মক রূপ নেয়। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে সালোয়া জুডুম (salwa judum)। মাওবাদীদের প্রতিরোধ করার জন্য সরকারি মদতপুষ্ট হয়ে কংগ্রেস নেতা মহেন্দ্র কর্মা ২০০৫-এ সালোয়া জুডুম স্থাপনা করেন। সালোয়া জুডুম কথাটি অর্থ হচ্ছে শান্তির বাতাবরণ। এই সংগঠনে আদিবাসী যুবকদের নিয়ে এসে বন্দুক চালানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় যাতে এরা মাওবাদীদের সঙ্গে লড়তে পারে। এর কার্যকর্তাদের SPO বা স্পেশাল পুলিশ অফিসার বলা হয়ে থাকে। সালোয়া জুডুমে চার হাজার SPO ছিল।

আশুতোষ বলছেন যে ১৫/১৬ থেকে ১৮ বছরের ছেলেদের হাতে যখন বন্দুক তুলে দেওয়া হচ্ছে তখন তারা শুধু যে মাওবাদীদের আক্রমণ করছে তা নয়, গ্রামে গিয়ে তাদের পুরনো শত্রুদের বন্দুকের নিশানা বানিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অশিক্ষিত সরল এই যুবকেরা মাওবাদীদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত নয়। এদের সরকার থেকে ৩০০০ টাকা দেওয়া হত। গ্রামবাসীদের বলা হল যে সালোয়া জুডুমে নাম না লেখালে কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। এমনকি যারা সালোয়া জুডুমে যুক্ত হত না সেই পরিবারকে মাওবাদী আখ্যা দিয়ে দেওয়া হত ও অনেক সময় উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হতো। সেখানেই হয়তো তাদের মৃত্যু হত। আবার মাওবাদীরা গ্রামে এসে শাসিয়ে যেত যে যারা সালোয়া জুডুমে যুক্ত হবে তাদের খতম করে দেওয়া হবে। অনেক সময় মিথ্যা সন্দেহে মাওবাদীরা কোন গ্রামবাসীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতো।

এই সময়ে গ্রামগুলিতে একটা বড় অংশ মাওবাদীদের সাথে যোগদান করে। তার একটা বড় কারণ আশুতোষ বলছেন যে সালোয়া জুডুমে যোগ না দেওয়ায় পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামের যুবকরা দলে দলে মাওবাদীদের সংগঠনে যোগদান করে। সালোয়া জুডুমে একপ্রকার আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বন্দুক হাতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যার ফল হয়েছিল খুবই ভয়ঙ্কর।

শেষ অবধি অবশ্য ২০১১ সালে সুপ্রিম কোর্ট থেকে সালোয়া জুডুমকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সালোয়া জুডুমের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র কর্মার উপর মাওবাদীদের ক্রোধ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। মাওবাদীদের হিটলিস্টে প্রথমেই নাম থাকে মহেন্দ্র কর্মার। যার ফলস্বরূপ সুকমায় ২০১৩ সালে সেই ভয়াবহ জিরম ঘাঁটির হামলা। পরিবর্তন যাত্রা থেকে ফিরছিলেন বেশ কয়েকজন ওপরের সারির কংগ্রেস নেতা যার মধ্যে ছিলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা বিদ্যাচরণ শুক্লা, মহেন্দ্র কর্মা ও আরও অনেকে। মাওবাদীদের আক্রমণে ২৭ জন ঘটনাস্থলে মারা যান এবং পাঁচজন চিকিৎসা চলাকালীন মারা যান। মহেন্দ্র কর্মাকে চিহ্নিত করে তাকে আলাদা করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়ে নিজেদের রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় মাওবাদীরা।

আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের কাছ থেকে শোনা যায় যে প্রত্যেকটা বড় বড় হামলার পর মাওবাদীরা জঙ্গলে রীতিমতো নাচ-গান করে তাদের সফলতাকে সেলিব্রেট করে।

বারবার বস্তারের মাটি মাওবাদীদের হিংসাত্মক আক্রমণে ভারতীয় আধা সেনারা মারা যাচ্ছে। পাশাপাশি আধা-সেনা ও মাওবাদীদের মাঝে পড়ে গ্রামের নিরীহ আদিবাসীদের প্রাণ যাচ্ছে। কিন্তু এত সিআরপিএফ, কোবরা কমান্ডো, বিএসএফ থাকা সত্ত্বেও সেভাবে কেন সফলতা আসছে না সরকারের মাওবাদীদের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ বলেছেন যে মাওবাদীদের সফলতা পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে গভীর জঙ্গলের নাড়ি নক্ষত্র মাওবাদীদের চেনা। জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে থাকা এবং অতর্কিতে গেরিলা আক্রমণ মাওবাদীদের সফলতার একটা বড় কারণ। এছাড়া মাওবাদীদের গুপ্তচর বাহিনি খুব সক্রিয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস অর্জন করায় অনেক খবর আগে থাকতেই গ্রামবাসীদের মারফৎ পেয়ে যায় মাওবাদীরা। সরকারি নিরাপত্তাবাহিনী এইখানে অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা আধা সেনাদের বিশ্বাস করে না। মাওবাদীদের সম্পর্কিত কোন খবর গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পায় না পুলিশ।

কখনও কখনও রাজ্য পুলিশ ও আধা-সেনা ফেক এনকাউন্টার করে নির্দোষ আদিবাসীদের মাওবাদী সন্দেহে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে খুন করে। যখনই এই ধরনের এনকাউন্টার বা পুলিশের দ্বারা আদিবাসীরা নিগৃহীত হয় তখনই মাওবাদী পার্টিতে গ্রামবাসীদের যোগদান বেড়ে যায়। পুলিশের মারের ভয়ে দলে দলে গ্রামবাসী তখন মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেয়।

বস্তারের মাওবাদী সংগঠনে কিন্তু অনেক মহিলা মাওবাদীও আছেন। সুন্দরী নামে এক আত্মসমর্পণকারী মহিলা, যে আগে মাওবাদী সংগঠনে ছিল—বস্তারের স্থানীয় সংবাদদাতা বিকাশ তিওয়ারির কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তার সংগঠনে যোগ দেওয়া থেকে মাওবাদী জীবন সম্পর্কে অনেক কথাই বলে। সুন্দরী যখন মাত্র ১৩/১৪ বছরের কিশোরী ছিল তখন ভালো গান গাইতে পারত। গ্রামবাসীরা উৎসব অনুষ্ঠানের সময় সকলেই সুন্দরীর গান শুনতে চাইত। মাওবাদীরা তখন সুন্দরীদের গ্রামে যাতায়াত করত। একবার এক মাওবাদী নেতা এসে সুন্দরীকে বলে আরও ভালো

ভালো গান শিখিয়ে দেবে। এই বলে জঙ্গলে নিয়ে যায়। কিন্তু আর গ্রামে ফেরত পাঠায় না। সুন্দরীর বাবা জঙ্গলে এসে বলে যে সে তার মেয়েকে কিছুতেই এখানে রাখবে না। কিন্তু মাওবাদীরা সুন্দরীর বাবাকে মেরে ধরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। একটা সরল নিষ্পাপ কিশোরী যে সব সময়ে গান গেয়ে আনন্দ পেত তার হাতে তুলে দেওয়া হলো বন্দুক, বন্দুকের ভাষায় কথা বলতে শেখানো হলো। গ্রামের সহজ-সরল মেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠল কমিটির নেতার গানম্যান। মাওবাদী ড্রেস, পিঠে ব্যাগ, হাতে একে ফরটি সেভেন হয়ে উঠল সুন্দরীর সর্বক্ষণের সঙ্গী। যদিও তার সংবেদনশীল মন সব সময় পড়ে থাকত গ্রামের সেই খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, নিকোনো উঠোন আর বাবা মা দাদার কাছে। বেশ কয়েকবার বাড়িতে দেখা করতে যাবে বলে অনুমতি চেয়ে পায়নি। কয়েক বছর পর সুন্দরীর বাবা মারা গেলে সুন্দরীর দাদা চিঠি লিখে জানায় সে কথা। কিন্তু চিঠি সুন্দরী হাতে দেওয়া হয়নি। তার দু'চার মাস পর যে কোন সূত্রে সুন্দরী জানতে পারে যে তার বাবা আর নেই। তখন উপরতলার নেতাদের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে যে, একবার বাড়িতে দেখা করে চলে আসবে। অবশেষে অনুমতি মেলে। কয়েক বছর পর গ্রামে ফিরে মা, দাদা বৌদিকে দেখে অঝোর ধারায় কাঁদে সুন্দরী। এরপর আর মাওবাদীদের জঙ্গল জীবনে ফিরে যেতে চায় না সুন্দরী। দু-তিনজন মাওবাদী লিডার আসে সুন্দরীকে বোঝাতে কিন্তু সুন্দরী তার সিদ্ধান্তে অনড়। সে বলে যে সে তার দাদা বৌদির মতো ক্ষেত খামারে কাজ করে জীবন কাটাতে চায়। সে মাওবাদীদের কথা কাউকে বলবে না বলে কথা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝেই মাওবাদীরা সুন্দরীদের মারার জন্য গ্রামে এলে সুন্দরীর পরিবার পালাতে বাধ্য হয়। অবশেষে সুন্দরী আত্মসমর্পণ করে। তাকে পুনর্বাসনের জন্য ঘর ও চাকরি দেওয়া হয়। এমন অনেক সুন্দরী আছে যাদের জোর করে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে মাওবাদী বানানো হয়।

৬

বস্তারের মাওবাদী আন্দোলনে একজনের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার আগে কিছু মাওবাদী হামলার কথা বলি। ২০১০ এ দান্তেওয়াড়াতে সিআরপিএফ এর ৭৬ জন জওয়ান মাওবাদীদের আক্রমণে মারা যায়। ২০১৩ তে সুকমার জিরম ঘাঁটিতে মাওবাদী আক্রমণে কংগ্রেসের মহেন্দ্র কর্মা ও বিদ্যাচরণ শুক্লা সহ ৩২ জনের মৃত্যু হয়। ২০১৭তে মাওবাদীরা বুরকপালে সিআরপিএফ এর ২৫ জন জওয়ানকে মেরে দেয়। ২০২১ এর ৩ এপ্রিল সুকমা ও বিজাপুর সীমান্তে মাওবাদী ও আধা-সেনার সংঘর্ষে ২২ জন আধা-সেনা ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এই সমস্ত ভয়ঙ্কর হামলার পিছনে মাস্টারমাইন্ড যিনি ছিলেন তিনি হলেন মারভি হিড়মা। যার কথা আমি এই প্রতিবেদনের শুরুতেই উল্লেখ করেছি। কে এই হিড়মা? কেনই বা বস্তার রেড করিডোর এর ইতিহাসে তাকে নিয়ে এত চর্চা হয়? তাকে ধরে দেবার জন্য কেনই বা ৪০ লাখ টাকা পুরস্কার রাখা হয়?

এইসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারি যে মারভি হিড়মা হচ্ছে পিপসল লিবারেশন গেরিলা আর্মির (PLGA) ব্যাটেলিয়ান ওয়ান এর প্রধান। হিড়মা হচ্ছে বস্তারের একমাত্র আদিবাসী যে মাওবাদীদের সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের টপ লেভেলের নেতা। এর আগে মাওবাদীদের সেন্ট্রাল কমিশনে অন্ধ্রের নেতাদের আধিপত্য ছিল। কোন আদিবাসী নেতা এর মেম্বার ছিল না।

সুকমা জেলার পুউপতি গ্রামের অধিবাসী হিড়মা। মারভি হিড়মা ছাড়াও তার আরও কয়েকটা নাম আছে তার। যেমন হীরমন্না, হীরমাল্লু, সন্তোষ ইত্যাদি। নব্বইয়ের দশকে বালসঙ্গমে ভর্তি হয় ও কিছুদিনের মধ্যেই নিজের দক্ষতায় বালসঙ্গমের অধ্যক্ষ হয়ে যায়। তুখোড় বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর জন্য খুব দ্রুত মাওবাদীদের সিপিআই মাওবাদীর সেন্ট্রাল মিলিটারি কমিশনের মেম্বার হয় হিড়মা। ৫ ফুট ৬ ইঞ্চির হিড়মার বর্তমানে কোন ছবি পুলিশের কাছে নেই। আত্মসমর্পণকারী সুন্দরী যে একসময় হিড়মার গানম্যান ছিল তার কাছ থেকে জানা যায় যে হিড়মার সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রচণ্ড আঁটোসাঁটো। চারটি বলয়ে তাকে ঘিরে থাকে মাওবাদীরা। যেখানে হিড়মা আছে সেখান থেকে চার কিলোমিটার দুরে একটা সুরক্ষা বলয়। তারপর দু'কিলোমিটার দূরে সশস্ত্র কিছু মাওবাদী পাহারা দিচ্ছে হিড়মাকে। এরপর ৬০০ মিটার দূরে রয়েছে কিছু বন্দুকধারী গেরিলা যোদ্ধা। এরপর হিড়মা যেখানে আছে সেই তাম্বু বা অস্থায়ী ঘরকে ঘিরে রয়েছে ১০/১২ জন গানম্যান।

সুন্দরী, হিড়মার গানম্যানের ভূমিকায় ছিল বলে কাছ থেকে হিড়মাকে দেখেছিল। তার কাছ থেকেই জানা যায় যে হিড়মা প্রায় সময়ই বই পড়ে। দলের যে কেউ দেখা করতে পারে না হিড়মার সঙ্গে। তার কোন কিছু বলার থাকলে সেন্ট্রাল কমিটির একজনকে বলে দেয়। সে অন্যদের হিড়মার বক্তব্য জানায়। হিড়মার স্ত্রী আছে এবং সেই এখানে কমান্ডার। হিড়মা সকলের সঙ্গে বসে খায় না। হিড়মার রান্না ওর দুজন গানম্যান করে।

হিড়মা সুগারের পেশেন্ট বলে ওর জন্য রুটি হয়। বাকি কিন্তু কারোর জন্য রুটি হয় না। এছাড়া চিকেন ও বিফ খায় হিড়মা। অর্থাৎ জঙ্গলের মধ্যে রীতিমতো ভিআইপি ট্রিটমেন্টে থাকে হিড়মা। অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হিড়মাকে ঘিরে থাকে গেরিলা যোদ্ধারা। এ কে ফরটি সেভেন হিড়মার খুব প্রিয়। হিড়মার বয়স কত কেউ জানে না তবে অনুমান করা হয় ৪০ থেকে ৫০ এর ভিতর।

মাওবাদীদের গেরিলা সংগঠনে কিন্তু অনেক ব্যাটেলিয়ান ভাগ আছে এবং তারা বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে। ব্যাটেলিয়ান ওয়ান যার নেতা হিড়মা, এই ব্যাটেলিয়নের অধীনে কমপক্ষে ১৮০ জন যোদ্ধা থাকে যারা রীতিমতো মিলিটারি ড্রেস পরিহিত এবং যাদের কাছে থাকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যেমন ইউবিজিএল, রকেট লঞ্চার, হ্যান্ড গ্রেনেড, একে ফরটিসেভেন ইত্যাদি। এরা বড় কোন অপারেশনে অংশ নেয়। নারায়ণপুর, অবুঝমার জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় ব্যাটেলিয়ান ৫ ও ব্যাটেলিয়ান ৬ রয়েছে। সুকমা বিজাপুর দান্তেওয়াড়া অঞ্চলে রয়েছে ব্যাটেলিয়ান ১-৪। পার্শ্ববর্তী কাঁকের,

বস্তার; ওড়িশার মালকানগিরি; অন্ধ্রের আদিলাবাদ, ওয়ারঙ্গল; মহারাষ্ট্রের গারচিরোলি প্রভৃতি জেলার সশস্ত্র গেরিলা দলমগুলো সক্রিয়।

বর্তমানে বস্তারে মাওবাদী আন্দোলন যেভাবে দিনে দিনে হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠছে তা পর্যালোচনা করে একটা জিনিস পরিষ্কার মনে হয় যে আশির দশকে এখানে নকশাল আন্দোলনের সূচনা যে সাম্যবাদের চিন্তাধারা ও আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠেছিল আজ তারা যেন সেই চিন্তাধারা থেকে অনেকটাই দূরে চলে যাচ্ছে। যেভাবে মাওবাদীরা পুলিশ সন্দেহে নিরীহ গ্রামবাসীকে জনতার আদালতে গাছের সঙ্গে বেঁধে পাথর মেরে মেরে নৃশংসভাবে হত্যা করে তা এক রকম ভাবে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা কর আদায় করার প্রবণতা দেখে মনে হয় আজ তারা নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রমে ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে। আজ বস্তারের পিছিয়ে পড়া অনুন্নত গ্রামগুলিতে সরকার থেকে কোন স্কুল বা রাস্তা বানাবার চেষ্টা করা হলেই মাওবাদীরা তা ভেঙে দেয়। তাদের ধারণা যে, গ্রামে সরকারি উন্নয়নে সুফল গ্রামবাসীরা পেলে তারা হয়তো মাওবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। নিজেদের স্বার্থে মাওবাদীরা সবরকম উন্নয়নের কাজকে ব্যাহত করে গ্রামগুলোকে সমস্ত রকম সরকারি অধিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত রেখেছে। আদিবাসীরা যদি স্কুলেই না যেতে পারে তাহলে তাদের সার্বিক বিকাশ কীভাবে সম্ভব?

অন্যদিকে আগেই বলেছি সরকার থেকেও অবুঝমারের গভীর জঙ্গলের অনুন্নত গ্রামগুলিতে উন্নয়নের তেমন ভাবে কোন সার্বিক প্রচেষ্টা দেখা যায় না। উপরন্তু স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্পগুলি থেকে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচারের নানান ঘটনা সামনে আসে যার ফল স্বরূপ আজও আদিবাসীরা বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে।

৭

নিরাপত্তা কর্মী জওয়ানরা জীবন দিয়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। নিহত হচ্ছে মাওবাদী ও আদিবাসীরা। কত টাটকা তাজা প্রাণ এই সঙ্ঘর্ষে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে।

সরকার থেকে এখন নানা রকমভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য। দান্তেওয়াড়াতে ৩০০ একর জমির উপর একটা বিশাল হাব তৈরি হচ্ছে যেটা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা নিজ হাতে বানাচ্ছে। সত্যি দেখলে আশ্চর্য হতে হয় এটা ভেবে যে, যে হাত এতদিন বন্দুক নিয়ে নির্দয় ভাবে মানুষ খুন করেছিল, সরকারি স্কুল বা রাস্তা ভেঙ্গে দিয়েছিল আজ সেই হাতই আবার নিজে হাতে ঘর তৈরি করছে নতুন করে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

এই আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা নিজেরাই জঙ্গলে জীবন যে কতটা দুর্বিষহ তা স্বীকার করছে। মাওবাদীদের লুটপাট, গ্রামবাসীদের ধমকানো, সব রকম সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা এগুলো এরা ভালোভাবে নেয়নি ও মাওবাদ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

দান্তেওয়াড়ার এসপি জানালেন যে এই কমপ্লেক্সে থাকবে ১০৮টা বাড়ি, কুড়িটা দোকান, কমিউনিটি সেন্টার, যোগা সেন্টার, জিম সেন্টার ইত্যাদি। এসপির কথায় আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা বন্দুক চালনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তারা যদি পুলিশে ভর্তি হতে রাজি না হয় তাহলে তাদের জন্য কুড়ি রকমের প্রশিক্ষণ যা গ্রামে উপার্জন ও ব্যবসার কাজে লাগবে সেগুলি শেখানো হবে। যেমন কার্পেন্টার, ওষুধের দোকান, মুদির দোকান ইত্যাদি। এছাড়া ট্রাক্টর ও কৃষি কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে যা দিয়ে ওদের কৃষিকাজের ট্রেনিং দেওয়া হবে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ লাভ করার পর তারা যাতে গ্রামে গিয়ে কিছু করতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য ধীরে ধীরে অনেক মাওবাদীই হয়তো আগামী দিনে হিংসা বন্ধ করে আত্মসমর্পণের পথে এগোবে। তবে এটি একটি খণ্ডচিত্র। অরণ্যময় এই বিস্তৃত আদিবাসী অঞ্চল সরকারের দিক থেকে আগে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে আন্তরিকভাবে আদিবাসীদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে তাদের আস্থা অর্জন করতে হবে। তারপর প্রয়োজন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নের অন্যান্য কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পুলিশি অত্যাচার, আমলা-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও নিগ্রহ এবং গ্রাম থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা। পানীয় জল, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির সুযোগ। কৃষি, জলসেচ, বাজার, ফসল সংরক্ষণের উন্নতি। কর্মসংস্থান। আর সবচাইতে জরুরি বন্দুকের ভাষায় পরস্পরকে প্রত্যুত্তর না দিয়ে মাওবাদী ও সরকারের উচিত আলোচনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজে বার করা। অধিকারের লড়াইয়ে বন্দুক নয় গণতান্ত্রিক উপায় হোক তার পথ। সরকারের জরুরি কাজ গ্রামগুলোর ততোধিক গরিব আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

সরকার ও মাওবাদী উভয়পক্ষের সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধিতে হয়তো হিংসা ও অত্যাচারের অবসান ঘটবে ও বস্তারের জঙ্গলে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামগুলিতে নতুন করে সূর্যোদয় হবে যার বিচ্ছুরিত আলোর ঝর্ণাধারায় অবগাহন করে আদিবাসীরা জীবনের জয়গান গাইবে।

পরিশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলি—

> "এই সব মূঢ় ম্লান—মূক মুখে
> দিতে হবে ভাষা-এই শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
> ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে
> মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে"

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের উৎপাদন

জয়দেব গুপ্ত

দৃশ্য ১

কে.জি.তে পড়া তিনবছরের শিশু মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তায় একটা মন্দির পড়লো। মা শিশুটিকে বললেন, ''নমো করো''। বলে, মা নিজেই প্রণাম করলেন। শিশুটিও ঠাকুরের মূর্তির সামনে মাথা নত করলো।

মন্তব্য—অন্ধবিশ্বাসের প্রথম পাঠ শুরু হল। অপরিণত মনে শিশু শুধু জানলো, ঠাকুর দেখলে নমো করতে হয়।

দৃশ্য ২

বাচ্চাটি পা ছড়িয়ে বসে খেলনা নিয়ে খেলা করছিল। ঠাকুমা এসে বললেন, ''দাদুভাই, পা'টা এদিকে ক'রে বসো। বাচ্চাটি অবাক চোখে ঠাকুমাকে দেখল। ঠাকুমা বোঝালেন, দক্ষিণ দিকে পা করে বসতে নেই।

বাচ্চাটি জিজ্ঞেস করলো, ''কেন ঠাকুমা''?

—কেন তোকে জানতে হবে না। যা বলছি, তাই কর। দক্ষিণ দিকে পা ছড়িয়ে বসতে নেই।

মন্তব্য—কুসংস্কারের পাঠও শুরু হল পরিবারের মধ্যেই।

দৃশ্য ৩

ঠাকুরদা জিজ্ঞেস করলেন, ''আজ কি তোমার পরীক্ষা, দাদুভাই?''

—হ্যাঁ, ছেলেটি উত্তর দিল।

—ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে যাও, পরীক্ষা ভালো হবে।

মন্তব্য—অন্ধবিশ্বাসের দ্বিতীয় পাঠ। লেখাপড়া করো না করো, ঠাকুরঘরে প্রণাম করে গেলেই পরীক্ষা ভালো হবে।

দৃশ্য ৪

পাশের বাড়ির বৃদ্ধ মারা গেছেন। তেরো দিনের মাথায় শ্রাদ্ধ হচ্ছে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, ''বাবা ওখানে কী হচ্ছে''?

—ওখানে ঐ পাশের বাড়ির দাদু, যিনি মারা গেছেন, তাঁর আত্মার শান্তির জন্য পুজো হচ্ছে।

—আত্মা কী বাবা?

—মানুষের শরীর মরে যায়, কিন্তু আত্মা মরে না। তাই তার জন্যে শ্রাদ্ধ করতে হয়।

মন্তব্য—অন্ধবিশ্বাস/কুসংস্কারের পাঠ এগিয়ে চলল।

দৃশ্য ৫

আব্বুজান, বন্যার জল বাড়িতে ঢুকে এসেছে। আজ কি আমাদের রান্না হবে না? খাওয়া হবে না? আম্মি তো বলছে সব নাকি ভেসে গেছে। —না বেটা, আল্লার কাছে দোয়া করো। আল্লাই সব ঠিক করে দেবেন। ছেলেটি প্রশ্ন করলো, ''তাহলে আল্লা আমাদের জলে ভাসালেন কেন''? আব্বু ধমকে উঠলেন, ''বাজে প্রশ্ন করো না''।

মন্তব্য— ঈশ্বর/আল্লাহ বিশ্বাসের পাঠ— সব ধর্মেই।

দৃশ্য ৬

—রাজু তোমার বন্ধুর নাম কী বাবা?—ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম 'সেলিম' ঠাম্মা।

—মোছলমান! তোমার বন্ধু মোছলমান? সেলিম, তুমি বাড়ি যাও। আর রাজু, তুমি কোনদিন ওর সঙ্গে খেলবে না।

মন্তব্য—এবারে ধর্মান্ধতার পাঠ।

দৃশ্য ৭

বাবুসোনা, তুমি কার সঙ্গে খেলছিলে?

—ঐ তো, ওর নাম রামদীন, আমার বন্ধু।

—কোথায় থাকে?

—ঐ যে কারখানার পাশে যে জুতো সারাই-এর দোকানটা আছে—ঐ কাকুটার ছেলে তো।

—ছিঃ বাবুসোনা, তুমি মুচির ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছো? জানো না ওরা ছোটো জাত? ওর সঙ্গে তোমায় যেন কোনদিন মিশতে না দেখি।

মন্তব্য—জাতপাতের বৈষম্য ঢোকানো হল শিশুর মাথায়।

(এমন হাজারো উদাহরণ দেওয়া যায়)

এই ভাবেই আমরা অপরিণত শিশুর মগজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাতপাতের বিদ্বেষ ভরে দিই। যে বিচার বুদ্ধি পরিণত হয়নি —ঠিক ভুল সত্য মিথ্যা বিচার করার বয়স হয়নি—কোন এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে আমাদের মস্তিষ্কে জমে থাকা আবর্জনাগুলো পরবর্তী প্রজন্মের মস্তিষ্কের কোষে ঠেসে দিই। এগুলো সহজে মোছা যায় না। হাজারবার বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদের পাঠ পড়লেও ঐ সব চিন্তাগুলো অচল হয়ে মগজে বসে থাকে।

তবে শুধু মাত্র আমরাই নয়, হাজার হাজার বছর ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ভাবেই পরম্পরায় এই সব মিথ্যে জঞ্জাল, আবর্জনাগুলো পরের প্রজন্মের মাথায় ভরে চলেছি। যুক্তি, প্রমাণ দিয়ে বোঝালেও এই বিশ্বাসগুলো এমন স্থবির হয়ে বসে থাকে যে বুঝলেও মানুষ মেনে নিতে পারে না কারণ তাহলে যে নিজের (অন্ধ) বিশ্বাসকেই ভুল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। আর সেইজন্যেই অপ্রমাণিত ঈশ্বর, আত্মা মগজের কোণে এঁটে বসে থাকে।

আর তাই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকও গ্রহণ শেষে গঙ্গাস্নানে যায়।

মগজের এই সব ভুল তথ্যগুলোকে নিজের শিক্ষা থেকে মুছে ফেলতে তাই যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞান মনস্কদের নিজের সঙ্গে ভীষণ লড়াই করতে হয়। সেই মানসিক লড়াই জিততে হয়। তাই তো বলি, বিজ্ঞামনস্ক, যুক্তিবাদী হওয়া সহজ নয়।

বিচারের বাণী...

শুভাশিস চট্টোপাধ্যায়

ছোট বেলায় আমাদের সময় সিনেমায় প্রায়শই দুটো ডায়লগ শুনতাম। কানুন কা হাত বহুত লম্বি হ্যায়, আর দ্বিতীয়টা হল আইন সবার জন্যই সমান। সাতের দশক আর আটের দশকে যাদের বাল্যকাল, শৈশব কেটেছে তাদের মনে এই ধারণা প্রথিত হয়ে গিয়েছিল যে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র সবাই এক, সবাই সমান। তার একটা কারণও ছিল বটে। আমার মতো যাদের চুলে পাক ধরেছে, যারা পায়ে পায়ে অর্ধ শতক পার করে ফেলেছেন বা ছুতে চলেছেন তাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে সাতাত্তর সালে এলাহাবাদ হাই কোর্টের সেই ঐতিহাসিক রায়ের কথা। যে রায়ে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের নায়ক প্রবল প্রতাপান্বিত ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি কেঁপে গিয়েছিল। শুধু মিসেস গান্ধিই বা কেন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনার উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে। তা সে পশুখাদ্য মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আরজিডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবই হোন বা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা। দুর্নীতি মামলায় শাস্তির খাঁড়া এড়াতে পারেন নি রাজনীতির অনেক রথি-মহারথিই। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষায় আজাদীকা অমৃত মহোৎসব, দ্বার প্রান্তে এসে আমার সেই বিশ্বাস কিছুটা হলেও কিন্তু টোল খেয়েছে। কিন্তু কেন? সেই কথাই একটু বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করছি।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ তিনটি। আইনসভা বা পার্লামেন্ট, বিচার ব্যাবস্থা বা জুডিশিয়ারি আর তিন নম্বরটি হল আমলাতন্ত্র বা বুরোক্রেসি। মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমকে অনেকেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলেন বটে, কিন্তু তার কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। স্বাধীনতার পচাত্তর তম বর্ষপূর্তির দ্বার প্রান্তে দাড়িয়ে রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের উপর মানুষ বীতশ্রদ্ধ। তার কারণ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী ও দলগুলির লাগাম ছাড়া দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার। আমলাতন্ত্রের উপরও মানুষ একই কারণে তিতি বিরক্ত। দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে সেখানে দোসর হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে শিরদাঁড়া বিকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। চতুর্থ স্তম্ভ বলে কথিত সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধেও নির্ভীক তথ্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন না করে শাসকদলের পদলেহন করার অভিযোগ বার বার উঠেছে বা উঠছে। বাকি ছিল শুধু জুডিশিয়ারি বা বিচার বিভাগ। অধিকাংশ মানুষই এখনো বিশ্বাস করেন রাষ্ট্রের উৎপীড়নই হোক বা ধনী, প্রবল প্রতাপশালি কোনো পক্ষ, কোনো অন্যায় অবিচার হলে আদালতের দরজায় গেলে তিনি ন্যায় বিচার পাবেন, তা যত দেরিই হোক না কেন।

আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন। হাজারো উদাহরণের মধ্যে হাতে গরম দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথমেই আসি জিডি বিড়লা গ্রুপ অফ স্কুল প্রসঙ্গে। করোনা কালে যে সব পড়ুয়ার অভিভাবকরা স্কুল নির্ধারিত ফিস দিতে পারেন নি, তাদের সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না কোনও বেসরকারি স্কুল। আটকানো যাবে না প্রমোশনও। ক্লিয়ার ভার্ডিক্ট। ছয় এপ্রিল এই রায় দেন কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধায়। আর সেই দিনই রাতের অন্ধকারে স্কুল গেটের সামনে নোটিশ ঝুলিয়ে আইন শৃঙ্খলা জনিত কারণ দেখিয়ে জিডি বিড়লা, অশোক হল, মহাদেবী বিড়লা শিশু বিহার সহ নিজেদের পাঁচটি স্কুল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয় বিড়লা গ্রুপ। তিনদিন পর নয়ই এপ্রিল ফের স্কুল গেটে নোটিশ দিয়ে তারা জানায় এগারোই এপ্রিল থেকে স্কুল খুলবে বটে, কিন্তু তাদের চাহিদা অনুযায়ী যারা যারা কড়ায় গণ্ডায় সমস্ত ফিস মিটিয়ে দিয়েছে তাদের সন্তানরাই স্কুল গেটের চৌকাঠ পার হতে পারবে। শুধু নোটিশ দিয়ে ঘোষণাই নয়, বুক ঠুকে তারা তা করেও দেখিয়েছে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো নিশ্চুপ মহামান্য আদালত। আর এখানেই জাগছে প্রশ্ন। কাদের মদতে তারা এমন আদালত অবমাননার মতো কাজ বুক ঠুকে করতে পারে? পিছনে বড় কোনো হনু না থাকলে তো এ কাজ করার সাহস পাওয়া যায় না। একশো পয়তাল্লিশটা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের মধ্যে একশো চল্লিশটা স্কুলই হাইকোর্টের দেওয়া অর্ডার মেনে নিল নির্দ্বিধায়। আদেশ অমান্য করল কেবল জিডি বিড়লা গ্রুপের পাঁচটি স্কুল। একটু ভাবুন তো? যদি আমি, আপনি বা রাম, শ্যাম, যদু, মধু এই দুঃসাহস দেখাতো, তাহলে তাদের এতক্ষণে কি দশা হতো? হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় মানছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। আদালত অবমাননার দায়ে আদালতেরই স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে শাস্তি দেওয়া উচিত, কিন্তু আজও সেই মামলা ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য উঠলই না। করোনা কালে দু বছর স্কুল কলেজ বন্ধ থাকার পর সবে খুলেছে। ছোট ছোট শিশুরা ইচ্ছা থাকা সত্বেও স্কুল যেতে পারছে না। তাদের মনের উপর কতটা চাপ পড়ছে তা বুঝতে মনস্তত্ত্ববিদ হতে হয় না। বয়সন্ধির ছেলে মেয়েরা যদি কোনও চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে হুট করে, তার দায় কে নেবে? রাষ্ট্র না বিচার ব্যবস্থা? ফেরত আসবে তো সেই অমূল্য জীবন?

এই পোড়া দেশে যে যত বড় চোর তার তত নাম তত ক্ষমতা। গরু, কয়লা, বালি চুরির নেতা সিবিআইয়ের সমনের পর এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি হয়ে নিশ্চিন্তে থাকেন। এসএসসি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ের ওপর তড়িঘড়ি অন্তর্বর্তী স্টে অর্ডার পেয়ে যান তেরোই মে পর্যন্ত। আর ছ-বছর ধরে আইনি লড়াই চালিয়ে আসা শিক্ষিত যুবকেরা রাতে ফুটপাথে শুয়ে আন্দোলন করেন ন্যায্য চাকরির দাবিতে। তাও তারা স্বপ্ন দেখে একদিন তারা সঠিক বিচার পাবে।

আদালতকেই এখন প্রমাণ করতে হবে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে সত্যি সত্যি কাঁদে কিনা। অর্ধ শতাব্দী আগে একদল নষ্টমতি যুবক যুবতী রাষ্ট্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বলেছিল বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ফেল, সংসদ শুয়োরের খোয়াড়। ইয়ে আজাদি ছুটা হ্যায়, দেশ আভিতক ভুখা হ্যায়। আবেগের আতিশয্যে তারা হয়তো

ভুল করে ফেলেছিল, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। কিন্তু তাদের তোলা প্রশ্নের অভিঘাতে কেঁপে উঠেছিল স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত। তাদের ভাবনায় বিনয় নয়, স্পর্ধা ছিল। অনেক কষ্টে, অনেক রক্ত, জীবনের বিনিময়ে রাষ্ট্র সামাল দিয়েছিল তা। গণতন্ত্রে আস্থা ফিরেছিল দেশবাসীর। এখন সময় বদলেছে। সত্যি এ এক নষ্ট সময়। কিশোরদের সামনে আদর্শ নেই, যুবকদের হাতে কাজ নেই। বদলে গেছে আমাদের চিন্তাও। এখন একটাই চিন্তা নিজে কি করে ভাল থাকা যাবে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তাই একদল অভিভাবকের সঙ্গে অপরদল অভিভাবকের ঝগড়া লাগিয়ে দিতে সফল বিড়লারা। ও ওর বাচ্চার স্কুল ফিজ দিতে পারে নি, তার জন্য আমার বাচ্চা কেন সাফার করবে। চূড়ান্ত এক সুবিধাবাদী হিসেবে আত্মজ-আত্মজাদের গড়ে তুলছি আমরা। আর ব্রিটিশদের দেখানো এই ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিশিই অনুসরণ করছে বিড়লারা।

ফের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে দেশ, রাজ্য। রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাহাড় প্রমান দুর্নীতি, বেকারত্বে বাড়ছে ক্ষোভ। এরপর যদি বিচার ব্যবস্থার প্রতিও মানুষের শেষ ভরসাটুকু সরে যায় তা কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি সুখকর নাও হতে পারে।

অসময়ের ডায়েরি থেকে

বাবুয়া চৌধুরী

ফেব্রুয়ারি ২০২০

আমার ফেসবুকের বন্ধুতালিকায় কয়েকজন সবজান্তা আঁতেল আছেন। তাঁদের ধারণা পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারে তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। যখন বোঝেন যে নিজের নামে মতামত প্রকাশ করলে গালাগালি খাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তখন 'স্বামী বিবেকানন্দ, চাণক্য, আবুল কালাম বা হুমায়ুন আহমেদ' এর ছবি দিয়ে সেই বক্তব্যগুলোই পেশ করেন। ঐ সব মণীষীরা সেই সব অবান্তর কথা কবে বলেছিলেন সেই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, খুঁজেও দেখে না। এইরকমই এক পোষ্টে দেখলাম—'আমরা নর্দমায় পরা বল তুলে তিনবার ড্রপ দিয়ে নিয়ে খেলা শুরু করতাম, করোনা আমাদের কী করবে?'। ফেসবুকে অকুতোভয় বাঙালি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। খবরের কাগজে বা টিভিতে তখনও 'করোনা' সেইরকম আভিজাত্য পায়নি। NRC আর CAA নিয়ে মাঝ ডিসেম্বর দিল্লীর শাহিনবাগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই জের চলছে। শাহিনবাগে মূলত নারীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করেন তারপর সেই আন্দোলনের ছোঁয়া ক্রমশ লাগে কোলকাতার পার্ক সার্কাসে, উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন আর মিছিল-মিটিং-এ সীমাবদ্ধ থাকলো না। ঐতিহ্য মেনেই পথ অবরোধ, ট্রেন পোড়ানো, লাইন ওপড়ানোর মত স্বাভাবিক আন্দোলনের পর তখনও উত্তরবঙ্গ আর কোলকাতার মধ্যে ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক নয়। তার উপর দিল্লীতে দাঙ্গায় ৫৩ জনের মৃত্যুর মাঝেই বিধানসভা ভোট এবং ভারতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগমন—এইসব নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের হাতে অনেক রসদ। আর তখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে মাত্র একজনের শরীরেই করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে, আর তিনিও চীনের উহান প্রদেশ থেকে এসেছেন।

ঠিক এইরকম এক সময়েই চৈত্র সেলে স্টক ক্লিয়ারেন্সের আদলে আমাদের পাড়ার দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, চলচ্ছক্তিহীন, আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত এইরকম বয়স্ক মানুষেরা টপাটপ মারা যেতে লাগলেন। দশ দিনের মধ্যে আঠারো জন। শেষের দিকে এমন অবস্থা হয়েছিল যে শ্মশানে যাওয়ারও লোক পাওয়া যাচ্ছিলো না। ওদিকে খবর পাওয়া গেল চিন নাকি উহান প্রদেশকে সম্পূর্ণ সিল করে দিয়েছে যাতে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের কোনো ধরনের শারীরিক সংস্পর্শ না হয়। এটাই নাকি তখনও পর্যন্ত সেই করোনা সংক্রমণ আটকানোর একমাত্র পদ্ধতি। তারপরেও চিনে অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পরছে সংক্রমণ, কিন্তু বেজিং-এ চিনের রাষ্ট্রনেতারাও এই ভয়াবহতাকে অস্বীকার করতে চাইলেন। ওদিকে ইটালিতে, আমেরিকাতে, বৃটেনে ছড়িয়ে পড়ছে জীবাণু, সংক্রমণ ছাড়াচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত হারে। জানুয়ারির শেষদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) করোনা ভাইরাস সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার বিপদ নিয়ে ঘোষণা করেছিল 'এই ভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্ব স্তরে একটা জরুরি জনস্বাস্থ্যের বিষয়', কিন্তু বহু দেশের রাষ্ট্রনায়করা এই বিষয়ে একমত হলেন না। এর আগে ইতালিতে 'হাগ এ চাইনিজ' কর্মসূচি পালন হয়েছে। ইতালিতে ফ্লোরেন্সের মেয়র দারিও নারদেল্লা এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা। নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁরা যেন ইতালিতে বসবাসকারী একজন চিন দেশের নাগরিককে জড়িয়ে ধরে সেই ছবি সোশাল মিডিয়াতে পোষ্ট করেন। এতে চিনের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে জীবাণু ছড়ানোর যে অভিযোগ উঠছে এবং তার কারণে ভিনদেশে বসবাসকারী চিন এবং মধ্য এশিয়ার অনেক মানুষের বিরুদ্ধে সেই দেশের নাগরিকদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন তার বিরুদ্ধেই এই প্রচার। প্রচার শুরু হয় ১লা ফেব্রুয়ারি, ইতালিতে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়ার ঠিক একদিন পরেই।

মার্চ ২০২০

এখনও পর্যন্ত সবকিছু স্বাভাবিক লাগছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ, উচ্চমাধ্যমিক চলছে। দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় হঠাৎ করেই বাজারে পোল্ট্রী মুর্গি আর ডিমের দাম হু-হু করে কমতে শুরু করল। কোথাও খবর বেরিয়েছিল মুর্গি আর ডিমের মধ্যে করোনার জীবাণু বাসা বাঁধছে। খেলেই সর্বনাশ। আমি যেদিকে কাজে যাই সেখানে নদীর ঘাট পেরিয়ে যেতে হয়। সেখানেই ঝুড়ি-ঝুড়ি মুর্গি বিক্রি হচ্ছে

৫০ টাকা করে পিস। নিতে ইচ্ছে করত, কিন্তু কেটে দেবে কে? জ্যান্ত মুর্গি বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর কালিপটকায় আগুন দেওয়া একই ব্যাপার, পট্-পট্-পট্-পট্ করে ফাটতেই থাকবে। ইতিমধ্যে ১৩ই মার্চ ভারতীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছে 'করোনা ভাইরাস কোনো হেলথ ইমার্জেন্সির বিষয় নয়'। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বললেন ''কেন্দ্র এন.আর.সি-সি.এ.এ থেকে নজর ঘোরাতে 'করোনা- গুজব' ছড়াচ্ছে''। তখনও ১৩৫ কোটির দেশে ৮০ জন আক্রান্ত। একই ধরনের কথা শোনা গেল ডোনাল্ড ট্রাম্প বা বোলসোনারোর মত রাষ্ট্রনেতাদের কণ্ঠে।

২১ শে মার্চ এ বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্থগিত হয়ে গেল। আগামিকাল জনতা কারফিউ। ছুটলাম বাজারে। বাজারে মুরগির দাম আরোও কম, ৭০ টাকায় দুটো। দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছিল, চটপট কিনে ফেললাম। সাথে একপাতা ডিম (৩০টা) ৭৫ টাকা দিয়ে। সাড়ে তিন কেজি মাংস ৭০ টাকা দিয়ে আমার জ্ঞানত কিনিনি বলেই মনে হয়। বাড়িতে ফেরার পর যথারীতি তুমুল অশান্তি শুরু হল, ফ্রিজে জায়গা নেই।

২২শে মার্চ সকাল। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল, চারদিকে কোনও আওয়াজ নেই। বড় রাস্তার ধারে বাড়ি হওয়ার কারণে সকাল ৫ টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত গাড়ি, বাইক, ট্রাক, অটো, টোটো, বিজ্ঞাপন চলতেই থাকে। হঠাৎ করে আসা নিঃশব্দের জগতে ঘুম তো গাঢ় হবেই। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে পাখির ডাক। প্রতি মাসে অন্তত একদিন এরকম রাখলে মন্দ হয় না। বিকেল ৫ টার সময়ে চারদিক থেকে হৈচৈ-এর আওয়াজ আসতে লাগল। প্রথমে থালা, বাটি বাজাতে বাজাতে এবং কারো নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে জনা কুড়ি অল্প বয়সী ছেলে গেল। তাদের আওয়াজ মিলিয়ে গিয়েছে কী যায়নি এমন সময় দূর থেকে আবার একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আওয়াজটা ক্রমে স্পষ্ট হল, হ্যাঁ খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন পরিবেশন করতে করতে আসছেন একদল মানুষ, সংখ্যাটা ৫০ থেকে ৭০ হবে। বিকেল পাঁচটায় নিজের বাড়িতে থেকেই কোভিড যোদ্ধাদের সন্মানার্থে হাততালি দেওয়ার কথা, কিন্তু এটা কিরকম ব্যাপার হল? নীচে গিয়ে টিভি চালালাম। শুধু আমার এখানেই নয়, সর্বত্র এই একই ঘটনা দেখা গিয়েছে। মানুষ দলে দলে রাস্তায় নেমে যথেষ্ট আওয়াজ করে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এইবার একটা ভিডিও দেখা গেল, যেটা পরবর্তী সময়ে প্রায় ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলেছিল। তিনজন মানুষ একটি চায়ের দোকানে চা খাচ্ছেন আর এক মহিলা মোবাইল ক্যামেরায় ভিডিও করতে করতে তাঁদের উচ্চস্বরে দোষারোপ করছেন।

মার্চের ২৩ তারিখ, আগামীকাল থেকে সবকিছু বন্ধ। সম্পূর্ণ লকডাউন। প্রাথমিকভাবে অল্পদিনের জন্যে। কিছু জরুরি জিনিস কিনে রাখার জন্যে বেরোলাম। রাস্তায়, বাজারে সর্বত্র প্রচন্ড ভিড়। কোনো দোকানেই দাঁড়ানোর জায়গা নেই। পারলে সারা বাজারের যত জিনিস আছে সব কিনে মজুত করতে হবে এরকম একটা ব্যাপার। ৮৫০ টাকা বস্তার চাল বিক্রি হচ্ছে ১১৫০ টাকায়। আমি ভাবলাম কয়েকটা ম্যাগি কিনে রাখি, কিন্তু বাজার থেকে ম্যাগি ভ্যানিশ, কোথাও নেই। মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যের মধ্যে ম্যাগি ঢুকে গিয়েছে। কয়েকবছর আগে এই ম্যাগিতেই সীসা পাওয়া যাচ্ছিল না? যাইহোক ওই ভিড়ের মধ্যে কিছুতেই সুবিধে করতে পারলাম না। কিছুই কেনা হল না, খামোখা এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলাম।

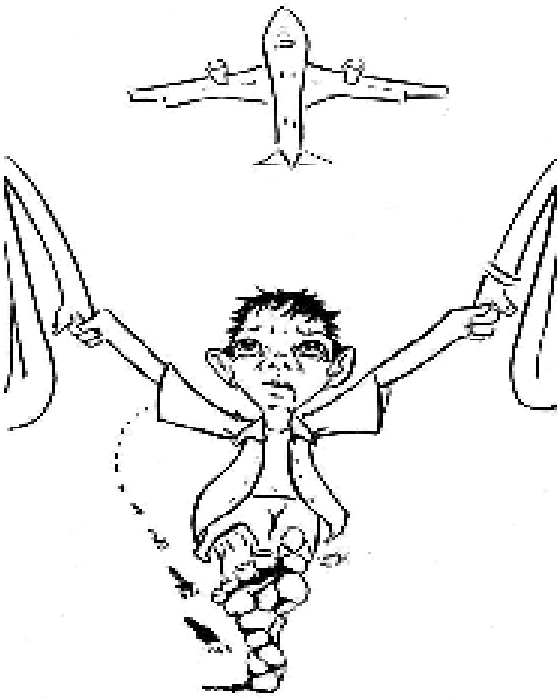

কত দূর? আর কত দূর??
বলো মা —

পরদিন থেকে সব বন্ধ। শুরু হল লকডাউন। রাস্তায় বেরোলেই পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করছে আর সুযোগ পেলেই বেদম ঠ্যাঙাচ্ছে। নিরীহ মানুষকে মারার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে, সেই আনন্দ থেকে কেই বা বঞ্চিত হতে চায়? ছেলের জন্যে আমুলস্প্রে কিনতে গিয়ে সামনের বাড়ির গোবিন্দ খালি হাতে পেছন ফুলিয়ে বাড়ি ফিরেছে। ২৬-২৭ তারিখ নাগাদ মাসের বাজার অনলাইনে অর্ডার করে দিলাম। এপ্রিলের প্রথম দিকেই ঢুকে যাবে সারা মাসের রসদ। সারদিন অন্তত ১০-১৫ বার বাড়ির সামনে দিয়ে মাইকে করে করোনা সতর্কবার্তা যাচ্ছে। দিনের বেলায় সেরকম কিছু মনে হয় না, কিন্তু রাতের দিকে সেই আওয়াজ শুনলে কেমন ভয় ভয় লাগে, গা ছম্-ছম্ করতে থাকে, কোথাও কোনো আওয়াজ নেই শুধু একটা মাইক চলেছে মৃত্যুপরোয়ানা নিয়ে, মনে হয় কোনো নিকটাত্মীয় যদি আক্রান্ত হয় তখন কী হবে?

এপ্রিল ২০২০

শুরুতেই মাথায় হাত। যে দোকান থেকে অনলাইন ডেলিভারি দেওয়ার কথা তারা ছোট্ট একটা মেসেজ করে জানিয়ে দিল জিনিসপত্র দিতে পারবে না। নন্দ ঘোষ কি কি দোষের ভাগী হয়েছিলেন, সেই ব্যাপারে

আমার ধারণা নেই, কিন্তু বাড়ির সবাই 'আগেভাগে কেন খাদ্য মজুত করে রাখা হয় নি'—এই নিয়ে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে নানাভাবে হেনস্থা করা শুরু করে দিল। যা চাল আছে তাতে আরও দুদিন মতো যাবে। বাকি ডাল মশলাপাতি টেনেটুনে দিনপাঁচেক। রাস্তায় বেরোলেই পুলিশি তাড়া। রাত ৯টা নাগাদ বেরোলাম চুপচাপ, হাতে একটা টর্চ আর পকেটে নতুন ইনহেলারের প্যাকেট। জ্যাঠামশাইয়ের শেষ সময়ে কেনা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবহার হয়নি, পুলিশ তাড়া করলে দেখাবো। বাজারের ভেতরটা শুনশান অন্ধকার, কোথাও কেউ নেই, সামান্য শব্দও নেই, আমার পায়ের আওয়াজ নিজের কাছেই ভুতুড়ে ঠেকছে। আমি বাড়ির সাথে লাগোয়া কোনো মুদির দোকান খুঁজছি। এই একটা পাওয়া গেল। শাটারের বাইরে একটা কাগজ সাঁটা, তাতে দুখানা ফোন নম্বর লেখা। প্রথমটা ইংরাজিতে পরেরটা হিন্দিতে। প্রথমটাতেই ফোন করলাম। মালিক দোতলাতেই থাকেন। রিং হওয়া মাত্র ফোন ধরলেন এবং অল্প সময়েই নেমে এলেন। আমার সমস্যা শুনে বললেন এই নম্বরেই হোয়াটস্-অ্যাপ করে ফর্দ পাঠিয়ে দিতে। রেডি হয়ে গেলে উনি জানাবেন, আমাকে এসে নিয়ে যেতে হবে। ভালো কথা, কিন্তু নিয়ে যাবো কিভাবে? উনি বললেন, ''আমি তুমার বাইকে বাঁধিয়ে দিব, তুমি লিয়ে চলে যাবা, পরবা না?'' এই প্রথমবারের জন্য আমি বুঝতে পারলাম সামনে ভয়াবহ বিপদ।

সারা পৃথিবীজুড়ে লকডাউন। খবর অনুযায়ী সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ইতালিতে। টিভিতে, কম্প্যুটারে দেখছি রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে যাওয়ার লোক নেই। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে আগে থেকেই গণ কবর খুঁড়ে রাখা হচ্ছে। অধিবাসীরা সেই 'হাগ এ চাইনিজ' কর্মসূচিকেই দোষারোপ করছেন। এদিকে আমাদেরও আতঙ্ক বাড়ছে। রাতে শোওয়ার সময় প্রত্যেকদিনের মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা দেখছি হু হু করে বাড়ছে। আগামীকাল কী হবে?

পরদিন সকালে শুনলাম বাইরে কেউ গেট ঝাঁকাচ্ছে। গেটে সারাদিনরাত তালা দেওয়া থাকে, যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে চট করে ঢুকে পড়তে না পারে। রান্নার লোক বন্ধ, কাজের মাসি বন্ধ, খবরের কাগজ বন্ধ, শুধু সবজি নিয়ে একজন আসে বিক্রি করতে। তাহলে কে এলো? বেরিয়ে দেখলাম একজন বুড়ি এক ব্যাগ শাক নিয়ে দাঁড়িয়ে। সারা গা গিয়ে ঘাম ঝরছে। সে বাজারে শাক বিক্রি করত, পুলিশ তুলে দিয়েছে। সে এখন সকাল সকাল বেরোয়, বাড়ি বাড়ি শাক নিয়ে। হ্যালেঞ্চা আর ঢেঁকি শাক নিয়ে নিলাম। তারপর থেকে প্রত্যেকদিন আসা শুরু করল। রোজ অত শাক কে খাবে? নষ্টও হয়, এবারেও সেই আমিই হলাম নন্দ ঘোষ। রাগ হয়ে গেল। একদিন ডাক শুনেও দরজা খুললাম না। পরে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখি বারান্দার রেলিং-এর উপর সেদিনের বরাদ্দ হেলেঞ্চা আর ঢেকি শাক রেখে গিয়েছে। তার কিছুদিন পর হঠাৎই তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। সে আর কোনোদিনই আসেনি, লকডাউন ওঠার পর কোনো বাজারেই আর তাকে দেখিনি।

১লা বৈশাখ ১৪২৭

পয়লা বৈশাখকে মজা করে বলতাম 'একলা' বৈশাখ। ২০২০ দেখিয়ে দিল বৈশাখের প্রথম দিনে একলা থাকা কাকে বলে। কোথাও কেউ নেই, যা আছে সবই ভার্চুয়াল। কম্প্যুটার বন্ধ হলেই সেই জগতে প্রবেশ নিষেধ। লকডাউনের প্রাথমিক মেয়াদ ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত হলেও পরে তা আবার বেড়ে গিয়েছে ৩ মে পর্যন্ত, কাজেই সব চিচিং বন্ধ। আমাদের ছোট শহরে অনেক কটা জায়গায় ছোট ছোট অনুষ্ঠান হত। নাচ, গান, কবিতা, নাটক ঘুরে ঘুরে দেখতাম। এবার চারদিকে শুধু শূন্যতা, সংখ্যা বাড়ছে শুধু আক্রান্তের তালিকায়। তালিকায় প্রথম মহারাষ্ট্র, আক্রান্ত পাঁচ হাজার। এর মধ্যেই ১৬ই এপ্রিল ওই রাজ্যের পালঘরে দুজন সন্ন্যাসী সহ তিনজনকে ২০০ জন গ্রামবাসী খুব সহজে বাঁশ, লোহার রড, ইঁট, পাথর ইত্যাদি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ঘটনাটা ঘটে সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতিতে। মৃত সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন চিকানে মহারাজ কল্পবৃক্ষগিরি, সত্তোর্ধ, বাকি দুজন ছিলেন সুশীল গিরি মহারাজ এবং গাড়ির চালক নীলেশ তেলেঙ্গে।

আমি চাই, ফিরে যেতে সেই গাঁয়ে বাঁধানো বটের ছায়ে, সেই নদী তীর...

পেশাগত কারণে ভিনরাজ্যে বসবাস করেন বহু মানুষ। এই লকডাউনে হঠাৎই বিপদে পড়ে গেলেন তাঁদেরই সিংহভাগ। বহুজাতিক সংস্থায় কম্প্যুটার সফটওয়ার বা তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত কর্মীরা বাড়িতে বসে কাজ করার সুযোগ পেলেও বাকিদের সেই সুযোগ রইল না। যাঁরা নির্মাণ শ্রমিক, জরি-শ্রমিক বা যাঁরা বিভিন্ন খাবার হোটেলে কাজকর্ম করতেন তাঁরা প্রথমেই কাজ হারালেন। প্রথম ক'দিন মজুত খাবারে চলল আর সেটাও ফুরিয়ে এল খুব দ্রুত।

এবারে করতে হবে খাবারের সন্ধান। সরকার পরিচালিত কম্যুনিটি কিচেন বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেওয়া খাবারের জন্যে লাইনে দাঁড়ানো শুরু হল। দুপুরের খাবারের জন্যে সকাল ৬টা থেকে লাইন দিয়ে হয়তো বেলা ১টার সময় খাবার পেতেন কপাল ভালো থাকলে, কোনো কোনো দিন হয়তো খাবারই জুটতো না। প্রধানত মহারাষ্ট্র, কেরালা, রাজস্থান, গুজরাট, দিল্লী এই রাজ্যগুলিতেই কাজের সন্ধানে যান এদিকের মানুষ, আবার ঠিক সেই রাজ্যগুলোতেই সেই সময় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এই অসময়েই সেই সব মানুষদের 'পরিযায়ী শ্রমিক' তকমা লাগিয়ে দিল।

উপার্জন করে বাড়িতে পাঠানোর পর যেটুকু টাকা জমাতে পেরেছিলেন তা দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। বাড়িভাড়া দিতে না পারায় বাড়ির মালিকও আর রাখতে চাইলেন না। অনেক সংস্থা বাড়ি ভাড়া করে সেখানে শ্রমিকদের রাখতেন, তাঁরাও ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। আগেই খাওয়া বন্ধ হয়েছিল এবারে বাসস্থানও চলে গেল। তাঁরা আশ্রয় পেলেন শ্রমিকশিবির গুলিতে। কিন্তু কোন রাজ্য থেকে কত শ্রমিক বাইরে কাজ করেন তার বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকায় অচিরেই বিপদে পরলেন সেই শ্রমিকরাই। শিবিরগুলিতে ভয়ঙ্কর ভিড়, খাবারের লাইনে মারামারি এই সব ঘটনা এক ধাক্কায় 'খুশি-খুশি' ব্যাপারের বেলুনটাকে ফুটো করে দিয়েছে।

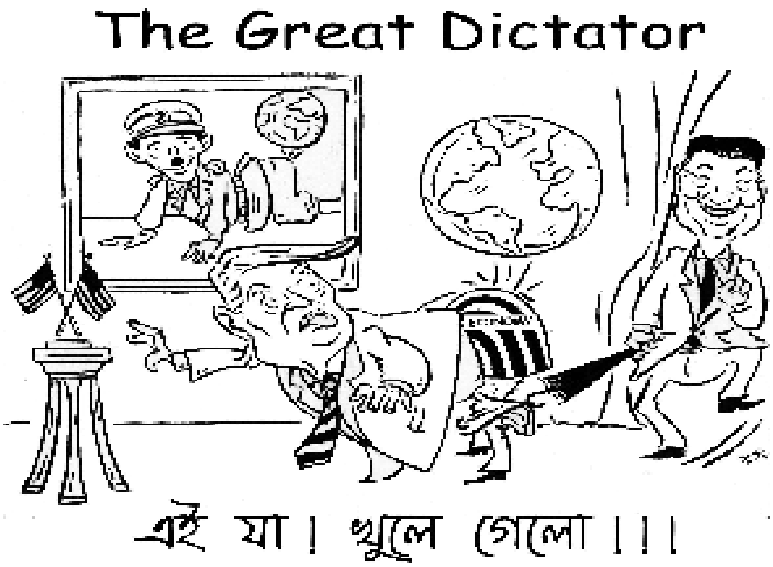

প্রযুক্তির বাড়াবাড়ি রকম বিস্ফোরণে শ্রমিকদের অন্ন বা বাসস্থান না থাকলেও একটা করে স্মার্ট ফোন রয়েছে আর তাতে আছে সীমাহীন কল আর ডাটা। সেইসব ফোন থেকেই তাঁরা ভিডিও আপলোড করে তাঁদের অবস্থার কথা নিজ নিজ রাজ্যের সরকারকে জানানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু ডাটা তো খাওয়া যায় না, সে লিমিটেডই হোক বা আনলিমিটেড। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন চলছে দোষ চাপানোর পর্ব। প্রত্যেকবার ভোটের আগে এই সব পরিযায়ী শ্রমিকদেরই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখি। গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি সার্ভে হয়। পার্টির খরচায় শ্রমিকদের ভোটের আগে বাড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। বুথ লেভেলে পার্টির কাছে শ্রমিকদের ব্যাপারে একটা তথ্যভান্ডার অবশ্যই থাকা উচিত। কিন্তু সেই সব তথ্য প্রকাশ্যে আসলে রাজ্যগুলির বর্তনাম অবস্থা সবার সামনে চলে আসবে তাই ব্যাপারটা বেমালুম চেপে দেওয়া হল।

শ্রমিকরা এই কদিনে বুঝে গিয়েছেন পৃথিবীতে একমাত্র আশ্রয়স্থল তাঁদের নিজেদের বাড়ি, নিজের দেশে। কিন্তু বাস ট্রেন সব বন্ধ- সেখানে ফিরবেন কিভাবে? করোনার হানা, পুলিশের লাঠি, অনিশ্চিত ভবিষ্যত এবং থমকে থাকা বর্তমানকে নিয়ে তাঁরা নেমে পড়লেন রাস্তায়। হেঁটেই ফিরবেন বাড়িতে। সবাই একা নয়, অনেকেরই পরিবার রয়েছে, ছোট সন্তান রয়েছে। ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে তাঁরা হাঁটা শুরু করেছেন বাড়ির উদ্দেশ্যে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কেরালা, দিল্লী থেকে তাঁরা হেঁটে ফিরবেন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা বা নাগাল্যান্ডে। ঠিক কত কিলোমিটার হাঁটলে পরে নিজের ঘর আসবে সেটুকু বুঝি গুগ্‌ল ম্যাপ বলে দেবে।

ধীরে ধীরে আতঙ্ক গ্রাস করছে। বাড়ির বাইরে না বেরোলেও বা বাড়িতে কেউ না আসলেও ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি বা স্যানিটাইজার ঘষছি হাতে। স্যানিটাইজারের দাম ভীষণ চড়া, ১০ এম. এল. এর একটা ছোট্ট শিশির দাম ৯০ টাকা। সেটাই কিনে এনেছি। দিনে রাতে দেখছি সংক্রমণের হার, মৃত্যুহার। টিভিতে কোনো ভালো খবর নেই। সবাই যে একইরকম ভাবে বিপদে পড়েছে তা কিন্তু না। অনেকেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকদিন নানাবিধ খাবার দাবারের আয়োজন করছেন এবং সবাইকে দেখানোর জন্যে সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে সেঁটে দিচ্ছেন। বহু মানুষ কাজ হারালেও অনেকের রোজগার কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে, যদিও তাঁদের সংখ্যাটা খুব বেশি নয়, অবশ্য আমাদের দেশের চিরাচরিত রীতি অনুসারে সম্পদের সিংহভাগ ভোগ করেন সমাজের ১ শতাংশ মানুষ। যতদিন লকডাউন চলবে ততদিন তাঁদের ভালো। পেট্রলের দাম নাকি বিশ্ববাজারের উপর নির্ভরশীল। এই মাসের ২০ তারিখে বিশ্ববাজারে পরিশোধিত পেট্রলের দাম ছিল জলের থেকেও কম, ভারতীয় মুদ্রায় ১২টাকা/লিটার, যেখানে এক বোতল জল কিনতে হয় ১৫টাকা দিয়ে। এই সময়েও ভারতবর্ষে পেট্রলের দাম বেড়ে গিয়েছিল।

হেঁটেই চলেছেন শ্রমিকরা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কত শ্রমিক বাইরে কাজ করেন তার আদৌ কোনো ধারণা ছিল না, কাজেই তাঁদের নিয়ে কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনাও রাতারাতি করে ফেলা সম্ভব নয়, তাও সম্ভব হত যতি তার সাথে কোনো তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক

সুবিধা জড়িত থাকত। আমাদের দেশে সবকিছুই পরিমাপ করা হয় রাজনৈতিক সুবিধা বা অসুবিধার মাপকাঠিতে। কিন্তু দিনের পর দিন যে সব ছবি ভেসে আসছে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

৪ মে ২০২০

যেখান থেকে মাসের বাজার করতাম সেই দোকান অবশেষে খুলেছে, তবে সকালে অল্প সময়ের জন্যে। তাও আবার একসাথে ১০ জনের বেশি ঢোকা যাবে না। যিনি ঢুকছেন তিনি আর বেরোতে চান না, পারলে সব জিনিস ব্যাগবন্দী করতে পারলে ভালো হয়। এরকমই এক সকালে বেরোলাম, সকাল ৮টা তেই দোকানের দরজার সামনে থেকে লাইন পাশের গলিতে ঢুকে গিয়েছে, লাইনের শেষ মাথা দেখা যাচ্ছে না। দোকানে ঢোকার আশা আপাতত ত্যাগ করে লাইন কতদূর পর্যন্ত গিয়েছে সেটা দেখার জন্যে গলিতে ঢুকলাম। কি আশ্চর্য্য লাইনটার ১০-১২ জন পর থেকে যাঁরা আছে তাঁরা উল্টো মুখ করে দাঁড়িয়ে। রোদের জন্যে? না তো, তাঁদের গন্তব্যের অভিমুখটাও আলাদা মনে হচ্ছে। ও হরি এই লাইনটা মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে। গতকালই মদের দোকান খোলার ঘোষণা হয়েছে। লাইনের শেষমাথা থেকে দোকানের দরজা বহুদূর। শেষজন আদৌ পাবেন কি না সেটাই সন্দেহের। দেখতে দেখতে এই লাইন ক্রমশ দোকানের লাইন ছাড়িয়ে বড় হয়ে গেল, এখন আর ভুল হবে না। রোদ, গরম, দেরি এইসব নিয়ে কারো কোনো অভিযোগও নেই তেমন।

১০ মে ২০২০

চুল বেশ বড় হয়ে গিয়েছিল, তিন মাসেরও বেশি হয়ে গেল সেলুনে যাওয়া হয়নি। দাড়ি কাটা যায় নিজেই, কিন্তু চুলটা বেশ চাপ। রবিবার নিজেই বসলাম ট্রিমার নিয়ে। সামনের দিকটা ম্যানেজ করা গেলেও, পেছনের দিকটা কিছুতেই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। সহধর্মিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম পারবে কিনা, তিনি আবার বেশ কিছু আগে হলেও পার্লার ট্রেনিং করেছেন, সেখানে চুল কাটা তো থাকা উচিত। তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে রাজি হলেন। কিন্তু ট্রিমার অন করতেই মনে হয় সব অর্জিত আত্মবিশ্বাস উবে গেল। তিনবার মাথায় ট্রিমার বসিয়েছে, তিনবারই খাবলা করে চুল কেটে টাক বেরিয়ে পড়েছে। ঝগড়াটা শুরু হবো হবো করছে, ঠিক এই সময়ে ফোন বাজলো, উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম,

—"স্যার বাবার কোনো খোঁজ পাচ্ছি না..." আমার এক প্রাক্তন ছাত্র ফোন করেছে, সে কোনো কথা বলার মত অবস্থাতেই নেই। আমি বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলে বলে যেটুকু বুঝলাম তা হল, তার বাবা মহারাষ্ট্রের কোনো ইস্পাত কোম্পানির শ্রমিক। কয়েকজনের সঙ্গে হেঁটে রওনা দিয়েছিলেন বাড়ির দিকে। তিনদিন আগে শেষবার কথা হয়েছে বাবার সাথে, তারপর থেকে ফোন সীমানার বাইরে। সে জানতে চায় রেলে কাটা পড়া শ্রমিকের নাম কী দেখাচ্ছে কোথাও? বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ল ১৬ জন শ্রমিক রেল লাইনে শুয়ে থাকার সময়ে তাদের উপর দিয়ে ট্রেন চলে গিয়েছে, লাইনে পড়ে রয়েছে তাদের রক্ত-মাংস আর রুটি। তাহলে? ওর বাবার ফোন নম্বরটা নিয়ে নিলাম। টিভিতে খবর বলছে কিন্তু নাম তো দেখাচ্ছে না। নেটেও খুঁজে চলেছি। লকডাউনে এই প্রথম অজানা আশঙ্কায় আমার অন্তর কেঁপে উঠল, এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতায় ঢুকে গিয়েছি। আমার ছাত্র প্রচণ্ড মেধাবী। বাড়িতে তার মা আর ভাই বোন রয়েছে, কি হবে? সারাদিনে ৫০ বার ফোন করেছি ওই নম্বরে, কোনোবারই সীমার বাইরে ছাড়া আলাদা বার্তা পাইনি। এভাবেই কেটে গেল দুদিন। অন্য কোনো দিকে মনোযোগ যাচ্ছে না। রাতে ঘুমাতে গেলে সেই রক্ত মাখা রুটি ভেসে আসছে। ঘুমের ওষুধ খেতে হচ্ছে। এর মধ্যে ছেলে বলল মামাবাড়ি যাবে। পাশেই, তাকে আর তার মা কে রেখে এলাম।

শুনে রাতের কড়া নাড়া অবনী হঠাৎ দিলো সাড়া

রাত একটার কাছাকাছি বাজে। একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করছি। বাইরে একপাল শেয়াল ডাকছে, এটা নতুন কিছু না, বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। পাশে রাখা মোবাইলে একটা মেসেজ ঢুকলো। এত রাতে কোম্পানি ছাড়া আর কে করবে...ভাবতে ভাবতে মোবাইলটা খুলে মেসেজবক্স খুলতেই চোখ কপালে —This number is available now. তিনদিন ধরে অন্তত দু'শো বার ডায়াল করে নম্বর

মাথায় বসে গিয়েছে, সন্দীপের বাবার নম্বর। সঙ্গে সঙ্গে ডায়াল করলাম... হিন্দিতে করোনার সচেতনতা বার্তা চলছে, শেষ... এবার রিং হচ্ছে... আমার হার্ট মনে হচ্ছে গলায় উঠে আসবে.. সটান দাঁড়িয়ে পড়েছি বিছানার উপরে, মাথার ঠিক এক ইঞ্চি উপরে ফ্যান ঘুরছে বোঁ বোঁ করে..

-'হ্যালো'

-'আপনি কি সন্দীপের বাবা?" আশেপাশে অনেক আওয়াজ।

-'হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?'

-'আমি সন্দীপের স্কুলের স্যার বলছি, আপনি কোথায় আছেন?'

-'স্যার আমি পেঁয়াজের গাড়িতে, আর কয়েকজন আছে, কাল বাদে পরশু গৌহাটি যাবে বলল, আমরা কোচবিহারে নেমে যাব, সন্দীপকে একটু বলে দিবেন'।

আবার ফোনের লাইন কেটে গেল, যোগাযোগ করার চেষ্টা করে লাভ হল না, তিনি কিভাবে কোথায় আসবেন, কোথায় নামবেন, এই কয়েকদিন কিভাবে ছিলেন, খাওয়ার বা জল পেয়েছেন কিনা সেসব জানার সুযোগ হল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা জানা হয়ে গিয়েছে, তিনি বেঁচে আছেন। বুকের থেকে কেমন একটা ভার নেমে গেল, মাথাটাও হালকা লাগছে। কয়েকদিন মনে হচ্ছিল আমার কোনো নিকটজনের খবর পাচ্ছি না। আমার একেবারে ছোটবেলায় বাবা শনিবার করে আসতেন বাড়িতে আর সোমবার খুব ভোরে চলে যেতেন। শনিবার সকাল থেকেই 'আজকে বাবা আসবে' এই অনুভূতিটা ছড়িয়ে থাকত। সন্দীপের বাবা ঘরে ফিরবেন, কিন্তু যাঁদের আর ফেরা হবে না? তাঁদের জন্যে হয়তো আরো কিছুদিন সেই অনুভূতি নিয়েই অপেক্ষা করে থাকবেন তাঁদের বাড়ির লোক। একদিন জানবেন প্রিয় মানুষটি আর কোনোদিনও ফিরবেন না।

আসামের ধুবরি জেলার মিঞা গাজী রহমানের একটা কবিতা পড়েছিলাম, মূল কবিতাটি অসমিয়া ভাষাতে লেখা হলেও শিলচরের জয়শ্রী ভূষণ বাংলাতে অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা কবিতাটি এখানে তুলে দিলাম।

দেশ তুমি ভালো থেকো

গাজী রহমান

দেশ,
দেশ তুমি ভালো থেকো।
আশা ছিল ট্রেনে চড়বো, ঘরে ফিরবো
কিন্তু না, ট্রেন চড়ল আমাদের উপর।
দেশ, তুমি ভালো থেকো।
রেখে গেলাম রুটি
আমাদের রক্তে ভিজিয়ে খেয়ো।
দেশ, তুমি ভালো থেকো।
দেশ, তুমি আর কতদিন
বোবা কালা হয়ে থাকবে।
কত শত মৃত্যুতে নীরবে কাঁদবে।
দেশ, চুপ করে থাকা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে,
তোমার বিবেক ঘুণে ধরেছে।
দুঃখ নেই আমরা মরেছি
সত্যি কী বেঁচেছিলাম কখনো, ভুলে গেছি।
বয়েসের ভারে নুয়েপড়া,
মাকে আমায় একটু দেখে রেখো...
দেশ, তুমি ভালো থেকো।
সাধ ছিল ঘরে পৌঁছানোর,
কিন্তু ছিল না কোন সাধন, অথচ দাঁড়িয়ে অজস্র শকট বাহন...
কোনো দুঃখ নেই আমরা মরেছি,
দুঃখ শুধু এই, মানবতার মৃত্যু দেখেছি।
তবুও দেশ তুমি নতুন করে স্বপ্ন দেখো,
দেশ তুমি ভালো থেকো।
[**বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মহুন সাময়িকী পত্রিকায় প্রকাশিত]

করোনা সংক্রমণ কিছুতেই আটকানো যাচ্ছে না, আর বিদেশের খবর নয় এবার আমাদের দেশেই। কাজ হারাচ্ছেন অগণিত মানুষ। দোকানপাট বন্ধ, কর্মচারীদের মাইনেও হয় একেবারেই বন্ধ অথবা খুবই সামান্য পাচ্ছেন কেউ কেউ। বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়া হচ্ছে। প্রায় তিনমাস ধরে দোকান বন্ধ, ছোটো-খাটো ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় তলানিতে। বিরাট বড়ো কাপড়ের দোকানে কাজ করা ছেলেটাকে দেখলাম আলু, টম্যাটো, একপাতা ডিম আর একটা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বাজারের বাইরে একটা জায়গায় বসেছে। সবাইকে তো চিনি না, হয়তো এরকমভাবেই জীবনের সবচেয়ে কঠিন লড়াইয়ে নেমেছেন অসংখ্য মানুষ।

একটা ভালো খবর পাওয়া গেল যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর জন্যে বিশেষ ট্রেন চালু হয়েছে — শ্রমিক স্পেশাল। কিন্তু আবার গোলমাল লাগলো এবার ভাড়া নিয়ে। ভাড়া কে দেবে? খাবার, জল এসব নিয়ে ভাড়া খুব কমও নয়। প্রাথমিক ভাবে ঘোষণা হল সেই ভাড়া শ্রমিকদেরই দিতে হবে। তারপর ঠিক হলো কেন্দ্র আধা দেবে রাজ্য আধা। তারপর কংগ্রেস বলল পুরো ভাড়াই তারা দেবে। শেষে ভাড়া মকুব হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম ট্রেন ছাড়ার দিন স্টেশনগুলিতে এমনভাবে ভিড় জমা হল যে পুলিশ আবার সেই লাঠিপেটা শুরু করল। কারা কোন ট্রেনে উঠবে তার জন্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের নিয়ম ছিল, সেগুলো যাঁরা করতে পেরেছেন তাঁরা জায়গা পাবেন, বাকিরা পাবেন না। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন যে করতে হবে সেই খবরই বেশিরভাগ শ্রমিকের কাছে ছিল না, অনেকে আবার জানতেন না কিভাবে কি করতে হবে। অনেকেই আবার সেই রাস্তায় নেমে পড়লেন।

আবার যাঁরা ট্রেনে উঠতে পারলেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি মত খাবার বা জল পেলেন না, বরং অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শ্রমিকদের খাবার বা জলের ব্যবস্থা করতে এগিয়ে এলেন। মুম্বাই থেকে মণিপুর যাওয়ার জন্যে যাঁরা ট্রেনে উঠেছিলেন তাঁরা জানিয়েছিলেন তাঁদের দুর্দশার কথা। তবে এটাই আশার কথা, সমস্ত সমস্যার পরেও ঘরে ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

১৫ মে ২০২০

আমার বন্ধু ফোন করল, তার বাড়ির পাশের একটা ৮ বছরের ছেলের শরীর ভীষণ খারাপ। কোচবিহারের ডাক্তারবাবু কোলকাতার ICH-এ রেফার করেছেন। এখান থেকে কোলকাতায় যেতে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া চাইছে ৭০ হাজার টাকা। ছেলেটির বাবা দিনমজুর, তাও ২ মাস ধরে আয় নেই। সাহায্যের প্রয়োজন। সাধ্যমত সাহায্য করে আরো কয়েকজনকে বললাম, তারাও এগিয়ে এল। তিন-চার দিন পর ফোন করে জানলাম ছেলেটির অবস্থা আশঙ্কাজনক্ কোচবিহারেই আছে। কি ব্যাপার? তাঁরা অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে এখান থেকে কোলকাতাতেও গিয়েছিলেন,'ICH - এও গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারবাবু দেখবেন না। তারপর রেফারাল দেখালে তখন বলা হয় ডাক্তারবাবু আসেননি। আর দেখাতে হলে করোনা টেস্ট করে নিয়ে আসতে হবে আগামিকাল। তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কোচবিহারে যোগাযোগ করলে ডাক্তারবাবু সল্টলেকে কোনো এক ডাক্তারবাবু সাথে যোগাযোগ করেন, এবং তিনি রোগীকে তাঁর ক্লিনিকে নিয়ে যেতে বলেন। সেইমত তাঁরা সল্টলেকে রওনা দিলেও মাঝপথে পুলিশ গাড়ি আটকায়। সল্টলেক নাকি কন্টেইনমেন্ট জোন। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারও আর যেতে রাজি হয়নি, চাপাচাপি করে ফিরে এসেছে। আসার পথে কোথাও খাবারও পাওয়া যায়নি।

অবশেষে বাড়ি ফিরছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বাড়ির পাশেই কোয়ারেন্টাইন জোন আর সেফহোম তৈরি হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন, কন্টেইনমেন্ট—এই সব ইংরেজি মাধ্যমের শব্দগুলো কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের নিতান্ত সাধারণ জীবনে। সন্ধ্যেবেলা পাউরুটি বা মুড়ি আনতে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সামনে দিয়ে যেতে হয়, বিনা কারণেই ভয় ভয় লাগে, বাড়ি এসে জামা কাপড় ধুয়ে স্নানও করে ফেলি। গরমকাল বলে রক্ষা, শীতকাল হলে নিউমোনিয়া হয়ে যেত। এরকমই এক সন্ধ্যেতে আমাকে জানানো হলো বাড়িতে আলু এবং পেঁয়াজ নেই, নিয়ে আসতে হবে। সব বন্ধ জেনেও বার হলাম। একটু এদিক ওদিক ঘুরে চলে যাবো। রাস্তা শুনশান, সব লাইটগুলোও জ্বলছে না। বাইকটা একদম কম গতিতে চালাচ্ছি। স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে কানে একটা হালকা আওয়াজ এল--- ''আলু-পেঁয়াজ''। আমি থামলাম, অন্ধকারে কোন দিক থেকে আওয়াজটা এসেছে বুঝতে পারছি না। আমি চারদিকে দেখতে দেখতেই দেখলাম একটা মোবাইলের আলো জ্বলে উঠল। লোকটা আলোটা নেড়ে আমাকে ইশারা করছে। গিয়ে দেখলাম তিনটে প্লাস্টিকে আলু বাঁধা আর দুটো প্লাস্টিকে পেঁয়াজ। আর কিছু নেই। এক একটা প্লাস্টিকে এক কেজি করে মাপা আছে। আমাকে বলল, ''দাদা আলু পেঁয়াজ লাগবে? নিয়ে যাও, ১০০ টাকা দিও''। তিন কেজি আলু দুই কেজি পেঁয়াজ নেওয়ার মত বড় ব্যাগ নেই। ব্যাগে ঠেসেঠুসে তিনটে প্যাকেট ঢুকলো, বাকিটা লেগ-গার্ডের মধ্যে ছুলিয়ে নিলাম। আসার আগে লোকটার নম্বর নিয়ে আসলাম, পরে কাজে লাগবে। সে পরিযায়ী শ্রমিক, লকডাউনের আগেই এসেছে, আর ফিরে যাওয়া হয়নি। এখানে তো কোনো কাজ নেই, তাই একেবারে মরিয়া হয়ে এই কাজটা শুরু করেছে।

লকডাউন পর্বে রাস্তায় মারা গিয়েছে প্রায় ২০০ জন শ্রমিক, কেউ পুলিশের মারে, কেউ না খেয়ে, কেউ বা দুর্ঘটনায়। পাঁচ বছর বয়েসী সন্তানকে ঘাড়ে করে নিয়ে অথবা ট্রলিতে ঘুমন্ত সন্তানকে রেখে তা দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যগুলো আজীবন খোঁচা দিতে থাকবে কোথাও না কোথাও। গুজরাট থেকে বিহারের মজফফরপুর পর্যন্ত আসা ট্রেনে না খেয়ে মারা যাওয়া মহিলা শ্রমিকের বাচ্চা ভেবেছিল তার মা বুঝি ঘুমিয়ে আছে, মাকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টাও করছিল। কিন্তু মা যে আর উঠবেন না সেটা তো তার জানার কথা নয়। ঐ বয়েসি একটা বাচ্চা মাতৃহারা হলে কী হতে পারে সেটা আমার নিজের সন্তান না থাকলে অনুভব করতে পারতাম না। শরীরে মানুষের রক্ত থাকলে ওই মহিলার দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির আত্মগ্লানিতে পদত্যাগ করা উচিত ছিল, কিন্তু সেরকম কিছু অনেক দিন পর্যন্তও শুনতে পাইনি।

বোমা ভরা আনারস খাইয়ে একটা ১০ বছরের গর্ভবতী হাতিকে নৃশংস ভাবে মেরে ফেলল কেরালার মাল্লাপুরমের একদল গ্রামবাসী। বোমার আঘাতে হাতিটার মুখের ভেতরের অংশ ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে যায়। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে হাতিটা প্রায় তিনদিন একটা জলাশয়ের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছিল। এই তিনদিনে

সে কোনোকিছু খাবার মতো অবস্থাতেও ছিল না, আর সেই জলে দাঁড়িয়ে থেকেই একসময়ে মারা যায়। বিভিন্ন খবরের সূত্র থেকে জানা যাচ্ছিল ওই গ্রামে এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে, প্রকাশ্যে আসেনি। এই ঘটনার জন্যে নির্দিষ্টভাবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

জুন ২০২০

প্রচন্ড গরম পরেছে। টিভিতে খবরের চ্যানেলে আসা সবাই অত্যন্ত উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস অনলাইনে হবে নাকি অফলাইনে, তাই নিয়ে। কিছুদিন আগেই কেরালার দশম শ্রেণির এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের কাছে মেয়েটির বাবা জানিয়েছিলেন মেয়েটির স্কুলে অনলাইন ক্লাস শুরু হওয়ার কথা কিন্তু তাদের বাড়িতে স্মার্টফোন বা টিভি নেই, তাই যেদিন প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার কথা সেদিনই মেয়েটি অবসাদে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। টিভিতে তাই নিয়ে বিতর্ক চলছে যেখানে সব ছাত্রছাত্রীর কাছে পর্যাপ্ত সুবিধে পৌঁছায়নি সেখানে অনলাইন ক্লাসের যৌক্তিকতা কোথায়? কাজেই অনলাইন ক্লাস অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। যে চ্যানেলে প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেখানেই কিছুদিন আগে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছিল। সরকারিভাবে সেই চ্যানেলকে স্বীকৃতি দেওয়াও হয়েছিল। সেই অনুরাগেই হয়তো বা পড়ার মাঝে অজস্র বিজ্ঞাপন এবং কোথাও সাংবাদিক সম্মেলন থাকলে পড়া বন্ধ করে সেগুলি চালু হয়ে যেত। টিভিতে এই সমস্ত বিতর্কসভার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম দশ মিনিট পর্যন্ত শোনা যায় এবং বোঝাও যায়। তারপর সবাই মিলে একসাথে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন, কাজেই শোনা গেলেও বোঝা যায় না। টিভির আওয়াজ কমিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি সভার মত কোন দিকে যাচ্ছে এমন সময় বেল বাজল। দরজা খুলে দেখলাম পাড়ারই ছেলে মৃন্ময়, মিনু নামেই বেশি পরিচিত—দাঁড়িয়ে আছে। মিনু ইংরেজি টিউশনি করে, চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে। ঘরে ঢুকে সোফায় বসে মুখ থেকে ভেজা মাস্কটা খুলে প্রথম কথাটাই বলল—''বাবুয়াদা একদম মরে যাবো এবার।''

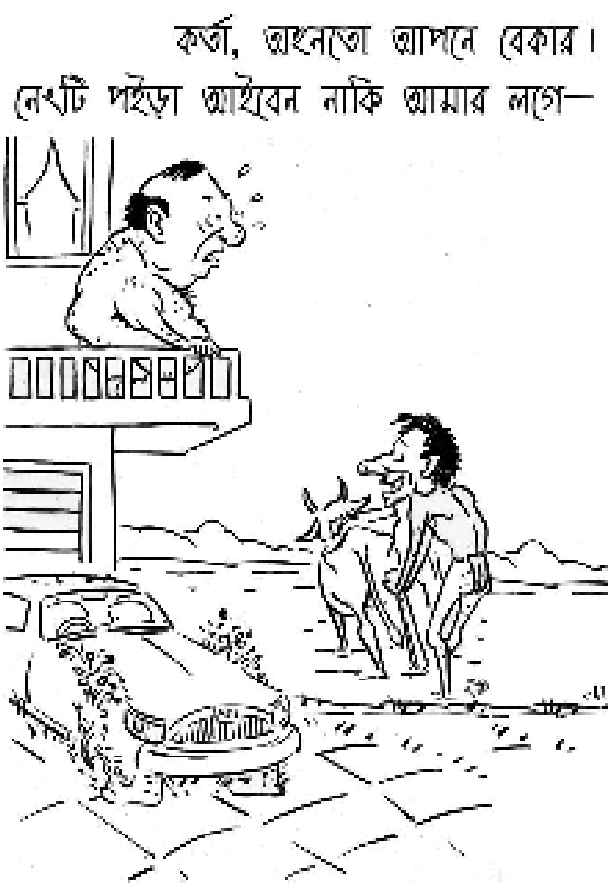

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—''কেন রে? কী হয়েছে?''

—''আমার আর একটাও টিউশনি নেই''।

—''নেই কেন?'' আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম।

—''করোনার জন্য গার্জিয়ানরা বাড়িতে পড়ানো বন্ধ করেছিল এপ্রিল মাস থেকেই, তো আমি অনলাইনে শুরু করলাম''।

-''হ্যাঁ সে তো ভালোই, কিন্তু সবার কাছে কি স্মার্ট ফোন আছে? যাদের নেই তারা কি করবে?''

-''তুমি কী নেশা টেশা ধরেছ নাকি? এখন সবার কাছে বড়ো বড়ো মোবাইল। এই যে স্কুল বন্ধ মাষ্টারগুলো সারাদিন ধরে, টিউশানি চালায় জানো না?''

-''সারাদিন? বলিস কী?''

-''এই তো আমার গুলোই দুই-তিন মাসে এদিক ওদিক করে কেটে গেল। বেশিরভাগ মাইনেটাও দিলো না, কতবার ফোন করব। বলো?''

এর মধ্যে চা এসে গিয়েছে, মিনু টোস্ট বিস্কুট তুলে তাতে ডুবিয়ে নিয়ে এক কামড় দিয়ে যা বলল মোটামুটি এইরকম- এপ্রিল মাস থেকেই গার্জিয়ানরা গাঁইগুই শুরু করে, বাধ্য হয়ে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে মিনু অনলাইন ক্লাস নিতে শুরু করে। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা সেটআপ তৈরি করে ফেলা সম্ভব নয়। তবুও ন্যূনতম পরিকাঠামো নিয়ে শুরু করেছিল। মে মাসের শুরুতে দেখা গেল অনেকেই ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের ফোন করলেও ঠিকঠাক কিছু বলছে না। ততদিনে টিউশানের জন্যে বিখ্যাত সব স্কুল শিক্ষকরা অনলাইন টিউশন শুরু করে দিয়েছেন। সেখানে টাকাও কম লাগছে, ছাত্রছাত্রীরা সেখানেই যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যাদের অবস্থা সচ্ছল তাঁরা বহু বিজ্ঞাপিত অ্যাপগুলোর সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই এই মুহূর্তে মিনুর মতো যারা টিউশনি করে ন্যূনতম একটা উপার্জনের জায়গাতে ছিল তাদের আয়ের রাস্তাটা ক্রমাগত বন্ধ হয়ে আসছে।

সেপ্টেম্বর ২০২০

ছড়িয়ে রয়েছে জীবন ইট-কাঠ-পাথরে, সূর্যের উত্তাপে আর রাত্রির চাদরে...

মাঝে অনেকদিন ডায়েরি লেখা হয়নি। ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে

আমার শহর। করোনার ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে রাস্তায় নেমেছেন, মানুষের মনকে ভেঙেচুরে দিয়ে অনেক কিছু ভুলিয়ে দিতে পারলেও ক্ষিদেকে ভোলাতে পারেনি। এই সময় চেনা জানা কত মানুষের সাথে দেখা হচ্ছে, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। টর্চ, ইমার্জেন্সি লাইট, ঘড়ি, সিডি-ডিভিডি, খেলনা এইরকম ছোটোখাটো ইলেকট্রনিক জিনিসের দোকানি শঙ্কু একটা বেকারিতে পাউরুটি তৈরির কাজ করে, চুল্লির আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রুটির সাথে নিজেকে পোড়াতে পোড়াতেও হয়তো ভাবে কোনোদিন আবারও বাচ্চাদের হাতে খেলনা তুলে দেওয়ার কথা। ছোট্টো জামাকাপড়ের দোকানী টোটোন ৪২ বছরেই স্ট্রোক হয়ে বাঁ-দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ছড়া কেটে জামাকাপড় বিক্রি করা ছেলেটা আজ আর হা বলতে পারে না।

ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে বাবার জন্যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ আনতে যাব। বেশ দূর, আকাশ মেঘলা হয়ে আছে সাথে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই একটা টোটো এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চলতে চলতেই টোটোচালক জিজ্ঞাসা করল-''বাবুয়াদা কেমন আছ?''

একে পেছন ঘুরে বসা তার উপর মুখে মাস্ক, কাজেই চেনা চেনা ঠেকলেও নিশ্চিত হতে পারছি না। বুঝতে পেরে সে মাস্ক গলায় নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে একগাল হাসি দিল।।

—''আরে খোকন তুই? টোটো চালাচ্ছিস কেন?'' খোকন বয়েসে অনেক ছোট আমার চেয়ে। বহু আগে যুবকেন্দ্রে কম্প্যুটার শেখার সময় ওর সাথে আলাপ হয়েছিল, তারপর থেকে যোগাযোগ ছিলই। শিলিগুড়িতে কোনো কম্পুটারের দোকানে বড় কোম্পানির হয়ে টেকনিশিয়ানের কাজ করত।

-''দাদা সাত মাস কাজ নেই, হাতে যা ছিল সব শেষ। এই টোটো ভাড়া নিলাম শেষে, তাও চলে না ঠিকঠাক, কোনোদিন হয় কোনোদিন হয় না, নেহাত অশোকদার টোটো তাই ঝামেলা নেই''।

-'' লকডাউন তো উঠেই গিয়েছে, তোর আগের কোম্পানি খোলেনি?''

-''খুলেছে দাদা, কিন্তু যা মাইনে দেবে তাতে শিলিগুড়িতে থাকার পর হাতে কিছুই থাকবে না''।

-''লোক পাবে কোথায়''।

-''আরে লোকের অভাব নাকি? লোকালেই পেয়ে যাবে। এই দেখো না আগে টোটোতে কত লাভ ছিল। তারপর কী হল, সবাই টোটো কিনে ফেলল। এখন সারাদিনে দশটা ট্রিপও হয় না। বাবুয়াদা কোনো কাজ থাকলে খবর দিও, আমার নম্বর তো আছেই। তোমার কাছে''।

-''বিয়ে করেছিস নাকি?'' একটু চুপ করে থেকে ও বলল,

-''ঠিক হয়েছিল দাদা, এবছরই হত। এখন ওরা আর রাজি না, আমিই বা জোর দিয়ে কিভাবে বলি?''

কথা বলতে বলতে ডাক্তারবাবুর দোকানে পৌঁছালাম। আমাকে নামিয়ে দিয়ে খোকন চলে গেল, মিশে গেল শহরের পথে চলা অজস্র টোটোর ভিড়ে। ভেবেছিলাম ভাড়ার সাথে কিছু টাকাও ধরিয়ে দেব, সংকোচে দিতে পারলাম না। একটা অতিমারি কতরকমভাবে আক্রমণ করে একটা সমাজকে। কাজ হারিয়েছে খোকনের মত হাজার হাজার ছেলে। যারা যেভাবে পেরেছে কাজে নেমেছে। শহরের এক পুরোনো বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একেবারে ছোট থেকে সেই দোকানে কাজ করা লোকটিকে বাজারে কুলির কাজ করতে দেখেছি। শুধু কাজ? এই খোকনের মত কতজনের ভেঙে গিয়েছে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। ছেড়ে গিয়েছে প্রেম ভালোবাসা। কদিন পরেই দুর্গাপূজা, বাতাসে জীবাণুর সঙ্গে ভাসছে শিউলি ফুলের গন্ধ। তবুও চারদিকে কেমন একটা মন কেমন করা পরিবেশ। এই অসময়ে ভালোবাসার মানুষটিকে জীবন থেকে হারাতে কেমন লাগে তা আর জানা হল না। এই অসময়ে যদি প্রেমপত্র লিখতে হত তাহলে হয়তো এভাবেই লিখতাম—

সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যায়, পৃথিবীর পুরোন পথের রেখার মত। একদিন শেষ হবে এই অসময়ও। বাড়ির গেটে কাগজফুলের ডাল ছেঁটে দেব যত্ন করে আর মুখের থেকে মাস্ক খুলে রেখে বুক ভরে নেব অক্সিজেনে- যাতে অক্সিমিটারের পাঠে কোনো ঘাটতি না থাকে। একদিন আবার হয়তো তোমার আমার দেখা হয়ে যাবে। হাতে হাত ধরে হেঁটে যাব সেই ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে, সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যে নামার আগে, যেখানে সূর্য ডোবে পরিযায়ী পাখিদের ডানার জল মেখে আর আমাদের হঠাৎ করেই অসংলাপে জড়িয়ে ধরবে লিলুয়া বাতাস। দুনিয়া ঢেকে থাকবে না এই পিপিই কিট আর মাস্কে। স্যানিটাইজারের শুদ্ধিকরণ ছাড়াই

ড্রপলেটে থাকবে না কোনো সংক্রমণের ভ্রুকুটি। দূরত্ববিধি লঙ্ঘনে আর গ্লানিবোধ থাকবে না, থাকবে না কোনো নিষেধাজ্ঞার সাদা বৃত্তে ভরা অঞ্চল। আলিঙ্গন কোনো মহামারীর আশঙ্কা ছাড়াই গল্প শোনাবে ভালোবাসার। থানা গারদে বন্দী থাকার প্রস্তাবেই হয়তো জারি হবে নিষেধাজ্ঞা। আবার হয়তো আমাদের কোনোদিন দেখা হয়ে যাবে এই অতিমারীর ওপারে।

কার্টুন—অনিরুদ্ধ পালিত

সমাজের দুর্বল বা অনগ্রসর অংশ থেকে রাষ্ট্রপতি

জিতেন প্রসাদ

আম্বেদকার

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী দেশের প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী (দেশের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী, ১৯৬৬-১৯৭৭ ও ১৯৮০-১৯৮৪)। দেশের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট প্রতিভা সিং পাতিল (দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট, ২০০৭-২০১২) এবং দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদি মুর্মু (২০২২-) পঞ্চদশ প্রেসিডেন্ট।

দেশের প্রথম ও একমাত্র আদিবাসী বা জনজাতি (ST) প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু। এখনবধি কোন আদিবাসী বা জনজাতি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি।

দেশের প্রথম তফশিলি বা দলিত (SC) প্রেসিডেন্ট কে. আর. নারায়ণ (দশম প্রেসিডেন্ট, ১৯৯৭-২০০২) ও দ্বিতীয় দলিত প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ (চোদ্দতম প্রেসিডেন্ট, ২০১৭-২০২২)। কোন দলিত দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি।

প্রথম পশ্চাদপর জাতের (OBC) প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবাগৌড়া (একাদশ তম প্রধানমন্ত্রী, ১৯৯৬-১৯৯৭)। দ্বিতীয় পশ্চাদপর জাতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (চোদ্দতম প্রধানমন্ত্রী, ২০১৪-)। প্রথম পশ্চাদপর প্রেসিডেন্ট বি. এস. জাত্তি (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, ১৯৭৭)। দ্বিতীয় পশ্চাদপর প্রেসিডেন্ট জৈল সিংহ (নবম প্রেসিডেন্ট, ১৯৮২-১৯৮৭)।

ভারতের মুসলমান প্রেসিডেন্টরা : (১) জাকির হোসেন (তৃতীয় প্রেসিডেন্ট, ১৯৬৭-১৯৬৯); (২) মহম্মদ হেদায়েতুল্লা (অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট, ১৯৬৯); (৩) ফকিরুদ্দিন আলি আমেদ (পঞ্চম

দ্রৌপদি মুর্মু

প্রেসিডেন্ট, ১৯৭৪-১৯৭৭); ও (৪) এ পি জে আবদুল কালাম (একাদশ প্রেসিডেন্ট, ২০০২-২০০৭)। কোন মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হতে পারেনি।

ভারতের প্রথম ও একমাত্র শিখ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ (তের তম প্রধানমন্ত্রী, ২০০৪-২০১৪) এবং প্রথম ও একমাত্র শিখ প্রেসিডেন্ট জিয়ানি জৈল সিংহ।

কোন খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ বা পার্শি প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারেন নি।

চরম অসাম্য ও দারিদ্র্যের কবলে ভারত

"ব্রিটিশ জমানায় ভারতে আয়ের অসাম্য চরমে ছিল। ১০% ধনীতম মানুষের ঝোলায় দেশের মোট আয়ের অর্ধেক চলে যেত। স্বাধীনতার পরে সমাজতন্ত্রের অনুপ্রেরণায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে অসাম্য কমে। ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষের আয় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে আসে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া, উদারীকরণ শুরুর পরে বিশ্বের মধ্যে ভারতের আয়-সম্পদের অসাম্য প্রবলভাবে বেড়েছে। উপরের সারির ১শতাংশ মানুষ আর্থিক সংস্কারের ফায়দা পেয়েছেন। কিন্তু কম ও মাঝারি আয়ের মানুষের আয় ততটা বাড়েনি। দারিদ্র বজায় থেকেছে।"—বিশ্ব অসাম্য রিপোর্ট, প্যারিস স্কুল অফ ইকনমিকস, ২০২১

Tradition, Change and Land Alienation: A Study among the Totos of Totopara, District Jalpaiguri, West Bengal

PINAK TARAFDAR† & SUBHANKAR ROY‡

KEY WORDS: Totos. Land alienation. Occupation. Culture change. Totopara. District Jalpaiguri. West Bengal.

ABSTRACT: Forests are the ancestral habitat for many tribal or indigenous communities. Their society, culture, religion, economy, health and identity are closely related with concerned habitation. Due to various reasons these customary rights are denied for many decades. The article explores the process of land alienation which leads to culture change among the Totos, a mongoloid primitive tribal group residing specifically in the Totopara village of Jalpaiguri district, West Bengal. At present day scenario of land alienation is the main issue for understanding the serious situation and the changing lifestyle of the Totos. In fact the Totos are compelled to take up different categories of occupations for their livelihood due to shift from their traditional subsistence activities. As a matter of fact, they could not maintain their relative isolation and eventually their social system has undergone a drastic change which results a consequent social class formation in their society.

INTRODUCTION

According to 2001 Census the tribal population of India is little more than 84.3 million, which constitute 8.2 per cent of total population of the country while the tribal population of West Bengal constitutes 5.2 per cent of total tribal population of the country. On the basis of population strength of tribals in India, West Bengal secures ninth position. The total tribal population in West Bengal is estimated as 4.4 million against 84.3 million tribal population of India as a whole. The distribution pattern of different tribal groups of West Bengal shows two broad and distinct geo-ethnic zones, (a) Mongoloid tribes of North Bengal, and (b) Proto-Australoid tribes of South Bengal. It is very interesting to note that the tribes of Mongoloid origin have been mostly confined to northern districts of West Bengal, especially in Himalayan and Sub-Himalayan regions of the state, consisting mainly of Darjeeling and Jalpaiguri districts, while the tribes of Proto-Australoid ethnic group are mainly confined at southern parts of West Bengal. The northern region of West Bengal is considered to be the most unique place of this state both for its geographical characteristics as-well-as cultural diversities. This area is the homeland of large number of populations who speak different languages having diverse ethnic origins (Grierson, '09) and varied cultural traditions. They have come from different directions and at different times by various routes of early migration, namely, the northern passes of Bhutan, Tibet, Nepal, Assam-Mayanmar routes of eastern side; and the valleys of the western direction formed by Ganga and Brahmaputra rivers. Nearly 0.64 million tribals live in the Jalpaiguri district of North Bengal which constitute 14.56 per cent of the total tribal population of West Bengal.

Totos are the only primitive tribal group (PTG) found in North Bengal. They are exclusively confined in Totopara, a small village under Madarihat police station of Jalpaiguri district, which lies between 89º20' East latitude to 26º50' North longitudes. The Totos are considered not only as a primitive tribe but also the smallest tribal group of the State. The present article has been made to explain different consequences of land alienation and its impact on the traditional culture of the Totos.

The Toto settlement is distributed among the six sectors of Totopara, viz, Panchayat gaon, Mondol gaon, Subba gaon, Mitran gaon, Puja gaon and Dhumchi gaon. Initially all the six sectors were visited for the pilot survey but the present study was conducted among the four sectors of Totopara, i.e. Panchayat gaon, Subba gaon, Mitran gaon and Puja gaon.

BRIEF HISTORY OF TOTOPARA

There is no proper historical record regarding the exact period when the ancestor of the Totos arrived in the village Totopara. According to the past records, this region was under the control of the Bhutan and ultimately British Government ceded it to India after the Bhutan war in 1865. Several scraps of information that are available at present may give a clue regarding the origin of the Totos. Probably before the Indo-Aryans reached North Bengal and Assam a branch of Tibeto-Burman group came as far as to the foot of the Bhutan hills and settled in Nepal, Sikkim and Bhutan. During that period a branch of Indomongoloids of Assam-Burmese group speaking Tibeto Burman language, containing within its fold the great Bodo group, came to Assam and North Bengal and spread themselves from

†Assistant Professor
‡Research Associate

the Himalayas up to the seas. They have been described by some as Kiratas (Chatterjee, '51: 16). These two groups came into conflict several times for the political supremacy of the hills and the plains. Thus in the historical period a tribe called Tephu, probably a branch of the Bodo group, took possession of Cooch Behar and then conquered Bhutan. Again by the middle of the fifteenth century A.D. they were driven off from the hills and a part of the plains below, called the Duars, by the Tibetans who took possession of the whole of Bhutan and Duars. These Tibetan rulers were called Bhutias (Hunter, 1876: 52; 1911:216-218).

K. K. Bose (Bose, 1865) in his "Account of Bhutan" reports that they arrived at Poonakha in Bhutan, which was ruled by the Maha-Raja of Cooch Behar. They were defeated by 'Dhurum Raj' and the tribe was deprived of their caste and their descendants were called Thep. The son of a Bhutia and a Cooch parent is called 'Thep'. Probably this tribe was called Tephu by Hunter. They were the people from Cooch Behar who occupied Bhutan at one time about two centuries ago (Eden, Pemberton and Bose, 1865).

The Bhutias taking advantage of the unsettled Government in Bengal carried on outrages on the people of the plains below. So much so that since the beginning of the 18th century and by the 1765 Bhutan was supreme in Cooch Behar and nothing could be done without the sanction of her representative (Malligan, '19: 6). In 1772, Bhutan took actual possession of Cooch Behar, captured the Raja and carried him off to Bhutan. The Cooch Behar Raj appealed for help to the East India Company then in charge of Dewani of Bengal, Bihar and Orissa conferred on them by Shah Alam, Emperor of Delhi. A treaty was concluded between the Cooch Behar State and the East India Company in 1773 and Capt. Jones was deputed to drive the Bhutias out of Cooch Behar. Capt. Jones defeated the Bhutias in Buxa and Dallimcote and drove them out of Bengal. The Bhutias prayed for peace and at the intervention of the regent of Tibet a treaty was concluded between the Deb Rajah of Bhutan and the East India Company on the 25th April 1774 by which the Raja of Cooch Behar, Dudjindra Narayan, was restored to Cooch Behar and Company allowed Bhutan to retain possession of the portion of Duars to the North of Maynaguri, including the temple of Jalpesh on the district in understanding that the Bhutias would never disturb the peace of Cooch Behar and the Company's property.

The Bhutias soon forgot to implement the terms of the treaty and started trouble in Bengal and Assam Duars. Bengal Duars was called Western Duars and Assam Duars was called Eastern Duars. The Bhutias continued their outrages and aggressions on the British subjects of Western Duars. They plundered the inhabitants and massacred them or carried them off as slaves (Sunder, 1895: 19). The arrival of the party Tradition, Change and Land Alienation: A Study among the Totos of Totopara 177 of Zeenkafs (Bhutia Officials) of the Paro Pilo (Government of Bhutan) in the Duars on any pretence was a calamity. The oppressions of the Bhutia frontier officers had driven the inhabitants of Bengal Duars to open rebellion. Horo Govinda Katham of Kyrantee (in Western Duars) and Hari Das of Maynaguri (Western Duars) were subjected to the most in human oppression and injustice. Their arms and cattle were carried off and their families were subjected to repeated indignities. They revolted against Bhutan, collected arms and men and occupied Bhutanhat, Maynaguri, Chergmari in Western Duars (see Bose, 1865: 168). All thease led to a brief campaign known as Bhutan War of 1864-1865. The Bhutias were completely routed by General Tytler and Tombs and the whole of Western Duars, then under Bhutan was annexed to India by the British by the Proclamation of Annexation issued on 12th November 1864. The final treaty was signed on 11th November 1865 (Sunder, 1895: 20). The Bhutias were given possession of the hills of Dewangiri and some other hills to the north and east of Buxa. T.H.O. Donnel demarcated the boundary between Bhutan and British India in 1866-67 and complete peace was restored in the Indian portion (Milligan, '19).

The hill now occupied by the Totos and the area is known as Totopara. The district of Jalpaiguri was from the district of Rangpur and the whole of Western Duars. The Totopara is included in Jalpaiguri district since then.

The Totos of the Western Duars are officially described as a primitive tribal group (PTG). History of the Totos remains obscure as there are no written records of the Totos. During different studies, none of the Totos could even recall any folktales or story of previous migration. They are a branch of Tibeto-Mongoloid people and linguistically belong to the Tibeto-Burmese family (Grierson, '09). From anthropological point of view, the Totos were settled in different villages in Duars and later on after 1865, they left their old habitations and moved towards Bhutan, (Chakrabarty and Chattopadhyay, '64; Roy Burman, '64; Das, '69; Bhattacharya, '98; Chaudhuri and Chaudhuri, 2005). This could be supported by the fact that the Totos had a great extent of cultural similarity with Bhutanese tribe 'Dayas' may be due to prolonged interaction with them. The circumstances may be political or geophysical that compelled the Totos to leave their old settlement and

finally settled in the present village of Totopara (Mitra, '53).

By examining the general method it was ascertained that the Totos migrated to this village at least eight to ten generations ago. In earlier, the small ethnic groups used to pass their days in tension out of fear of loosing their separate ethnic identity with any other large community. As a result, they took shelter in the secluded and inaccessible places behind the veil of deep forest and imposed more rigidity upon their customary laws and social control mechanism. Totos were also not the exception, they also haunted by a deep rooted fear psychosis of being completely extinct. For which they selected a secluded and inaccessible place like Totopara for a long time as their shelter. This fear psychosis plays behind their rigidity in every aspect of their socio-cultural and religious functions. But the tide of change has swept over every corner of Toto society from socio-religious customs to political organization, from health to hygiene (Das, '69; Sinha and Paul, '84; Sarkar, '91; Tarafdar, '2009, 2010).

RESULT AND DISCUSSION

The Toto society is not just an egalitarian but a rank society having a tradition of heredity headman locally called 'Mondol'. In earlier times the whole area of Totopara Mouza (revenue village) was recorded in the name of then 'Mondol', Mr. Dhanapati Toto, as a community land on behalf of the whole community. But recently the most important problem is that the Totos are facing scarcity of land and in reality they have been evicted from their cultivable lands which they enjoyed under tribal land tenure system.

According to O'Donnel and Hodgson the entire area of Totopara was 1027.36 acres in 1866. The same area was stated to be 1116.74 acres by D. Sunder, Settlement Officer, Jalpaiguri, in 1889-1894, and 2003 acres in 1906-1916 by J. Milligan (Milligan, '19). The total area of Totopara was stated to be 1996.96 acres in 1951 by Census Survey of the Government of India (Mitra, '53). The Totos were enjoying the 1996.96 acre land before the year of 1969. Then the entire size of land was recorded as a community land in the name of their 'Mondal' Dhanpati Toto. But in 1969 the scenario of land in Totopara has been changed. The Officer-in-Charge of the West Bengal land and land reformation department captured the community land under the section 44 (2A) of West Bengal State Acquisition Act and redistributed 347.43 acre land among the 89 Toto families. The rest amount of land has been converted into vested land. Such land reforms and family wise distribution of land among the Totos in actually resulted in the replacement of traditional occupancy of cultivable lands because of
the Governmental policy and rapid intrusion of the other populace. It is circumscribed to the extent that communal rights have disintegrated into private ownership.

Before the independence, the permission was not given to the outsides to live in the Totopara permanently. But after 1951 other peoples mainly the Nepalese and Biharis took entry into the Totopara. By using the simplicity of the Toto peoples and the aloofness of the Government officials the outsiders started to transfer the tribal land. But according to the Government rule (Section 14c, Land Reformation Act 1955) it is not possible to acquire the land of Totopara by the outsiders. At present, the Totos are the minor population group in the village. They constitute only 43.19 per cent population in the total village (Table 1).

From the Table 1 it has been noticed that the Totos are facing tremendous problem regarding land usage due to the rapid influx of the other population (mainly Nepali and Bihari population) in the area. In 1931 there were only six Nepali individuals in the Totopara. But the number of outsiders gradually increased day by day and now 56.81 per cent of the total populations are formed by them. They grabbed the fertile land of Totopara without the permission of the Totos. At present 138 acres of land from the 347.43 acres has already been grabbed by the outsiders mainly by the Nepalese who came into Totopara for the first time with 12 families after being driven away from Nepal in1950.

The British Government gave the rights to enjoy the land of Totopara mouza, an area of 1996.96 acres, to the Totos in exchange of a capitation tax of Rs. 2 per household. Later, in 1931, the tax was raised to Rs. 142 for 63 households. The Mondal was responsible for collecting and depositing such tax to the appropriate authority. After the introduction of the Left Front Government in West Bengal (1969) it was stated to the Totos, that if they registered more land, they should pay more tax for that. Because of that reason the Totos registered less amount of land in their name and in this way the total amount of registered land was reduced into 347.43 acres. After that the Totos have not paid any tax up to 26 years. At that time the Government officials have not alerted them for paying the arrears of rent. After that the Totos are recently paid their tax (Rs. 2-2.5 lakh approximately) and every house hold had to pay an amount of 10-15 thousand. But the most striking feature is that the Nepalese and the other outsiders never paid tax for the land although they are holding substantial amount of land taken away from the Totos.

Another great problem of the Totos is that there was

no demarcation of their land. They paid the tax for land, but they were not much aware of the place, size and the exact area of their land. The Totos had requested to the Government for demarcation of their land, but the Government has not attended to their request and has not taken any step. Afterwards the Totos are thinking about a strong movement to solve their problems of land. From the Table 2 it is revealed that up to 1961, per head land was about 5.06 acres, and in 1971 per head land distribution came to 0.59 acres, and eventually the figure came down to 0.29 acres in the present study conducted in 2010. The Totos were not much aware of the their land alienation that is being taking place, they could not realize its consequences even in 1969 when Toto 'Mondol', Dhanpati Toto, agreed to lease out good cultivable land to a Nepali in exchange of Rs. 700/- only, under certain terms and conditions. However, the Nepali migrated population did not adhere to the terms and conditions agreed upon with the Totos, and in turn they became the self declared land owner of the land without any tax burden.

During British Raj the Totos remained more or less isolated and had maintained their traditional way of living. The problem started with the increasing number of intrusion of outsiders in the Totopara since 1952 (Table 1). The outsiders who were economically well off and started to reside in the area have made the Totos feel inferior in their own village. At the beginning, the outsiders had started to make friendship with the Totos but gradually, friendship and trust of the Totos have been betrayed by the outsiders. The rapid infiltration of population is not only altering the land-man-ratio but is also affecting their socio-cultural beliefs and practices.

Land alienation has been the main issue of understanding the abysmal situation and the changing lifestyle of the Totos. In fact, the Totos are compelled to take up different categories of occupations for their livelihood. During last few decades the Totos have been increasingly participating in different economic activities. This is largely due to shift of their traditional subsistence activities and taking up of different nontraditional categories occupations like agricultural labour, daily labour in road construction, worker in the mining factory of Bhutan, helpers in local business on contract basis. Besides the stated categories, some of the school educated Totos are engaged in service, earning monthly salaries from Government and non-Government agencies. In fact their participation in organized and unorganized sectors generated uneven economic development among the families of the Toto society. As a result, they are participating in wider market oriented commercial network of this locality which is mainly based on agricultural economy. The result of such economic involvement of the Totos has altered their social structural equilibrium which eventually is responsible for the onset of stratification of Toto social system which basically existed on their social solidarity. As a matter of fact, the present day Totos could not maintain their relative isolation and eventually their social system has undergone a drastic change. They have been incorporated into the regional social system of other endogamous and hierarchically arranged communities. The net result is transformation of rank society towards a peasant like community with some sort of class differentiation. Such land reforms and per head distribution of land (Table 2) among the Totos in actuality resulted in the replacement of traditional occupancy of cultivable lands. It is circumscribed to the extent that communal rights have disintegrated into private ownership (family or person) which has lead to significant economic and social changes which thus seriously affected the tribal social equilibrium. A class differentiation, if not so marked in the milieu of traditional social system, is emerging based on the exclusion of some Totos from access to ownership of arable land. Such deprivation of cultivable land coupled with adoption of differential occupation is practically changing the tribal ethos.

With the changing economic scenario the Toto people also altered their religious and cultural activities. Some of them have converted to Christianity to bring down the burden of expenses in their traditional animistic rituals and cultural practices related with animism. Monthly incentives from the Christian missionaries may be another cause for religious conversion. Those who belong to the comparatively lower economic group and have not converted their religion into Christianity bring down their budget amount in respect to their traditional rituals. For instances, in case of a Toto marriage the groom's family usually sacrificed five cows in earlier times but now-a-days they reduce the number of the cows into two. They also curtail the number of celebration days in comparison to their traditional marriage due to the marginalized economic condition. In earlier days the Totos sacrificed blood and flesh of cow to their traditional deities during worship but now-a-days they offer hen or pigeon or pig to their deities because cow is more expensive than the other animals like pig and pigeon etc. They have mainly adopted these practices from the adjoining Nepali inhabitants who have come from outside and have started to live in the same village.

The change of the traditional subsistence activities has been reflected in dress and personal adornment of

the Totos as well as in the household goods and utensils which they use in daily life. Recently most of the Totos use modern dresses like their so-called mainstream neighbours wear because they cannot afford the cost of purchasing and maintenance of traditional dress. Inequality of contemporary form has begun to appear which is however, regulated and controlled by new emerging ethos.

Government has taken some special attention to increase the population of the Totos because right now only 1171 Toto individuals are exclusively inhabited in Totopara of Jalpaiguri district of West Bengal and they are not found in any other part of the world. This is no doubt an admirable effort that has been taken up by the Government but at the same time Government should positively think about their land problem because, the Totos are mainly depended on land and forest for their economy and food source. If the amount of the land has not been increased or settlement made there will be great problem for them regarding their land. The agriculture based economy experience serious effect with the changing scenario (Table 2) of per head land distribution specifically with some segments of population among the Toto who are now compelled to exercise the family planning programme for limiting their family size to cope up with their meager economy even hiding or changing their own identity.

CONCLUSION

It appears from the above discussion that at the present situation, market or commercial exchange is predominant in Toto society. Money is now increasingly being circulated in transactions. In fact, certain items of modern system and market oriented commercial system have been bringing change in the age-old socio-economic life and traditional values and belief system of the Totos. It was noted earlier that over the years the Totos had lost a large amount of their land. The major problem faced by the Totos is land alienation. Most important demand of the Totos is to restore the land of their ancestors. The prospect of the land of their ancestor being restored to them is still quite difficult. The shifting of subsistence strategies from hill cultivation to cash crop production had pauperized some segment of the population belonging to the group and the emerging distress economic situation make constraint in the way for many Toto children to attend the schools. Besides, socio-political subjugation even in their own village leads them to feel socially inferior. The pattern of unequal land distribution and invigoration of modern white collar jobs among the Totos also indicates their poor economic condition and existing inequality in their own society which led a straight inception of class formation even in the egalitarian society. With the changing economic scenario the Toto people also set up a new type of cultural practices which is inexpensive in respect to their traditional one and eventually imbibe intrinsic compromise with indigenous cultural traits.

ACKNOWLEDGEMENT

Our special thanks to the University Grants Commission, New Delhi, for the financial support extended for this research work.

TABLE 1

Population of Totopara since 1931

Year	Source	Toto Population	Others Population	Total Population
1931	Census of India	334	06	340
		98.24	01.76	100.00
1952	Cultural Research	383	191	574
	Institute, Kolkata	66.72	33.28	100.00
1953	Indian Social	322	228	550
	Institute,	58.55	41.45	100.00
	New Delhi			
1969	Cultural Research	482	674	1156
	Institute, Kolkata	41.70	58.30	100.00
1981	Census of India,	709	788	1497
	WB, Jalpaiguri	47.36	52.64	100.00
1991	Census of India,	904	898	1802
WB, Jalpaiguri		50.17	49.83	100.00
1993	Cultural Research	962	1190	2152
Institute, Jalpaiguri		44.70	55.30	100.00
2010	Field Study	1171	1540	2711
		43.19	56.81	100.00

TABLE 2

Year-wise per head land distribution in Totopara

Year	Toto population	Total amount of land (in acre)	Per head land distribution (in acre)
1901	171	1116.74	6.53
1911	235	2003	8.52
1921	271	2003	7.39
1931	334	2003	6.00
1941	321	2003	6.23
1951	321	1996.96	6.22
1961	395	1996.96	5.06
1971	584	347.43	0.59
1981	709	347.43	0.49
1991	904	347.43	0.38
2001	1157	347.43	0.30
2010	1171	347.43	0.29

Fieldwork (2010)

Source: Census of India (1901-2001)

REFERENCES CITED

Bhattacharya, M. 1998. *Toto at Cross Roads*. Aparna Book Distributor: Kolkata.

Bose, K. K. 1865. Account of Bhutan. In: *Political Missions to Bhutan*. Calcutta. Manjushree Publishing House: New Delhi. (reprint, 1972).

Chakrobarty, P. and K. Chattopadhyay 1964. Some aspects of Toto ethnography. *Bulletin of the Cultural Research Institute*, III (2).

Chatterjee, S. K. 1951. *Kirata Jana-Kriti*, p. 16. Asiatic Society: Kolkata.
Chaudhuri, S. K. and S. S. Chaudhuri 2005. *Primitive Tribes in Contemporary India*, (eds.). Mittal Publications: New Delhi.
Das, A. K. 1969. *The Totos*. Cultural Research Institute: Kolkata. Eden, A., R. D. Pemberton and K. K. Bose 1865. *Political Missions to Bhutan*. Asian Educational Services: Kolkata. (reprinted).
Grierson, G. A. 1909. *Linguistic Survey of India*. Vol. III, Part- I.
Hunter, W. W. 1876. *Statistical Account of Cooch Behar*, p. 52. Calcutta: Government Press.
Hunter, W. W. 1911. *Statistical Account of Jalpaiguri*, p. 216-218. : Calcutta: Government Press.
Milligan, J. 1919. *Final Report on Survey Settlement Operation in Jalpaiguri District*. Calcutta: Government Press.
Mitra, A. 1953. *The District Handbook*, The Jalpaiguri Census 1951, Appendix VIII, pp. CC XV.
Roy Burman, B .K. 1964. A note on the socio-medical survey among the Totos. *Bulletin of the Cultural Research Institute,* III (344): 16-19.
Sarkar, A. 1991. *Toto: Society and Change (A Sub-Himalayan Tribe of West Bengal).* F. K. Pvt. Ltd.: Kolkata.
Sunder, D. 1895. *Survey and Settlement of Western Duars*. Calcutta: Government Press.
Tarafdar, P. 2010. Traditional Healthcare Practices among the Totos of Totopara, District-Jalpaiguri, West Bengal. *Unpublished Report, U.G.C. Minor Research Project.* Tarafdar, P. and S. Roy 2009. Impact of forest on tribal health: A study among the Totos of Totopara district, Jalpaiguri, West Bengal. *Tribal Health Bulletin*, 14(&2). Regional Medical
Research Centre for Tribals, Jabalpur (publication year 2012).

Department of Anthropology, University of North Bengal, Raja Rammohunpur,
District Darjeeling 734013, West Bengal,

[Reproduced]

রাজ্যের মায়ের স্বাস্থ্য : এক নজরে

- **মাতৃমৃত্যুর অনুপাত** (মেটারনাল মর্টালিটি রেশিও)
  কেরলে (৩০) মহারাষ্ট্র (৩৮), তামিলনাড়ু (৫৮), পশ্চিমবঙ্গ (১০৯), জাতীয় গড় (১০৩), এস.ডি.জির লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০এ ৭০
- **বাল্যবিবাহ :** পশ্চিমবঙ্গ (৪১.৬ শতাংশ), দেশের গড় (২৩.৩ শতাংশ), পূর্ব মেদিনীপুর (৫৭.৫ শতাংশ), পশ্চিম মেদিনীপুর (৫৫.৭ শতাংশ), মুর্শিদাবাদ (৫৫.৪ শতাংশ), পূর্ব বর্ধমান (৫০.৪ শতাংশ)
- **কম ওজনের মেয়েদের সংখ্যা :** রাজ্য (১৪.৮ শতাংশ), দেশ (১৮.৭ শতাংশ), পুরুলিয়া (৩৩.৭ শতাংশ) বাঁকুড়া (২৮ শতাংশ)
- **মহিলাদের রক্তাল্পতার হার :** রাজ্য (৭১.৪ শতাংশ), দেশ (৫৭ শতাংশ)
- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব :** কেরল (১০০ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৯৯.৬ শতাংশ), পশ্চিমবঙ্গ (৯১.৭ শতাংশ), দেশ (৮৮.৬ শতাংশ)
- পাশাপাশি শিশুদের অপুষ্টির কারণে উচ্চতা হ্রাস বেড়ে গেছে রাজ্যে। দার্জিলিং, কলকাতা, মালদা, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগণা, দুই বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ১০টি জেলায় গড় ৩৮.৭ শতাংশ শিশু অপুষ্টিজনিত উচ্চতা হ্রাসে আক্রান্ত।
- স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় সিজারিয়ান সেকশন করে প্রসবের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ। এখানে শহর ও গ্রামে সিজারের হার ৪৩.৫ শতাংশ ও ২৮.৬ শতাংশ। সরকারি ক্ষেত্রে সিজার ৩৪ শতাংশ

টমাস কাপে ভারতের প্রথম জয়, সিন্ধুর সোনা

- ১৯৪৮ থেকে চালু হওয়া পুরুষদের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপ টমাস কাপে প্রথমবার বিজয়ী হল ভারত ১৪ বছরের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়াকে হারিয়ে। ভারতীয় দলের কুশীলবরা হলেন কাদম্বি শ্রীনাথ, হাসিনা সুনীল প্রণয়, লক্ষ্য সেন, সাত্ত্বিক সাইরাজ রনকিরেড্ডি , চিরাগ শেট্টি, ধ্রুব কপিলা প্রমুখ। দলের কোচ বিমল কুমার, বিজয়দীপ সিং প্রমুখ। শ্রীনাথ, প্রণয়রা হায়দ্রাবাদের পি. গোপীচাঁদের প্রশিক্ষণ শিবির থেকে উঠে আসা। লক্ষ্য সেন উঠে এসেছেন বেঙ্গালুরুর প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টন একাদেমি থেকে।
- পি.এস.সিন্ধু ২০২২ সিঙ্গাপুর ওপেন মহিলা সিঙ্গলস ও কমনওয়েলথ ফাইনাল জিতে সোনা পেলেন।

বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে আক্রান্ত গ্রামবাসীদের চিকিৎসায় সাফল্য

চিকিৎসা এবং বিছের কামড়ের ক্ষেত্রে প্র্যাজোসিন এর প্রয়োগ আবিষ্কারের জন্য ২০২১এ পদ্মশ্রী পেয়েছেন ডাঃ হিম্মতরাও সালুবা বায়াস্কার। নাগপুরের সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস এবং পুণের বি.জে. মেডিকেল কলেজ থেকে এম.ডি. করে ডাঃ বায়াস্কার মহারাষ্ট্রের গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে চলে যান। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের বেশিরভাগটাই কেটেছে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা ও কোঙ্কন উপকূলের গ্রামগুলিতে যেখানে বিষাক্ত কাঁকড়া বিছের কামড়ে অনেকে মারা যেতেন। অন্যান্য চিকিৎসার সাথে নাইট্রোপ্রুসাইড ব্যবহার করে তিনি বহু রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। নাইট্রোপ্রুসাইডের গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকার জন্য পরিবর্তে প্র্যাজেসিন ব্যবহার করে সাফল্য পান। অবশেষে তাঁর এই কাজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।

অর্থনীতি

ক্রিপটোকারেন্সি

অমিত দাশগুপ্ত

অতি সম্প্রতি এদেশেও ক্রিপটোকারেন্সি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এবারের বাজেটেও ক্রিপটোকারেন্সিকে মোটামুটি ভাবে অনুমোদন দিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাঁদ সওদাগরের বাম হাতে মনসাকে পুজো দেওয়ার মত করে। ক্রিপটোকারেন্সিকে সম্পদ হিসেবে দেখে তার ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মুনাফার উপর ৩০% কর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও ক্রিপ্টোকারেন্সিকে লেনদেনের আইনি মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, বা ক্রিপটোকারেন্সিকে প্রথাগত অনুমোদন দিয়ে সে বিষয়ে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক আইন তৈরি করা হয়নি। তবে আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া,

ক্রিপটোকারেন্সি

কানাডা বিটকয়েনকে অনুমোদন দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন তৈরি করেছে। অপরদিকে চিন, আলজিরিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, মরক্কো, ইরাক, কাতার, টিউনিশিয়া, ইরাক ও ইজিপ্টে ক্রিপটোকারেন্সি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্রিপ্টোকারেন্সি আদতে নিষিদ্ধ মালদ্বীপ, ভিয়েতনাম, কুয়েত, লিবিয়া, বাহারিন, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, ম্যাকাও, জিম্বাবোয়ের মত অনেকগুলি দেশে। এল সালভাদোর হল এমন একটি দেশ যেখানে বিটকয়েন লেনদেনের আইনি মাধ্যম, অর্থাৎ সকলেই বিটকয়েন গ্রহণ করতে বাধ্য।

অর্থনীতি, ফাটকা ব্যবসায়ী, হিসাবশাস্ত্রী প্রমুখের ক্রিপটোকারেন্সি নিয়ে এত গভীর আলোচনার কারণ একদিকে অর্থনৈতিক দুনিয়ায় ক্রিপটোকারেন্সি যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে ও বিটকয়েন, এথেরিয়াম, টেথারের মত বেশ কয়েকটি ক্রিপটোকারেন্সি যেভাবে ফাটকাবাজারে লেনদেন করতে শুরু করেছে তা হিসাবশাস্ত্রীয় জটিলতা ও ওই ক্রিপটোকারেন্সি থেকে উদ্ভূত মুনাফার উপর কর আদায়, সর্বোপরি প্রচলিত বর্তমান দুনিয়ায় আইনিভাবে লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খোলার সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে। এই নিবন্ধে ক্রিপটোকারেন্সির তেমন কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক্রিপটোকারেন্সি শব্দটিকে ভেঙে দেখলে এতে দুটি ভাগ রয়েছে। ক্রিপটো অর্থাৎ গুপ্ত, কারেন্সি অর্থাৎ মুদ্রা। ফলে ক্রিপটোকারেন্সি হল গুপ্তমুদ্রা, যাকে দেখা যায়না। সে অর্থে মুদ্রার মূল কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া। এছাড়াও টাকা বা মুদ্রা মূল্য পরিমাপের একক, মূল্যের সঞ্চয়, এবং পরবর্তীতে দেয় দায়ের পরিমাপ হিসেবে কাজ করে। একটু বিশদে যাওয়া যাক। টাকা আমরা কেনাবেচা বা লেনদেনের জন্য ব্যবহার করি, তখন সেটা বিনিময়ের মাধ্যম। টাকার নিরিখে পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়, টাকা তখন মূল্য পরিমাপের একক। টাকাকে আমরা সম্পদ হিসেবে জমিয়ে রাখি, টাকা তখন মূল্যের সঞ্চয়। আজকের দেনা কালকে পরিশোধ করা হয়, সেটিও টাকার অঙ্কেই করা হয়, তখন টাকা পরবর্তীতে দেয় দায়ের পরিমাপ। অন্যদিকে টাকা হতে গেলে তাকে সমমানের হতে হবে, সহজে স্থানান্তরযোগ্য হতে হবে, অপচনশীল হতে হবে, টেকসই বা স্থায়ী হতে হবে, এবং সহজবোধ্য হতে হবে। মুদ্রা বা নোট এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে মেনে চলে। এছাড়াও অথনীতিতে টাকার পরিমাণ হল সেই অর্থনীতিতে মানুষের কাছে থাকা মুদ্রা বা নোটের সঙ্গে ব্যাঙ্কে থাকা আমানতের যোগফল, যা সেই অর্থনীতির ক্রয় ক্ষমতা নির্ধারণ করে। তবে যেকোনো দেশের নোট বা মুদ্রা সেই দেশেই অবশ্যগ্রাহ্য, অন্যদেশে তা না হতেও পারে। দেশের মধ্যে টাকার গ্রহণযোগ্যতা আসে ওই টাকা বা মুদ্রা যারা চালু করে তাদের উপরে বিশ্বাস থেকে। সাধারণত, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার মুদ্রা বা টাকার অছি। আরেকটি বিষয় হল যখনই চালু টাকার পরিমাণের সঙ্গে নতুন করে টাকা বা মুদ্রা ওই অছি চালু করে তখন টাকার দাম সেই মুহূর্তে কমে যায়, কারণ পণ্যের পরিমাণ একই থাকছে ও আগের থেকে বেশি টাকা সমপরিমাণ পণ্য কিনছে। কিন্তু ওই অছির কাছে থাকা সামগ্রিক টাকা বা মুদ্রার মূল্য বেড়ে যায়। কারণ তিনিই নতুন টাকার মালিক। সাধারণ ভাবে চালু টাকা বিষয়ে এই কথাগুলি জানানোর সাথে সাথে এটুকুও জানিয়ে রাখা দরকার যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার অছি হিসেবে যেটুকু টাকা বাজারে ছাড়েন বাজারে মোট টাকা বা ক্রয় ক্ষমতার পরিমাণ তার থেকে বেশি হয়। কেননা, যখন টাকা টাকার মালিক ব্যাঙ্কে রাখে তখন সেই আমানতকারীর ক্রয়ক্ষমতা তার গচ্ছিত আমানতের সমান। কিন্তু ব্যাঙ্ক ওই আমানতের অল্প অংশ নগদে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণ দেয় যা ওই ঋণগ্রহীতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ায় ও সে পণ্য কেনে, সেই সূত্রে টাকা আবার ব্যাঙ্কে ফেরে। ব্যাঙ্ক তার স্বল্প অংশ রেখে আবার ঋণ দেয়। এই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে। ফলে অর্থনীতির ক্রয়ক্ষমতা বাজারে চালু নোট বা মুদ্রার কয়েকগুণ হয়। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে বাজারে টাকার (ক্রয় ক্ষমতা) পরিমাণ কমাতে হবে তাহলে তা ওই 'স্বল্প অংশ'কে বাড়িয়ে দিতে পারে। বা বাজার থেকে নোট বা মুদ্রা তুলে

নেওয়ার জন্য বাজারে ঋণপত্র বা বন্ড ছেড়ে দিতে পারে। বিপরীতে বাজারে টাকার যোগান বাড়াতে হলে উল্টোটা করা যেতে পারে। প্রচলিত নোট বা মুদ্রার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আছে।

ক্রিপটোকারেন্সির আলোচনা করার সময়ে প্রচলিত টাকা বা মুদ্রা সম্পর্কে এসব কথা বলে নেওয়া দরকার। কারণ অনেকেরই ধারণা আছে যে, প্রচলিত টাকা ছাড়া মানবজীবন অচল, যদিও 'টাকা' সৃষ্টি করেছে মানুষ, যেমন ঈশ্বরও মানুষ দ্বারা সৃষ্ট। তাই টাকার বিভিন্ন ধরণ ছিল ও আছে। ক্রিপটোকারেন্সি পূর্ণমাত্রায় টাকা হয়ে উঠতে পারে কিনা সেটা একটি লাখ টাকার প্রশ্ন। যদি ক্রিপটোকারেন্সি তা হয়ে উঠতে পারে তাহলে ক্রিপটোকারেন্সির ভবিষ্যত রয়েছে, অন্যথায় নয়, অন্তত মুদ্রা হিসেবে নয়।

বিটকয়েন

আগেই বলেছি, টাকা বা মুদ্রার মূল কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। এবং তা মসৃণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তখনই কাজ করে যখন তা যতদূর সম্ভব সর্বজনগ্রাহ্য হয়। দেশের মধ্যে ওই সর্বজনগ্রাহ্যতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কর্তৃক চালু করা টাকার থাকে কারণ রাষ্ট্র থাকে দেশের চৌহদ্দির মধ্যে আইনি বৈধতা প্রদান করে। কিন্তু দেশের বাইরে সেই বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেক্ষেত্রে দেশের মুদ্রাটির শক্তির উপর তার গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল হয়। যেমন হয়তো বা ডলারের গ্রহণযোগ্যতা ভারতের মাটিতে থাকবে, অন্যত্রও থাকে। কিন্তু ভারতীয় টাকার সেই গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র থাকে না, কিন্তু নেপাল, ভূটানে তা গ্রাহ্য হয়। তবে নেপাল ভূটানের টাকা ভারতের মাটিতে সর্বত্র গ্রাহা হয় না। দেশের অভ্যন্তরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা সেই দেশের মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য করলেও বিদেশের মাটিতে তা করে না। তাহলে ডলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্যত্রও সহজগ্রাহ্য হয় কেন, অন্ততপক্ষে সেই দেশের টাকায় রূপান্তর করা সহজ হয় কেন? কারণ প্রায় সমগ্র বিশ্ব সেটিকে মেনে নিয়েছে তাই। কিন্তু ভূটানের টাকার গ্রহণযোগ্যতা তেমন নয় কেন? কারণ ডলারের যে মান্যতা বিশ্ববাসী দেয় সেটা ভূটানের টাকা, 'এনগালট্রাম'-এর নেই।

তাই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিশ্বজোড়া মান্যতা থাকলে কোনো একটি বা অনেকগুলি ক্রিপটোকারেন্সি বিশ্বমুদ্রা হয়ে উঠতে পারবে। সরকার অনুমোদিত টাকা দেশের মধ্যেও সর্বজনগ্রাহ্য হয় যদি সেই টাকাটির কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ না থাকে। অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট টাকার নোট কেবল একটিই থাকে বা তার কোনো নকল থাকে না। ফলে যদি টাকার জাল হওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় তাহলে টাকার সর্বজনগ্রাহ্যতা কমবে। অনুরূপে ক্রিপটোকারেন্সিকে বিনিময়ের মাধ্যম হয় উঠতে গেলে সেই মুদ্রার (ক্রিপটোকারেন্সি) উপরে এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে তার কোনো নকল নেই এবং ক্রিপটোকারেন্সিকে সকলে মান্যতা দেবে। সরকার নিশ্চয়তা দিক না দিক সাধারণ মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ক্রিপটোকারেন্সিকে মান্যতা দিলেই তা টাকার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু ক্রিপটোকারেন্সির সর্বাধিক পরিচিত নামটি হল বিটকয়েন তাই এরপর থেকে ক্রিপটোকারেন্সির বদলে 'বিটকয়েন' কথাটি ব্যবহার করব।

ক্রিপটোকারেন্সি চালু করার চেষ্টা চলছে গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই। কিন্তু নকল করা যাবে না এমন ক্রিপটোকারেন্সি বন্দোবস্ত তৈরি করা সম্ভব হচ্ছিল না। ২০০৮ সালের বিশ্বজোড়া মন্দার সময়ে সোতাসি নাকামোতো' নামক একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বিটকয়েন বন্দোবস্ত শুরু করেন। যেকোনো মুদ্রাকেই এমনটা হতে হবে যা যেকোনো ব্যক্তি তৈরি করতে না পারে বা সেই মুদ্রা সীমিত পরিমাণে থাকবে। প্রচলিত মুদ্রার ক্ষেত্রে সেই সীমা রাষ্ট্র নির্ধারিত, এবং অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পরিবর্তনশীল। বিটকয়েন এমন একটি বন্দোবস্ত যা নিজস্ব ভাবেই নিজের পরিমাণের সীমা নির্ধারিত করেছে। এক্ষেত্রে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তা করা হয়েছে তার নাম ব্লকচেন প্রযুক্তি। এই লেখায় অবশ্যই সেই প্রযুক্তির গভীরে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং লেখক তাতে পারদর্শীও নয়। তবে নোট কিভাবে বাজারে ছাড়া হয় সেব্যাপারে না জেনেও আমরা সকলে যেমন টাকা ব্যবহার করি তেমনি ক্রিপটোকারেন্সি কিভাবে কাজ করে না জেনেও তা ব্যবহার করা সম্ভব।

অনেকেই এখন বৈদ্যুতিন অনলাইন ওয়ালেটের সঙ্গে পরিচিত, যেমন ফোনপে, পেটিএম, আমাজনপে এইসব। ওইসব ওয়ালেটে টাকা রেখে দিয়ে তা থেকে কেনার জন্য টাকা দেওয়া যায় বা লেনদেনের জন্য ওই ওয়ালেট ব্যবহার করা যায়। আমার যদি কোন ওয়ালেটে টাকা থাকে তার থেকে আরেকজনের অনুরূপ ওয়ালেটে টাকা পাঠানো যাবে বা তার থেকে টাকা গ্রহণ করা যাবে। বিটকয়েনের জন্যও অনুরূপ ওয়ালেটের প্রয়োজন। তবে বিটকয়েন কোথায় কত আছে তা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। অর্থনীতিতে যত বিটকয়েন রয়েছে তা সব অপার্থিব বা ভার্চুয়াল। কিন্তু কত রয়েছে কোনো ওয়ালেটে তা অংশগ্রহণকারী সকলের জানা। যখনই কোনো বিটকয়েনের লেনদেন হয় তখনই সেই লেনদেনের ফলে কোনো ওয়ালেটে যা জমা পড়ে কোনো ওয়ালেট থেকে যা খরচ হয় ও তার ফলে বিভিন্ন ওয়ালেটে থাকা বিটকয়েনের পরিমাণের যে পরিবর্তন ঘটে তা সমস্ত হিসেব নিকেশের পরে সকলে জানতে পারে। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত যে বিটকয়েনের লেনদেন হচ্ছে তা বিটকয়েন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ওয়ালেট বা লেজারে প্রতিফলিত হবে। ওই সমস্ত লেনদেন এক

একটি ব্লকের শৃঙ্খল তৈরি করবে যাকে মূলতঃ ব্লক চেইন প্রযুক্তি বা ব্লক চেইন লেজার বলা হয়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক কোনো একটি গ্রামে যে সমস্ত টাকার লেনদেন হয় তার হিসেব যে যারটা রাখে। ফলে নিজেদের মধ্যে হিসেবের গন্ডগোল হয়। তখন সবাই ঠিক করল যে, কোনো লেনদেন হলেই গ্রামের কোনো একটা জায়গায় সমাবেশিত হয়ে ঘোষণা করা হবে ও সবাই সেই সমস্ত লেনদেনের ফলে তাদের খাতায় যে পরিবর্তন হবে সেটা লিপিবদ্ধ করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করবে। ফলে যদি একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনো গরমিল থাকে তাহলে তা শুধরে নেওয়া যাবে ও তেমন কোনো বিরোধ হলে অধিকাংশের সম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে। অর্থাৎ লেনদেনের সঙ্গে পুরো গ্রামের মানুষ বা ব্লক জুড়ে থাকবে। বিটকয়েনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বন্দোবস্ত। বিটকয়েন লেনদেন হলে ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কম্পিউটার ওই লেনদেনের বৈধতা ও যথার্থতা নিরূপণ করবে সংশ্লিষ্ট এক সফটওয়ারের মাধ্যমে। যখন ওই লেনদেনটির বৈধতা স্বীকৃত হবে তখন যে কম্পিউটার বা কম্পিউটারসমূহ ওই লেনদেন সম্পূর্ণ করার কাজটি প্রথমে সমাপ্ত করবে তারা একটি বিট কয়েন পাবে। অর্থাৎ তার ফলে একটি নতুন বিটকয়েন সৃষ্ট হবে। এমনভাবেই বন্দোবস্তটি আছে যে ওই সমাপ্তির জন্য মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় লাগে। ফলে ওই নির্দিষ্ট সময় অন্তর একটি বিটকয়েন তৈরি হয়। মনে রাখা দরকার বিটকয়েন তৈরি হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যেক বিটকয়েনের দাম একটু হলেও কমে যায়। কারণ পণ্যের পরিমাণ এক থাকলে টাকার পরিমাণ বাড়লে টাকার দাম কমে।

যেহেতু বিটকয়েন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি সীমা নির্ধারিত আছে তাই যথেচ্ছভাবে কেউ তা সৃষ্টি করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, যেহেতু বহুব্যক্তি তাদের কম্পিউটার ব্যবহার করে বিটকয়েনের লেনদেন সংক্রান্ত পদ্ধতিটির সমাপ্তিবিন্দুতে সকলের আগে পৌঁছতে চাইছেন তাই কোনো একজনের কাছে সমস্ত বিটকয়েন চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রহিত। এছাড়াও সর্বসাকুল্যে ২ কোটি ১০ লক্ষ বিটকয়েন চালু হওয়ার পরে নতুন করে বিটকয়েন তৈরি হবে না। অবশ্য বিটকয়েনের ভগ্নাংশ দিয়ে লেনদেন করা যাবে। তবে লেনদেনের যথার্থ নির্ধারণকারীরা পুরস্কৃত হবে কী করে? এক্ষেত্রে যার ভাগে লেনদেন সম্পূর্ণ করার কৃতিত্ব এসে উপস্থিত হবে সে বা তারা লেনদেনের একটি অতিক্ষুদ্র অংশ লেনদেন ফি বাবদ বিটকয়েনের মাধ্যমেই পাবে। যেমনটা ভাবা হয়েছে তাতে বিটকয়েন সৃষ্টি ১৩০ বছর ধরে চলবে।

যেহেতু আমরা সরকারের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রচলিত মুদ্রাকে ব্যবহার করে থাকি, তাই একটি প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, বিটকয়েনের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা কে নিশ্চিত করবে? এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো অছি নেই। কিন্তু ব্লকচেইন প্রযুক্তি থেকে উদ্ভুত সার্বিক স্বচ্ছতা আছে। মনে রাখা দরকার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে লেনদেন যেকোনো বিনিময়ের মাধ্যম ব্যবহার করেই করতে পারে। অবশ্যই সেগুলিকে নির্দিষ্ট মানের হতে হবে ও তাদের পরিমাণ সীমিত হতে হবে। এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দ্ব্যর্থহীন ভাবে গ্রহণ করতে রাজি থাকবে। বিটকয়েন যদি সকলে গ্রহণ করতে রাজি যাকে তাহলে বিটকয়েন লেনদেন ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত হতে কোনো বাধা থাকবে না, রাষ্ট্র বা সরকার তাকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক। যেমন কোনো রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা ছাড়াই কড়ি একসময়ে বিনিময় ও লেনদেনের মাধ্যম ছিল।

বিটকয়েন সার্বিক বিনিময়ের মাধ্যম হতে গেলে বিনিময় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত সকলের বিটকয়েন লেজার বা খতিয়ান থাকতে হবে। ওই খতিয়ানের জন্য একটি ব্যবহারকারীর নাম (নিজের না হয়ে কোন ছদ্মনামও হতে পারে) ও একটি সঙ্কেতচিহ্ন (পাশওয়ার্ড) লাগবে। কিছু কিনতে গেলে বিক্রেতার খতিয়ানে বিটকয়েন পাঠাতে হবে। আগেই বলেছি ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই বিটকয়েনের অধিকারী ক্রেতা কিনা তা যাচাই হবে। ও লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরে পুরো বিটকয়েন বস্তার মধ্যে থাকা সমস্ত খতিয়ান নবায়িত হবে। সকলে তা জানতে পারবে। কিন্তু কে সেই খতিয়ানের মালিক সেই ব্যক্তিগত তথ্য জানা যাবে না। সেই দিক থেকে বিটকয়েন সম্পূর্ণ গোপন।

বিটকয়েন বা ক্রিপটোকারেন্সি যদি সর্বব্যাপী হয়ে পড়ে তাহলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর থেকে রাষ্ট্রের তথা ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ উঠে যাবে। তদর্থে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই অর্থহীন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বিটকয়েন একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা। কোনো ধরনের বিদেশি মুদ্রা বিনিময় বন্দোবস্ত লাগবে না। বিশ্ববাজারকে প্রায় মুক্ত করে তুলবে। টাকার উপর থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত হলে ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে রাষ্ট্রের পক্ষে। বর্তমানে যেমন অতি শক্তিশালী ধনী দেশ সেদেশের অপছন্দের কাজ করা কোনো দেশের উপরে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে তা করা অসম্ভব হয়ে উঠেবে বিটকয়েনের দুনিয়ায়।

পৃথিবীর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সবসময়ই প্রচলিত ব্যবস্থাকে ব্যতিব্যস্ত করে ওলোটপালোট করে দিয়েছে। যেমন কম্পিউটার ইন্টারনেট। বিটকয়েনও তেমনি এক ডিসরাপটিভ' বা ওলোটপালোটকারী প্রযুক্তি যা এসে উপস্থিত হয়েছে ও ভবিষ্যতে তা সকলকে মেনে নিতে বাধ্য করবে বলেই মনে হচ্ছে। যারা কেবল বিটকয়েনকে ফাটকা মুনাফার জন্য এক ধরনের সম্পদ ভাবছে তাদের ভাবনায় যে সঙ্কীর্ণতা আছে তা অচিরেই ধাক্কা খাবে বলে মনে হয়।

অর্থনীতির হালহকিকৎ

বুনো রামনাথ

- **নোটবন্দির ধাক্কা:** অবশেষে ২০২১ এর সংসদের বাদল অধিবেশনে সরকার মেনে নিলেন যে নোটবন্দিতে ধাক্কা খায় ছোট শিল্প। ২০১৬-র ৮ নভেম্বর রাত ১২টা থেকে নোট বাতিলের পর দ্বিতীয় ধাক্কা জি.এস.টি লাগু। তৃতীয় ধাক্কা কোভিড অতিমারি ও লকডাউন। নগদের অভাবে কাঁচামাল কিনতে না পারা, কর্মীদের বেতন দিতে না পারা। অর্থাভাবে ক্রেতারাও দোকানমুখী হয়নি। ফলে পণ্যের চাহিদাও হ্রাস পায়।
- **পেট্রলে আয়:** ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে সরকার পেট্রপণ্য থেকে আয় করেছে ১.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা এবং ২০২০-'২১ এ ৩.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা।
- **ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন:** কর্পোরেট সংস্থাকে সরকারি সম্পদ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে ২০২১-'২২ এর পর থেকে ২০২৪-'২৫ অবধি দুই অর্থবর্ষে ছয় লক্ষ কোটি টাকার পরিকল্পনা। এর মধ্যে যেগুলি ধরা হয়েছে: জাতীয় সড়ক (২৬,৭০০ কি.মি.), রেল (৪০০ স্টেশন, ১০৯ জোড়া দূরপাল্লার ট্রেন), বিদ্যুৎ পরিবহণ (৪২, ৩০০ সার্কিট কিলোমিটার লাইন)
  - * বিদ্যুৎ উৎপাদন (৫০০০ মেগাওয়াট জল, বায়ু ও সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কাঠামো)
  - * গ্যাসের পাইপ লাইন ('গেল' এর ৮,০০০ কি.মি. পাইপ লাইন)
  - * তেলের পাইপ লাইন (ইন্ডিয়ান অয়েল ও হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ৪,০০০ কি.মি. পাইপ লাইন)
  - * টেলি-যোগাযোগ (বিএসএনএল ও এমটি এনএল-র টাওয়ার)
  - * খনি (১৬০টি কয়লা খনি প্রকল্প)
  - * বন্দর (২৫টি বিমানবন্দর ও ৩১টি জাহাজ বন্দরের পরিকাঠামো)
  - * স্টেডিয়াম (১১,০০০)
- **টাটাদের 'এয়ার ইন্ডিয়া' পুনরায় অধিগ্রহণ:** ১৯৩২ এ জে.আর.ডি. টাটার চেয়ারম্যানশিপে 'টাটা এয়ারলাইন্স' চালু। ১৯৪৫ এ শেয়ার বাজারে নথি ভুক্তির সময় নাম পরিবর্তন হয়ে 'এয়ার ইন্ডিয়া (এ.আই)'। ১৯৪৮ এ ৪৯% অংশীদারিত্ব কিনল কেন্দ্র। ১৯৫৩ তে জাতীয়করণ। ৯০-র দশকে উড়ান পরিষেবায় বেসরকারি সংস্থার প্রবেশ এবং প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস' দুই সরকারি উড়ান সংস্থা। ২০০৭ এ দুই সংস্থার সংযুক্তিকরণের পরও বিপুল লোকসান। ২০১২ তে ৩০ হাজার কোটি টাকার ত্রাণ প্রকল্পেও এর সুরাহা হয়না। ২০১৬-'১৭ থেকে বিলগ্নিকরণের বা বিক্রির চেষ্টা। ৮ অক্টোবর ২০২১-এ ১৮ হাজার কোটি টাকায় এ.আই.কে টাটার ক্রয়। ২৭ জানুয়ারি ২০২২ এ অধিগ্রহণ সম্পূর্ণ।
- **তেলের থেকে তোলা :**

তেলের দাম টাকায় (নভেম্বর' ২১)

শোধন, পরিবহন সহ তেলের দাম	কেন্দ্রের উৎপাদন শুল্ক	রাজ্যের ভ্যাট	ডিলার কমিশন	মোট দাম
		পেট্রল		
৫৩.০৩	২৭.৯০	২০-২৩	৩.৫১	১০৪.৬৭
		ডিজেল		
৫৩.০৪	২১.৮০	১২.৭২	২.২৩	৮৯.৭৯

- **কৃষিক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতি:**
  - * খাদ্যসাথীর আওতায় ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে রেশন। ১০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন।
  - * ৫০টি শহরে 'মা' ক্যান্টিনে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত খাবার। প্রতি প্লেট ৫ টাকা। ডিম-ভাত-সব্জী।
  - * কৃষকবন্ধু প্রকল্পে প্রতি একরে বছরে ১০ হাজার টাকা সহায়তা। উপকৃত হবেন ৬৮ লক্ষ কৃষক।
  - * প্রতিটি জেলায় মেগা/মিনি ফুড পার্ক।
  - * খাদ্যশস্য ও চারটি বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে দেশে প্রথম পাঁচে থাকা।
  - * আরও তিন লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিতে ফসল উৎপাদন করে এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে দোফসলি করে ফসল ঘনত্বে শীর্ষস্থানে উঠে আসা।
- **নোট মুক্তি:** ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নোটবন্দি ঘোষণার সময় বাজারে থাকা নোটের মূল্য ছিল ১৭.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা। পাঁচ বছর পর ২০২১-র ২৯ অক্টোবর বাজারে থাকা নোটের মূল্য দাঁড়ায় ২৯.১৭ লক্ষ কোটি টাকা।
- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিশ্রুতি:**
  - * সমস্ত যোগ্য পড়ুয়াকে ৪% সুদে ১০ লক্ষ টাকা অবধি শিক্ষাঋণ
  - * শিক্ষায় রাজ্যের বরাদ্দ ২.৭% থেকে বাড়িয়ে ৪%
  - * প্রতি ব্লকে অন্তত একটি করে সরকারি মডেল আবাসিক স্কুল
  - * শিক্ষক পদের দ্বিগুণ বৃদ্ধি
  - * কন্যাশ্রী প্রকল্পকে উচ্চশিক্ষা ও কর্মস্থানে প্রসার করা
  - * পার্শ্ব শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং অবসরে ৩ লক্ষ টাকা এককালীন অনুদান
  - * ২৭৮টি সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (আইটিআই) স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ
  - * সকলের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা
  - * স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপির ০.৮৩% থেকে বাড়িয়ে ১.৫% করা
  - * ২৩টি জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
  - * চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিকদের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা
  - * সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় নিয়ে আসা

● **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন তিন জনপ্রিয় প্রকল্প:**

(১) লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প: প্রত্যেক উপযুক্ত পরিবারের মহিলাকে মাসে ৫০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের মহিলাকে মাসে ১০০০ টাকা করে দেওয়া। (২) খাদ্যসাথীর আওতায় দেড় কোটি পরিবারের দুয়ারে রেশন ও (৩) বাংলা বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্পমূল্যের আবাসন।

● **মৎস্যজীবীদের গভীর সঙ্কট:**

কিছুটা প্রাকৃতিক কারণে তার চাইতেও বেশি মনুষ্যকৃত উষ্ণায়ন, বড় বাঁধ, ব্যারাজ, ব্রিজ, দূষণ প্রভৃতি কারণে দেশের নদীগুলি শুকিয়ে এসেছে। আর তাতে যেটুকু জল আছে তাও বিষাক্ত। অন্যান্য জলাশয়গুলি হয় ধ্বংস করা হচ্ছে নতুবা বুজিয়ে কেবল ঘর-বাড়ির চাষ করা হচ্ছে। ফলে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পারছেন না, ধরতে গিয়ে পাচ্ছেন না মাছ। তাদের কেউ কেউ পরিযায়ী শ্রমিকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। বাকিরা সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলারের মালিকদের বাঁধা শ্রমিক হিসাবে নাম লেখাচ্ছেন। পাল্টে যাচ্ছে জীবনধারা। সমুদ্র যাত্রায় অনভিজ্ঞ তারা প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন অথবা অন্য দেশের সমুদ্রসীমা লঙ্ঘনের দায়ে অন্য দেশের নৌসেনার গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছেন অথবা সেই দেশের জেলে সাজা খাটছেন।

● **নায়কা সংস্থার নায়িকা:**

তিনি উদ্যোগপতি ফাল্গুনী নায়ার। বায়োকনের কিরণ মজুমদার, বাইজুজের দিব্যা গোকুলনাথদের মত মহিলা ক্রোড়পতিদের মত সামনের সারিতে উঠে এসেছেন। দীর্ঘদিন কোটাক মাহিন্দ্রা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের এমডি সহ বিভিন্ন পদে ছিলেন। নয় বছর আগে চাকরি ছেড়ে নায়কা ফ্যাশন সংস্থা তৈরি করে ইউনিকর্ন স্টার্ট আপে পা রাখেন। তার এফএসএন ই-কমার্স ভেঞ্চার্স শেয়ার বাজারে পা রাখে। ইতিমধ্যে তার সম্পদ এক লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

● **পেটিএমের শেয়ার ডিগবাজি:**

২০১৫-র নোটবন্দির পর যে সংস্থাটি ডিজিটাল লেনদেন করে খুব লাভবান হয় তার নাম পেটিএম। সেই সময় রিলায়েন্স জিয়োর মত বেআইনিভাবে নরেন্দ্র মোদির ছবি ব্যবহার করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর আর. গান্ধি অবসর নিয়ে পেটিএমে যোগ দেন। পেটিএমের মূল সংস্থা ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন ৮ নভেম্বর '১১ প্রথমে বাজারে শেয়ার ছাড়ে ১৮৩০০ কোটি টাকার। অনেক বেশি টাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ ২১৫০ টাকা দরের শেয়ারগুলি কেনেন যা দুদিনের মধ্যে মূল দামের চাইতেও অনেক কমে নামিয়ে আনা হয়।

● **তিন বছরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট**

জুন ২০১৯	জুন ২০২০	জুন ২০২১
৫.৭৫%	৪০.০০%	৪.৯০%

● **বেকারত্ব বৃদ্ধি**

	২০২০	২০২১	২০২২
মার্চ	৪.৫৫	৭.৫৬	৮.২৪

● **মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাষ (২০২২-'২৩) :** ৬.৭%

● **ইকুইটি ফাণ্ডে লগ্নির পরিমাণ (কোটি টাকায়)**

ডিসেম্বর '২১	মার্চ '২০২২	মে ২২
২৫,০৭৭	২৮,৪৬৩	১৮,৫২৯

● **গাড়ি শিল্প মুখ থুবড়েই:**

মন্দা, অতিমারি ও তেলের অতিরিক্ত দামের জন্য গাড়ি শিল্পের বিক্রি ২০২১এ ২০১৯ থেকে—২০.৮২% ও ২০২০ থেকে—১৮.২১% কমে গেছে।

● **অর্থনীতির গতি হ্রাস-বৃদ্ধি (২০২০-'২১):**

ত্রৈমাসিক	বৃদ্ধির হার (%)	ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির হার (%)
* এপ্রিল-জুন '২০	(—) ২৪.৪	এপ্রিল-জুন '২১ ২০.১
* জুলাই-সেপ্টেম্বর '২০	(—) ০৭.৪	জুলাই-সেপ্টেম্বর '২১ ০৮.৪
* অক্টোবর-ডিসেম্বর '২০	০.৫	অক্টোবর-ডিসেম্বর '২১ ৫.৪
* জানুয়ারি-মার্চ ২১	১.৬	জানুয়ারি-মার্চ ২১ ৪.১

● **সঙ্গে শিল্পোৎপাদন হ্রাস (২০২১-'২২)**

* এপ্রিল-জুন '২১ ১৭.৬৩%
* জুলাই-সেপ্টেম্বর '২১ ০৬.১৬%
* অক্টোবর-ডিসেম্বর '২১ ৪.০২%

● **দারিদ্রের সাথে চরম অসাম্য ভারতে** (ওয়ার্ল্ড ইনইকুইলিটি ল্যাব—প্যারিস স্কুল অফ ইকনমিকস)

* ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে ভারতীয়দের মাথাপিছু গড় আয় বার্ষিক দু লক্ষ চার হাজার ২০০ টাকা। এর মধ্যে ৫০% মানুষের গড় আয় মাত্র ৫৩ হাজার ৬১০ টাকা যেখানে উপরতলার ১০% মানুষের গড় আয় প্রায় ২০ গুণ, ১১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫২০ টাকা।
* দেশের পরিবারগুলির গড় সম্পদের পরিমাণ নয় লক্ষ ৮৩ হাজার ১০ টাকা। নিচের তলার ৫০% মানুষের গড় সম্পদ যেখানে ৬৫ হাজার ২৮০ টাকা। সেখানে ধনীতম ১০% পরিবারের গড় সম্পদ ৬৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার এবং ধনীতম ১% পরিবারের গড় সম্পদ তিন কোটি ২৪ লক্ষ টাকার বেশি।

* দেশের নীচুতলার ৫০% মানুষকে দেশের মোট আয়ের ১৩% দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। ধনীতম ১০% বা ৫%-র তুলনায় মধ্যবিত্তরা অনেক গরীব। আয়ের তুলনায় সম্পদের মাপকাঠিতে অসাম্য আরও বেশি। লিঙ্গ বৈষম্যও চরমে।
* গত তিন বছরে অসাম্য নিয়ে সরকারি তথ্যের গুনমান খারাপ হয়েছে, প্রকৃত চিত্র বোঝা কঠিন হয়ে পড়ছে।
* মোট আয়ে মহিলা শ্রমিকদের ভাগ মাত্র ১৮%, গোটা বিশ্বে সর্বনিম্ন।

● **খুচরো ও পাইকারি মূল্যের বৃদ্ধি (২০২১-'২২)**

খুচরো মূল্যের বৃদ্ধি %	পাইকারি মূল্যের বৃদ্ধি %
জুলাই (৫.০৯),আগষ্ট (৫.৩) সেপ্টেম্বর (৪.৩৫), অক্টোবর (৪.৪৮) নভেম্বর (৪.৯১), ডিসেম্বর (৫.৫৯)	এপ্রিল (১০.৭৪), মে (১৩.১১), জুন (১২.০৭), জুলাই (১১.৫৭), আগষ্ট (১১.৬৪), সেপ্টেম্বর (১১.৮০), অক্টোবর (১২.৫৪), নভেম্বর (১৪.২৩), ডিসেম্বর (১৩.৫৬)

- **ঋণচক্রে পশ্চিমবঙ্গ:** ২০১১-'১২তে ঋণ ছিল এক লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৮৭ কোটি টাকা যা ২০২০-২১ এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার লক্ষ ৮১ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা। ১০ কোটি ১৯ লক্ষ জনসংখ্যার মাথাপিছু ঋণ ৮৯,২৪২ টাকা যা ২০২১-২২এ দাঁড়াচ্ছে মাথাপিছু ৫২,৩৮৮ টাকা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ঋণের বোঝা রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (স্টেট জিডিপি) ৩৪.২%। এর উপর একগুচ্ছ জনবাদী প্রকল্পে কর বাবদ আয়ের ২৫% খরচ হয়ে যাচ্ছে।
- **বাংলাদেশের আর্থিক উন্নতি (২০২১):**

	মোট জিডিপি	মাথাপিছু জিডিপি
বাংলাদেশ	২৩ ট্রিলিয়ন ডলার	২৫৫৪ ডলার
পাকিস্তান	২৩ ট্রিলিয়ন ডলার	১৫৪৩ ডলার
ভারত	১৪৭ ট্রিলিয়ন ডলার	১৭৫০ ডলার
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)	২১০ বিলিয়ন ডলার	১৬৯৫ ডলার

	শিক্ষায় খরচ	স্বাস্থ্যে খরচ	প্রতিরক্ষায় খরচ
বাংলাদেশ	১১%	৪%	৯%
পাকিস্তান	২.৫%	১.২%	১৮%
ভারত	৩%	১.৬%	১৪%
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)	১.০২%	০.৩৭%	—

- **ফকিরি চাল:** তাঁর সাত বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে দেশের অর্থনীতি যখন টালমাটাল, নোট বন্দি ও লকডাউনের ধাক্কায় ভূপতিত, তখন স্বঘোষিত ফকির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দুর্মূল্য পেন, রোদ চশমা, পোষাক আশাক, সাজসজ্জা সবসময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এরপর তাঁর আধুনিক আরাম সহ ১৩,৪৫০ কোটি টাকায় সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি হচ্ছে। এরপর তাঁর এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির ব্যবহারের জন্য ৮,৪০০ কোটি টাকায় তিনটে বিলাসবহুল আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্বলিত বোয়িং ৭৭৭ বিমান কেনা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের 'এয়ার ফোর্সওয়ান' এর মত ('এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান')। এবার মোদির ব্যবহারের জন্য ২৪ কোটি টাকা দিয়ে কেনা হল দুটি অত্যাধুনিক 'মার্সিডিজ মেব্যাক-এস ৬৫০' গাড়ি।
- **কাজের বাজার-বেকারত্বের হার (২০২১):** আগষ্ট (৮.৩২%), সেপ্টেম্বর(৬.৮৬%), অক্টোবর(৭.৭৫%), নভেম্বর (৭.০০%), ডিসেম্বর (৭.৯১%)
- **কোভিডে হোটেল শিল্প:** ঘর ও রেস্তোরাঁর চাহিদা তলানিতে পৌঁছয়। কাজ হারান প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ।
- **প্রভিডেন্ট ফান্ডে কোপ:** উত্তরপ্রদেশ সহ পাঁচ রাজ্যের ভোটের পরেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ইপিএফ) সুদ একধাক্কায় কমিয়ে ৮.১০% করে দিল কেন্দ্র সরকার। যা বিগত ৪৪ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। পিএফের গ্রাহক প্রায় পাঁচ কোটি ভারতীয়।
- **বিজেপি সবচাইতে ধনী :** ২০১৯-'২০ অর্থবর্ষে সাতটি জাতীয় দল ও ৪৪টি আঞ্চলিক দল তাদের সম্পদের যে হিসাব দায়ের করেছে তার ভিত্তিতে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস' জানাচ্ছে সব চাইতে ধনী বিজেপি (৪৮৪৭.৭৮ কোটি টাকা)। তারপর বহুজন সমাজ পার্টি (৬৯৮.৩৩ কোটি টাকা)। তৃতীয় কংগ্রেস (৫৮৮.১৬ কোটি টাকা)।
- **সবচাইতে ঋণজর্জর, সবচাইতে ভিখারিময়:** উত্তরপ্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গ সবচাইতে ঋণজর্জর রাজ্য যা নিয়ে অনেকদিন চর্চা চলছে। কেন্দ্রের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের ভিখারির সংখ্যা সবচাইতে বেশি। ২০১৮-১৯ সালে ভারতে ভিখারির সংখ্যা ছিল চার লক্ষ ১৪ হাজার। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ৮১হাজারের বেশি। দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ (৬৫ হাজারের বেশি)। ঐ রিপোর্টেই বলা হয়েছে দেশে প্রতি মাসে ৪০ হাজারের বেশি শিশু অপহৃত হয় আর দৈনিক তিন লক্ষ শিশু হয় নেশার কবলে পড়ে অথবা ভিক্ষাবৃত্তি নেয়। কোভিড অতিমারির পর এই সংখ্যাগুলো অনেক বেশি বলে আশঙ্কা।
- **পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের পর কেন্দ্রের জোড়া উপহার:** এক ধাক্কায় ১৪.২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হল ৯৭৬ টাকা। পেট্রলের দাম ৮৪ পয়সা বেড়ে ২১ মার্চ '২২ তে দাঁড়াল ১০৫.৫১ টাকা। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণ দেখানো হলেও ঐ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ভোটের আগে থেকে। ভোটের আগে ও বহুদফার ভোটের মাঝে তেলের দাম বাড়েনি। তাছাড়া ভারত মূল্যবৃদ্ধি ঘোষণার সময়ে আই.ও.এলের মাধ্যমে রাশিয়া থেকে সস্তায় ৩০ লক্ষ ব্যারেল অশোধিত তেল কিনেছে। ততদিনে বিশ্ব বাজারে তেলের দামও কমতে শুরু করেছে।
- **পাটশিল্পে সঙ্কট :** এখনবধি যে পাটকলগুলি ধুঁকে ধুঁকে চলছিল তারাও বাজারে কাঁচা পাটের অভাবে কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক কর্মহীন। গত বছর ভালো পরিমাণ পাট উৎপাদন সত্ত্বেও সরকারের নজরদারির অভাবে পাটচাষীরা জেসিআই নির্ধারিত টন প্রতি ৬৫ হাজার টাকা সহায়ক মূল্য পাচ্ছেন না। চলছে ফাটকাবাজি, মজুতদারি, কালোবাজারি। অথচ ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার করলে পাটশিল্পে জোয়ার আসত।
- **এল. আই. সি.র শেয়ারের অবমূল্যায়ন :** রাষ্ট্রীয় লাভজনক সংস্থা এল.আই.সি-র বিলগ্নীকরণ করে সরকার টাকা তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফেব্রুয়ারিতে এল.আই.সি.-র মূল্যায়ন হয় ১৪ লক্ষ কোটি টাকা। এপ্রিলে ছয় লক্ষ টাকা অবমূল্যায়ণ দেখিয়ে মাত্র ৯০৪-৯৪৯ টাকা শেয়ার দর করে দেশী-বিদেশী লগ্নীকারীদের কাছে ছাড়া হল।
- **ভারত নেট বিএসএনএলের হাতে :** গ্রামাঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার প্রকল্প 'ভারত নেটে'র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'ভারত ব্রডব্যাণ্ড নেটওয়ার্ক লিমিটেডে'র (বিবিএনএল) হাত থেকে 'বিএসএনএল'র উপর ন্যস্ত করল কেন্দ্রীয় টেলিকম দফতর (ডট)। ২০১২তে চলা শুরু করার পর ২০২১-র মার্চ অবধি ভারত নেট প্রকল্পে বিএসএনএল, রেলটেল ও পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনই ১.৮৫ লক্ষ পঞ্চায়েতে ৫.৬৭ লক্ষ কি.মি. ফাইবার পেতেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২৬০০-র বেশি পঞ্চায়েতে ৬৪০০ কি.মি. ফাইবার পাতা হয়েছে।

- **রপ্তানি সূচকে পশ্চিমবঙ্গ :** এক্সপোর্ট প্রিপেয়ার্ডনেস ইনডেক্স ২০২১ অনুযায়ী রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ১৯। উপকূলবর্তী আটটি রাজ্যের মধ্যে সব শেষে। শীর্ষে গুজরাত, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র, তৃতীয় কর্ণাটক।
- **ডানলপ কারখানাকে নিলামে তোলা হল :** একদা সাইকেল, স্কুটার, গাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্রাক্টর, বিমান, যুদ্ধবিমানের টায়ার, কনভেয়ার বেল্ট ইত্যাদি তৈরির অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ডানলপ রাবার কোম্পানি, পরবর্তিতে ডানলপ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের, হুগলির সাহাগঞ্জের কারখানাটিকে নিলামে তোলা হল। ৭০ দশক থেকে তেল সঙ্কট, প্রতিযোগিতা, পরিচালনার অদক্ষতা ও শ্রমিক অসন্তোষ কারখানাটিকে অলাভজনক করে তোলে। এরমধ্যে ১৯৮৪এ মনু ছাবরিয়া এটিকে কিনে আর.পি. গোয়েঙ্কার সাথে চালাতে থাকেন। কিন্তু সমস্যা কাটে না। ১৯৯৮ থেকে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বি.আই.এফ.আরে যায়। ২০০৫এ পবন রুইয়া কিনে কারখানার সম্পত্তি বিক্রি করতে থাকেন। ২০১২তে কোর্টের নির্দেশে লিকুইডেটর নিযুক্ত হয়।
- **এলআইসিতে বিদেশী লগ্নি :** কেন্দ্র সরকার বীমা ব্যবসায়ে আগেই ৭৮ শতাংশ পর্যন্ত এফডিআই-এর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এই বিশাল রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাটিতে ছিল নিজস্ব এলআইসি আইন। সেটি শিথিল করে ২০ শতাংশ পর্যন্ত এফডিআই, সরকারের হাতে থাকা অংশীদারির ৫ শতাংশ (৩১.৫২ কোটি টাকা) বিক্রি করার এবং বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে রাজকোষে ৬৩, ০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করল কেন্দ্র।
- **পাঁচ দিনে ১৯.৫ লক্ষ কোটি টাকা উধাও :** জানুয়ারি '২২এর তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা, তেল সঙ্কট ও শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজির কারণে পাঁচ দিনে সেনসেক্সের পতন হল ৩৮১৭ পয়েন্ট, লগ্নীকারীরা হারালো ১৯.৫০ লক্ষ কোটি টাকা। বিদেশী লগ্নিকারীরা বিক্রি করলেন ১৬,৪৯৫.১৯ কোটি টাকার শেয়ার।
- **বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন (বিজিবিএস) :** নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ২০ ও ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হল ষষ্ঠ সম্মেলন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন আগের পাঁচটি সম্মেলনে ১২.৩৫ লক্ষ টাকার বিপুল লগ্নি এসেছে। বিরোধিরা অবশ্য সংশয় প্রকাশ করেছেন। এই সম্মেলনে গৌতম আদানি বন্দর পরিকাঠামো, ওয়ার হাউসিং ও লজিস্টিক পার্ক, ডেটা সেন্টার, সমুদ্রের নীচ দিয়ে কেবল পাঠানো, ডিজিটাল উৎকর্ষ কেন্দ্র ১০ বছরে ১০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিলেন। শেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রীর ৩.৪২ লক্ষ টাকার লগ্নির প্রস্তাব ও ৪০ লক্ষ চাকরি নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।
- **মিড ডে মিলে কোপ :** প্রাক্ প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মাথা পিছু দৈনিক বরাদ্দ ৪ টাকা ৯৭ পয়সা, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মাথা পিছু দৈনিক বরাদ্দ ৭ টাকা ৪৫ পয়সা। তাই মিড ডে মিল থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে ডিম, ডাল, সোয়াবিন প্রভৃতি পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
- **এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ও এইচডিএফসি গৃহঋণ সংস্থার সংযুক্তি:** সম্মিলিত সম্পদ দাঁড়াবে ২৫.৬১ লক্ষ কোটি টাকা। মোট আয় ১.১৭ লক্ষ কোটি টাকা।
- **ফিউচার নিয়ে টানাপোড়েন :** ২০১১তে কিশোর বিয়ানি প্রতিষ্ঠিত ফিউচার গ্রুপ রমরমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। সারাদেশ জুড়ে ৩৫০-র বেশি খুচরো বিপণন কেন্দ্র বিগ বাজার, ফুড বাজার, প্যান্টালুনস, ব্র্যাণ্ড ফ্যাক্টরি, হোম টাউন ইত্যাদি ১৯টি জনপ্রিয় সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসা চলছিল। ২০১২তে সংস্থার ঋণ কমাতে প্যান্টালুন সংস্থার ৫০ শতাংশ শেয়ার আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীকে বিক্রি করা হয়। ২০১৯এ অ্যামাজন ফিউচার কুপনের ৩.৫ শতাংশ শেয়ারের অধিকার পায়। এবার ২০২০তে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স রিটেইল প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকায় ফিউচার গোষ্ঠীর খুচরো, পাইকারি, গুদাম ও পণ্যপরিবহন ব্যবসা কিনতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এর বিরুদ্ধে অ্যামাজন সিঙ্গাপুরের সালিশি আদালতে যায়। আদালত স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর রিলায়েন্স দিল্লি ও সুপ্রিম কোর্টে যায় এবং সেখানকার নির্দেশে ফিউচারের বিপণি হাতে নেওয়া শুরু করে। হঠাৎই ২২ এপ্রিল '২২ ঋণদাতাদের সম্পূর্ণ সায় মেলেনি কারণ দেখিয়ে রিলায়েন্স চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ায়।
- **রান্নার গ্যাস হাজার পেরোলো :** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। পেট্রলের দাম আগেই একশো পেরিয়েছে। এবার গ্যাসের দাম হাজার টাকা পেরোলো। ৮ মে ২০২২ কলকাতায় ১,০২৯ টাকা। কেন্দ্রের ভর্তুকি শূন্য দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সাধের 'উজ্জ্বলা যোজনা'র উজ্জ্বলাদের এখন গ্যাস কেনা সাধ্যের বাইরে। ৬ জুলাই পৌঁছল ১,০৭৯ টাকায়।
- **এক বনাম ১০ লক্ষ :** সুইৎজারল্যাণ্ডের দাভোসে ২০২২এর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের তরফ থেকে জানানো হয়েছে কোভিড অতিমারির সময় প্রতি ৩০ ঘণ্টায় একজন করে ব্যক্তি ধনকুবের হয়েছেন (১০০ কোটি বা বিলিয়ন ডলার বা ৭,৭০০ কোটি টাকার বেশি আয়), পাশাপাশি একই গতিতে অতিদরিদ্র হয়েছেন ১০ লক্ষ মানুষ। অক্সফ্যামের প্রস্তাব ১০ লক্ষ ও ১০০ কোটি ডলারের মালিকদের উপর যথাক্রমে বার্ষিক ২ শতাংশ ও ৫ শতাংশ সম্পদ কর চাপালে ২.৫২ লক্ষ কোটি টাকা সরকারগুলির আয় হবে যার মাধ্যমে ২৩০ কোটি মানুষকে দারিদ্রমুক্ত করা যাবে।
- **ইপিএফে সুদের হকিকৎ :** মোদি সরকার ইপিএফে সুদের হার কমিয়ে ৮.১% করল যা ১৯৭৭-'৭৮ এর ৮% সুদের পর ৪৪ বছরে সর্বনিম্ন এবং প্রবল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কালে অবসর নেওয়া কর্মচারীদের উদ্বেগের কারণ।
- **সোনার খোঁজ :** জি.এস.আই বিহারের মুঙ্গের ডিভিশনের জামুই জেলায় ভারতের বৃহত্তম স্বর্ণভাণ্ডারের হদিশ দিল। আশা করা হচ্ছে এখানে ২২.২৮ কোটি টন সোনা মজুত আছে। কারমাটিয়া, ঝাঝা ও সোনে অঞ্চলে এই সোনার খোঁজ পাওয়া গেছে।
- **যুদ্ধের কারণে আরো বেশি দারিদ্র :** অতিমারির ১৮ মাসে বিশ্বে নতুন করে দরিদ্র হয়েছিলেন ১২.৫ কোটি মানুষ। আর রাশিয়া—ইউক্রেনের তিন মাসে ৭.১ কোটি। বিশ্বে ৯% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে। দরিদ্র ও আর্থিকভাবে দুর্বল প্রায় ৫০০ কোটি (৭০% জনসংখ্যা)।

আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশের পদ্মা সেতু

রাকিবুল ইসলাম জয়

১৯৭১এ পাকিস্তানি খান সেনাদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের লড়াইয়ের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তারপর থেকে এই নবীন জনবহুল রাষ্ট্রকে অনেক চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছে। দেশের মধ্যে খুব রক্ষণশীলদের বিরোধিতা, বাম উগ্রপন্থী জাসদ দলের সশস্ত্র হামলা, জরুরি অবস্থা, মহামারি, দারিদ্র, সাইক্লোন, ১৯৭৪এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৭৫এ সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রেসিডেন্ট মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯১ অবধি অনেকগুলি সেনা

পদ্মা সেতু

অভ্যুত্থান পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মূলত জেনারেল জিয়াযুর রহমান ও মহম্মদ এরসাদের নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা থাকে। এই পর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মার্কিন-চীন-পাকিস্তানপন্থী রক্ষণশীল ও মৌলবাদীরা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে যায়। দেশজুড়ে তাদের মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে যায়। সাংবিধান বদলিয়ে ১৯৮৮তে বাংলাদেশকে ইসলামি দেশ ঘোষণা করা হয়।

এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের পর আন্তর্জাতিক নজরদারিতে অস্থায়ী তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনে খালেদা জিয়ার মধ্য-দক্ষিণপন্থী 'বিএনপি' দল ক্ষমতায় আসে ১৯৯১এ। ১৯৯৬এর নির্বাচনে শেখ হাসিনা ওয়াজেদের বাঙালি জাতীয়তাবাদী 'আওয়ামি লিগ' ক্ষমতায় আসে। এরপর ২০০১এ আবার খালেদা সরকার এসে ২০০৬ অবধি ক্ষমতায় থাকে। দু'বছর তদারকি সরকারের পর ২০০৯ থেকে বাংলাদেশে রয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকার। এর মধ্যে আমরা দেখেছি ব্লগারদের হত্যা, শাহবাগ আন্দোলন, রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা। অন্যদিকে এই পর্বে বাংলাদেশ অনেক পরিণত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক ও ভারসাম্য রেখে চলতে শিখেছে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছে এবং নানারকম উন্নয়নমূলক প্রকল্প কার্যকর করেছে। সামগ্রিক অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ তৈরি হয়েছে।

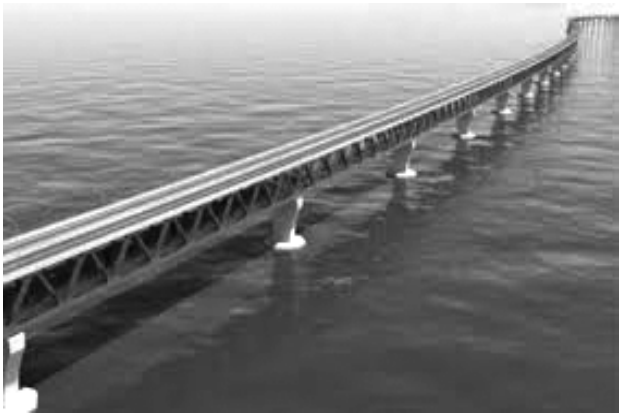

পদ্মা সেতু

এই নতুন পদ্মা সেতু বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে শুধু এগিয়ে দেয়নি, বিশ্বের দ্বিতীয় খরস্রোতাময় নদীর উপর নিজের শক্তিতে এরকম দীর্ঘ আধুনিক সেতু নির্মাণ করে বাংলাদেশ এক নতুন আত্মবিশ্বাসের শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রায় ৪০০ নদী এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে যার মধ্যে ১৩টি বৃহৎ। মেঘনা (২৬৪ কি.মি.), যমুনা (২০৫ কি.মি.), পদ্মা (১২০ কি.মি.), তিস্তা, মধুমতী, আরিয়াল খাঁ প্রমুখ। বড় নদীগুলির মধ্যে পদ্মার উপর রাজশাহীর ইশ্বরদি ও কুষ্টিয়ার ভেরামারার মধ্যে ছিল একমাত্র হার্ডিঞ্জ ব্রীজ। ১৯১০এ ব্রিটিশের তৈরি। পরে জাপান এর পাশে লালন সেতু নির্মাণ করে এবং মেঘনার উপরও সেতু তৈরি করে। এরপর চীনের সাহায্যে পাবনার সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের মধ্যে যমুনার উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মিত হয়। আর ২৫ জুন ২০২২

ঢাকার মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও ফরিদপুরের মাদারিপুরের শিবগঞ্জের মধ্যে উদ্বোধন হল পদ্মা সেতু। প্রথমে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এগিয়ে এলেও পরে বাংলাদেশকে নিজেকেই এটি নির্মাণ করতে হয়েছে। ৬,১৫০ মিটার দীর্ঘ, ১৮.১৮ মিটার চওড়া। ১২০ মি. উঁচু, ৪১ স্প্যানের চার লেনের এই দ্বিতল রোড-রেল ব্রিজ করতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশি টাকা। ব্রীজের নক্সাকার 'এ.ই.সি.ও.এম.' ও মূল ঠিকাদার 'চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন লিমিটেড। পদ্মা সেতু আজ বাংলাদেশের শ্লাঘা।

ইউক্রেনের ইতিকথা

গ্যাব্রিয়েল লোপেজ

মধ্যযুগে ইস্ট স্লোভাক, কিয়েভান রাস রাজতন্ত্র, কসাক হেমান্তে গুলি বর্তমান ইউক্রেন অঞ্চলকে শাসন করত। মোঙ্গল, তাতার, অটোমান তুর্করা বারবার আক্রমণ করে। রাশিয়ান জার অধিকার করে নেয়। অর্থডক্স চার্চ্চ প্রভাব বিস্তার করে।

১৯১৭-এ আধুনিক রাষ্ট্র ইউক্রোনিয়ান পিপলস রিপাবলিক গঠিত হয়। এরপর যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯২২-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন এর কর্তৃত্ব নেয়। হোয়াইট আর্মির বিরুদ্ধে ট্রটস্কির নেতৃত্বে রেড আর্মি সফল হয়। ইউক্রেনের নাম হয় ইউক্রেনিয়ান সোভিয়েত সোসালিস্ট রিপাবলিক। স্তালিনের সময় (১৯২২-১৯৫২) ইউরোপের শস্যাগার ইউক্রেনে বলপূর্বক রাষ্ট্রীয় বৃহৎ খামার তৈরি একদিকে বিপর্যয় আনলেও অতিউৎপাদন শুরু হয়। পাশাপাশি বলপূর্বক শিল্পায়ন শুরু হয়। এর মাধ্যমে শিল্পোন্নায়ন হলেও এই দুটি পদক্ষেপে বহু মানুষের উচ্ছেদ এবং দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রীয় পীড়নে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথমে নাৎসি জার্মানির ও পরে সোভিয়েত লালফৌজের আগ্রাসন, ধ্বংস ও বীভৎস অত্যাচারের সম্মুখীন হয় ইউক্রেন। তারপরেও পুনর্গঠিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ইউ.এস.এস.আর. এর প্রধান শস্যাগার, শিল্প ও খনিজ কেন্দ্র এবং প্রধান শক্তি উৎপাদন ও বন্দর সমূহ হয়ে ওঠে ইউক্রেন। পরবর্তী দুই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ক্রুশ্চেভ (সময়কাল ১৯৫৩-১৯৬৪) ও লিওনিদ ব্রেজনেভ (সময়কাল ১৯৬৪-১৯৮২) রুশ ইউক্রেনীয় সীমান্ত ও ইউক্রেনের মানুষ ছিলেন।

রাশিয়ান হানায় বিধ্বস্ত ইউক্রেন

কাপারথিয়ান ও ক্রিমিয়ান পর্বত এবং আজতভ ও কৃষ্ণ সাগর বেষ্টিত, নীপার দানিয়ুব প্রমুখ নদী বিধৌত ইউক্রেনে রয়েছে বিস্তৃত অরণ্য ও স্তেপ তৃণভূমি যা ইউরোপ তথা বিশ্বের, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের তো বটেই, অন্যতম শস্যাগার। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম, ভুট্টা, যব, রাই, বার্লি, ওট, সুগার বিট, সূর্যমুখী তেল উৎপন্ন হয়। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৫০ শতাংশ লৌহ আকরিক ও কয়লা উত্তোলিত হত। অন্যান্য খনিজ ছাড়াও রয়েছে ইউরেনিয়াম, লিথিয়ামের বড় ভাণ্ডার। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০ শতাংশ ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম এখানে উৎপন্ন হত। এখানে রয়েছে ট্রাক্টর, হার্ভেষ্টার কৃষি যন্ত্রপাতির, মেসিন থেকে আরম্ভ করে বিমান নির্মাণের যাবতীয় শিল্প। রয়েছে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ এবং পাঁচটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (চেরনোবিল, বিপর্যয়ের পর পরিত্যক্ত)। রয়েছে আজতভ ও কৃষ্ণ দুই উষ্ণসাগরকে ঘিরে সবঋতুতে কার্যকর ১৮টি নৌবন্দর যার মধ্যে ওদেসা, ইয়ালটা, সেভেস্তাপোল ও মারিউপোল অন্যতম। এইসব কারণেই ইউক্রেন রাশিয়ার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইউক্রেনের প্রতি মার্কিন-ব্রিটেনের এত আগ্রহ।

১৯৯১-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় অন্য অঙ্গ রাজ্যগুলির মত ইউক্রেন লিওনিভ ক্রাভচুকের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়ে যায়। কিন্তু ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলির টানাপোড়েন ও ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলতেই থাকে। পশ্চিমপন্থী ক্রাভচুক ও লিওনিদ কুলচার শাসনকালের পর ২০০৪-এ রুশপন্থী ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর শুরু হয় 'কমলা বিপ্লব' ও 'ইউরোমেইডেন আন্দোলন' এবং তাকে সরিয়ে পশ্চিম দুনিয়ার পছন্দের ভিক্টর ইয়ুশচেঙ্কো প্রেসিডেন্ট হন। তখন থেকে ইউক্রেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা শুরু করেন ইয়ুশচেঙ্কো। রাশিয়া বাধা দেয়। ২০১০এর রুশপন্থী ইয়ানুকোভিচ আবার প্রেসিডেন্ট হন। ২০১৪-এ আবার বিক্ষোভ। ইয়ানুকোভিচের অপসারণ ও পশ্চিমপন্থী পেট্রো পেরোশোঙ্কোর আগমন। একদিকে তার নেতৃত্বে ইউক্রেনিয়ান আর্মির পুনর্গঠন ও ইউক্রেনের কমনওয়েলথে যোগদান, অন্যদিকে পুবে রুশ সীমান্ত ডনবাসে রুশপন্থীদের সঙ্গে ইউক্রেনিয় আর্মির সংঘর্ষের শুরু এবং রুশভাষী প্রধান ক্রাইমিয়াতে গণভোট ঘটিয়ে রাশিয়ার ক্রাইমিয়া দখল। এরপর একদা কৌতুক অভিনেতা ভ্লাদিমির জেলেনস্কির ২০১৯ এ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হয়ে ন্যাটোয় অন্তর্ভুক্তির জোরালো আর্জি এবং মার্কিন-ব্রিটেনের সাহায্যে সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন। অন্যদিকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির

পুতিনের চাপ। ২০২১ ইউক্রেন সীমান্তে, বেলোরাশিয়ায় রুশ সেনা এবং কৃষ্ণসাগরে রুশ রণতরীর সমাবেশ। পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সেনা ও যুদ্ধবিমান পাঠানো। ২০২২এর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব ইউক্রেনের রুশপন্থী এলাকা লুহানস্ক ডোনেৎসক্‌কে রাশিয়ার স্বাধীন দেশ ঘোষণা এবং সরাসরি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান। যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু, হাহাকার, দূষণ এবং অভিবাসন। চলছে তো চলছে।

শ্রীলঙ্কায় লঙ্কা কাণ্ড

অরণি সেন

১৯৭১	:	ট্রটস্কিপন্থী 'জেভিপি'-র সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন।
১৯৮৩-২০০৯	:	'এল.টি.টি.ই.'-র সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী ও ব্যয়বহুল গৃহযুদ্ধ। 'এল.টি.টি.ই.' নির্মূল।
২০১৭	:	চিনকে হাম্বানতোতা প্রদান, উচ্ছেদ ও বিক্ষোভ।
২০১৯	:	জেহাদি আত্মঘাতী হামলা চার্চ ও হোটেলে। ব্যাপক কর মকুব, ফলে প্রবল রাজস্ব ঘাটতি।
২০২০	:	করোনা অতিমারি ও পর্যটন শিল্পে ধ্বস।
২০২১	:	সার আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা। দেশীয় সার নির্ভর কৃষিতে উৎপাদনের বিপুল হ্রাস। খাদ্য সঙ্কট, পারিবারিক পুঁজিতন্ত্রের বাড়াবাড়ি (Crony Capitalism)। বিদেশে সম্পদ পাচার।
২০২২	:	মুদ্রাস্ফীতি ৩৯%, খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি ৫৭%, ঋণ ৫১০০ কোটি ডলার, বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় পাঁচ কোটি ডলার। পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ, খাদ্যপণ্যের চরম সঙ্কট। অশান্তি, বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা। গোতাবায়া, মাহিন্দা ও বাসিল, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী রাজাপক্ষে ভ্রাতৃত্রয়ের ইস্তফা ও পলায়ন। জরুরি অবস্থা,...

উত্তাল শ্রীলঙ্কা

অথচ শ্রীলঙ্কা দশকের পর দশক দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়নের নিরিখে তুলনামূলক অগ্রণী রাষ্ট্র ছিল। ২০১৯এও তার পার ক্যাপিটা 'গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট' (জি.এন.পি.) ছিল ১২,৭০৭ ডলার এবং 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সে (এইচ.ডি.আই.) ১৮৯টি সদস্য দেশের মধ্যে তার স্থান ছিল ৭২ (০.৭৮২) যেখানে অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির স্থান ছিল—মালয়েশিয়া (৬২), তাইল্যাণ্ড (৭৯), ইন্দোনেশিয়া (১০৭), ভুটান (১২৯), ভারত (১৩১), বাংলাদেশ (১৩৩), নেপাল (১৪২), মায়ানমার (১৪৭) ও পাকিস্তান (১৫৪)।

শিনজো আবের মৃত্যু

রক্তিম ভাদুড়ি

শিনজো আবে (১৯৫৪-২০২২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাপানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক, কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী এবং দু-দু বারের আলসারেটিভ কোলাটিস রোগের কারণে প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিলেও সবচাইতে দীর্ঘ সময়ের প্রধানমন্ত্রী (২০০৬-২০০৭ ও ২০১২-২০২০)। জাপানের প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম। পিতা শিনতারো কোবে জাপানের বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। পিতামহ কান আবে সাংসদ ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন। দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পর শিনজো আবে রক্ষণশীল 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি'তে (এল.ডি.পি.) যোগ দেন, সাংসদ হন, ক্যাবিনেট সচিব হন, এল.ডি.পি. প্রেসিডেন্ট হন এবং চারবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হন।

শিনজো আবে চারবার ভারত সফর করেন এবং তাঁর সময়ে জাপান-ভারত সম্পর্ক কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃঢ় হয়। তিনি কলকাতাতেও এসেছিলেন ও নেতাজী ভবন পরিদর্শন করেন। ভারতবন্ধু হিসাবে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। তাঁর সময়কালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন (আবেমিক্স); ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের আধিপত্য বিস্তারের নিরিখে সংবিধান পরিবর্তন, প্রতিরক্ষা বরাদ্দ বৃদ্ধি ও চতুর্দেশীয় 'কোয়াড' গঠন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের অপরাধ অস্বীকার প্রভৃতি পদক্ষেপ যেমন বিপুল জনসমর্থন অর্জন করে, অন্যদিকে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। দলীয় প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারকালীন ঘাতকের হাতে নিহত হন। নির্বাচনে তাঁর দল 'ন্যাশনাল ডায়েটে' সর্বাধিক আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। ফুমিও কিশিদা পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

গল্প

মহারাজার অসুখ

মূলরচনা (হিন্দি) যশপাল

বাংলা রূপান্তর : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

উত্তরপ্রদেশের দেশীয় করদ রাজ্য ও জমিদারিগুলির মধ্যে 'মোহনা' রাজ্যটির সে সময় বেশ নামডাক ছিল। রাজ্যের নামডাকের পাশাপাশি সেখানকার মহারাজা সাহেবের অসুস্থতার চর্চাও তখন খুব হতো।

আদালতের বার কাউন্সিলে, ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে এমনকি লখনৌএর গর্ভমেন্ট হৌসেও মহারাজার অসুখ নিয়ে খুব আলোচনা হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সরকারের যুদ্ধ ফাণ্ডে চাঁদা সংগ্রহের জন্য মোহনার মহারাজার কাছে গর্ভমেন্টের তরফ থেকে একটি চিঠি এসেছিল। মহারাজার সেক্রেটারি সে সময় সরকারের ফাণ্ডে নগদ ২৫,০০০ টাকা চাঁদা পাঠিয়েছিলেন সাথে মহারাজা স্বাক্ষরিত একটি চিঠিও দেওয়া হয়েছিল তাতে লেখা হয়েছিল যে অসুস্থতার কারণে ইচ্ছা থাকলেও তিনি সরকার বাহাদুরকে উচিত সহায়তা করতে পারলেন না, এজন্য তিনি মর্মান্তিক দুঃখিত।

প্রত্যুত্তরে গর্ভনরের সেক্রেটারীও আর্থিক সহায়তা করার জন্য মহারাজাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তার অসুস্থতার প্রতি অত্যন্ত চিন্তা, সহানুভূতি ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একটি রাজকীয় পত্র প্রেরণ করেছিল যেটি বর্তমানে একটি সুদৃশ্য কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দরবার হলে সকলের দেখার জন্য রাখা আছে। একই ভাবে মহারাজার অসুস্থতায় উদ্বিগ্ন হয়ে মহারাজাকে লেখা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের লেখা দু'খানি পোস্টকার্ড সকলের দেখার জন্য দরবার কক্ষে যত্ন-সহকারে রাখা আছে।

মহারাজার অসুখ সাধারণ মানুষের রোগা-ভোগা মামুলি কোনও অসুখ ছিল না। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় মস্ত খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা তাদের চিকিৎসায় মহারাজাকে সুস্থ করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাতে লোকেদের মনে এরকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে এরকম কোনও অসুখ আগে কখনো ছিল না। তাছাড়া এমন মস্ত অসুখ সাধারণ মানুষ সহ্য করবেই বা কি করে?

গরমের সময় মহারাজা প্রতিবছর মুসৌরিতে এস্টেটের প্রাসাদে গিয়ে থাকতেন। সে প্রাসাদের নিজস্ব রিক্সাবাহন ছিল। রিক্সা টানার জন্য যে কুলিরা ছিল তাদের নীল উর্দিতে মোহনা এস্টেটের রাজকীয় প্রতীক পিতলের পাতের উপর ঝকমক করতো। রিক্সা টানার চারজন কুলির পিছন পিছন মাঝপথে তাদের বদল করার জন্য অন্য চারজন কুলিও দৌড়াতে থাকতো। তাদের পিছনে মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ঘোড়ায় চড়ে তাদের অনুসরণ করতো। পাছে রাস্তাতেই মহারাজের চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন পড়ে।

সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এমনটাই চল তো। মহারাজা এরপর পাহাড় থেকে নেমে নিজ রাজ্যের রাজধানীতে গিয়ে থাকতেন। তার ঠিক আগে মুসৌরিতে চিকিৎসকদের মেলা লেগে যেত। সে সময় মুসৌরিতে সমস্ত বড় বড় হোটেলের স্যুট কামরা মোহনা এস্টেটের তরফ থেকে সংরক্ষিত করা হতো। দেশ-বিদেশ থেকে আগত বিখ্যাত ডাক্তার চিকিৎসকদের রাখার জন্য। শুধু হোটেল কেন ভাল ভাল সমস্ত যান-বাহনও তাদের যাতায়াতেক জন্য নিয়ে নেওয়া হতো। অবস্থা এমন হতো যে এস্টেটের বাইরের কেউ তখন মুসৌরিতে থাকার জন্য না পেতো জায়গা, না চলাফেরার যানবাহন। সকলে জেনে যেত মহারাজের চিকিৎসার জন্য সব খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা মুসৌরিতে এসে রয়েছেন।

যশপাল

প্রতিবছর এই চিকিৎসকদের প্রভূত অর্থব্যয় করে মুসৌরিতে আনা হতো। তারা বারবার মহারাজার শরীর পরীক্ষা করে উপযুক্ত চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিতেন। তবে সেটাও খুব সহজে হতো না। আগত চিকিৎসকেরা সকলে মিলে একটা সম্মেলনে অংশ নিতেন। তারপর তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মেডিকেল বুলেটিন রূপে প্রকাশ পেতো। এরপর তারা তাদের ফিস, যাতায়াতের খরচ ও মহারাজার দেওয়া রাজকীয় আতিথ্য, উপহার গ্রহণ করে নিজ নিজ স্থানে ফিরে যেত। কিন্তু মহারাজার অসুস্থতা কমার কোন লক্ষণ দেখা যেতনা বরং প্রতিবছর তা যেন আরও বেড়ে যাচ্ছিল। সেই বুকে ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, হাঁটু আটকে যাওয়ার সমস্যা মহারাজকে ভোগ করে যেতে হচ্ছিল। এরকমটাই চলছিল বিগত ন'বছর যাবৎ।

সে বছর বোম্বাই মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ কোরালের কাছেও মোহনার মহারাজার চিকিৎসা করতে মুসৌরি যাওয়ার জন্য এস্টেট থেকে নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছল। তিন বছর আগেও একবার তার কাছে এমন নিমন্ত্রণপত্র এসেছিল। সে নিমন্ত্রণ স্বীকার করে তিনি মুসৌরি পৌঁছে রাজাকে পরীক্ষা করে তার অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য নিজের মতামত ব্যক্ত করে ফিস এবং রাজ আতিথ্য ভরপুর উপভোগ করে আনন্দের সাথে বোম্বাই ফিরে এসেছিলেন। এবছর নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন কিন্তু সরকার তাকে আমেরিকা সফরকারী চিকিৎসকদের শিষ্টমণ্ডলে মনোনিত করেছে। এবং এই শিষ্ট মণ্ডল মহারাজার নিমন্ত্রণ তিথির পূর্বেই বোম্বাই থেকে রওনা দেবে। তাই এবছর তার মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠলো না।

প্রায় একবছর আগে ডঃ সংঘটিয়া বেশ কয়েকবছর ভিয়েনায় চিকিৎসা সম্পর্কীয় গবেষণা করে দেশে ফিরে বোম্বাই মেডিকেল কলেজে যোগ দিয়েছেন। ডঃ সংঘটিয়া বেশ কিছু অসুখের চিকিৎসায় উপযুক্ত ওষুধপত্রের সাথে 'সাইকোসোমাটিক' (মানসিক প্রভাব) পদ্ধতির প্রয়োগ করেতেন এবং চিকিৎসায় তার সুফলও পেয়েছিলেন। ভিয়েনায় তার গবেষণা এই বিষয়েই ছিল।

ডঃ কোরাল মোহনার মহারাজের পত্রের উত্তরে নিজের নিমন্ত্রণ রক্ষায় অপারগতার কথা উল্লেখ করে ডঃ সংঘটিয়া ও তার নতুন গবেষণালব্ধ পদ্ধতি মহারাজের চিকিৎসায় ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

মুসৌরিতে ডঃ কোরালের পত্র পৌঁছালে এস্টেটের পক্ষ থেকে অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে ডঃ সংঘটিয়ার নামে নিমন্ত্রণ পত্র বোম্বাই পাঠানো হয়।

ডঃ সংঘটিয়া সঠিক সময়ে মুসৌরি পৌঁছালে তাকে এস্টেটের পক্ষ থেকে স্বাগত-সৎকার করে সেখানকার একটি বড় হোটেলে তাকে রাখা হয়। পরের দিন সকালে এস্টেট থেকে ঘোড়ায় চড়ে এক রাজকর্মচারী তাকে রিক্সা করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসে। ডঃ সংঘটিয়া যখন প্রাসাদে পৌঁছান তখন দেখেন সেখানে আমেরিকা থেকে আগত এক চিকিৎসক ও আর একজন ভারতীয় চিকিৎসক মহারাজার শরীর পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মহারাজার সেক্রেটারি ডঃ সংঘটিয়ার কাছে এসে অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে জানান যে তিনি যদি ঐ দুজন ডাক্তারের পরীক্ষা করা অবধি অপেক্ষা করেন তাহলে তিনি খুবই বাধিত হবেন। ততক্ষণ যদি ডঃ সংঘটিয়া কিছু পানীয় সেবন করেন।

সময়মতো ডঃ সংঘটিয়া মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে রোগীর শরীরের নানারকম পরীক্ষা করেন। গতবছর প্রকাশিত মেডিকেল বুলেটিন অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়লেন।

এইভাবে দু'দিন পার হওয়ার পর তৃতীয়দিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চিকিৎসকেরা বারবার মহরাজার শরীর ও রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। প্রত্যেক চিকিৎসককে মহারাজার শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি, এক্সরে পরীক্ষা ও তার রিপোর্ট একটি সুদৃশ্য অ্যালাবামে ভরে হাতে দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের পক্ষে সঠিকভাবে রোগটিকে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

ঐ দিন বিকেলে প্রাসাদের মস্ত হলঘরে ডাক্তারদের এক সভার আয়োজন করা হয়। সে বছর আগত বত্রিশজন চিকিৎসকের জন্য বত্রিশটি টেবিল চেয়ার সুন্দরভাবে ডিম্বাকারে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি টেবিলের ওপর চিকিৎসকের নাম, ডিগ্রি ও অন্যান্য উপাধি উল্লেখিত বোর্ড লাগানো হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি টেবিলে একটি অত্যন্ত দামী ফাউন্টেন পেন, পেনসিল সেট একটি সুদৃশ্য বক্সে ভরে রাখা আছে। বাক্সের ওপর সোনার জল দিয়ে লেখা আছে 'মোহনা মহারাজের তরফে উপহার'। চিকিৎসকদের বসার ব্যবস্থা তাদের নামের প্রথম অক্ষর ধরে ইংরাজী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে করা হয়েছে।

হলঘরে চিকিৎসকদের জন্য চা-কফি, হুইস্কি-জিন, ফলের রস, হালকা আহারের ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন পরস্পরের সাথে মত বিনিময় করে মহারাজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিজের নিজের মন্তব্য লেখেন। তারপর মহারাজা নিজে সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত শুনবেন।

চিকিৎসকেরা প্রায় এক ঘণ্টা পানীয় ও আহারের সদ্ব্যবহার করতে করতে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে মতামত লিখতে লাগলেন।

ঠিক সাড়ে চারটের সময় একটি অত্যন্ত সুসজ্জিত চাকা লাগানো আরামকেদারায় মহারাজকে হল ঘরে নিয়ে আসা হলো। মহারাজার মুখমণ্ডলে এই দূরারোগ্য ব্যাধিজনিত কোনও ক্লেশ বা চিন্তার ছাপ ছিল না। বরং এমন অসাধারণ একটা রাজরোগ তিনি যে অসম্ভব দৃঢ়তায় বহন করে চলেছেন তার জন্য তার চেহারায় একটা গর্ববোধ ও গাম্ভীর্য ফুটে উঠছিল।

মহারাজার দুদিকে সার দেওয়া টেবিল থেকে এক একজন চিকিৎসক বলতে শুরু করলেন। প্রথমে তার ডানদিকের চিকিৎসকেরা বলা শুরু করলেন।

দুজন চিকিৎসক আমেরিকায় মহারাজকে ইলেকট্রিক থেরাপি নেবার পরামর্শ দিলেন। আর একজন মহারাজাকে জর্ডনের ডেড সি'র জলে নেমে কিছুদিন সাঁতার কাটার কথা বললেন। সোভিয়েত ঘুরে আসা এক বিশেষজ্ঞ মহারাজকে রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত সোচি শহরে মাতস্তেতা নদীর মূল্যবান খনিজ জলকে চিকিৎসার কাজে লাগাতে বললেন।

মহারাজা অত্যন্ত গম্ভীর মুদ্রায় চিকিৎসকদের মতামত ও সিদ্ধান্ত শুনে যাচ্ছিলেন। এরপর ২৭ নম্বরে থাকা ডঃ সংঘটিয়ার সময় এলো মতামত জানানোর জন্য। ডঃ সংঘটিয়া নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন—

''মহারাজার শরীরে অসুখের লক্ষণ ও এতদিন ধরে চলে আসা চিকিৎসার গতি-প্রকৃতি লক্ষ করে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি মহারাজার এই অসুখ কোনো মামুলি অসুখ নয়। এবং সাধারণ চিকিৎসায় তা সারিয়ে তোলা অসম্ভব।''

মহারাজা এই যুবা চিকিৎসকের বিজ্ঞতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আত্মতৃপ্তির সাথে তার বাকি মতামত শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ডঃ সংঘটিয়া আবার বলতে শুরু করলেন—এমন এক রোগ এবং রোগীর অভিজ্ঞতা আমার এর আগে হয়েছে। কয়েকবছর ধরে একইরকম মাথায় যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা এবং হাঁটু আটকে যাওয়ার দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে এক মেথর বোম্বাই মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য আসতো। তার...

''চুপ...বদতমিজ!''—এক হুঙ্কারে ডঃ সংঘটিয়ার কথা বন্ধ হয় গেল। হলঘরে তখন পিন— পতন নিস্তব্ধতা। সকলে অবাক হয়ে দেখল, যে মহারাজা দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে হাঁটাচলা করতে পারতেন না, তিনি ঐ হুঙ্কার দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজেই চাকা লাগানো আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

''বার করে দাও এই বজ্জাতটাকে। মোহনার মহারাজার সাথে

হারামজাদা একটা মেথরের তুলনা করছে।... এখুনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঐ বদতমিজ ডাক্তারটাকে বার করে দাও এস্টেটের চৌহদ্দি থেকে।" বলে প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে লাগলেন মহারাজ। আরো কিছু হয়তো বলতেন কিন্তু প্রচণ্ড রাগে তিনি ঠিকমতো কথা বলতে পারলেন না।

তারপর সেবকরা তার কাছে আসার আগেই তিনি চাকা দেওয়া আরাম কেদারা ছাড়াই টলমলো পায়ে হল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

যদিও চিকিৎসকদের নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, ও মহারাজার কাছ থেকে অধিক খাতিরদারি পাবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা ছিল তাও স্বপেশায় নিযুক্ত একজন যুবা চিকিৎসকের প্রতি এহেন অপমান তাদের কিছুটা অপ্রতিভ করে তুললো। কিভাবে তারা ডঃ সংঘটিয়াকে সান্ত্বনা দেবেন তাই ভাবছিলেন।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডঃ সংঘটিয়া হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর একগ্লাস ফলের রস একচুমুকে শেষ করে দিয়ে বলে উঠলেন—তাহলে মহারাজার এতদিনের অসুখের সত্যি সত্যি উপশম হলো।

লেখক পরিচিতি

যশপাল : জন্ম : ৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩; মৃত্যু : ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৬। সম্মান : পদ্মভূষণ ১৯৭০, সাহিত্য অ্যাকাডেমি ১৯৭৬।

হিন্দি সাহিত্যে মুন্সি প্রেমচাঁদ পরবর্তী পর্বে যে সকল যথার্থবাদী, প্রগতিশীল সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন এক সশস্ত্র বিপ্লবী। দেশভাগের যন্ত্রণা, অন্ধ ধার্মিকতা, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী মুখ। এই কারণে দীর্ঘসময় তাঁকে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু তাঁর কলম কখনোই থেমে থাকেনি। সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, মানুষের তিনি ছিলেন আপনজন। তাঁর লেখনিতে তিনি সর্বদাই সমাজটাকে বদলাতে চাইতেন। আমরা আমাদের পত্রিকায় তাঁর লেখা ছোটগল্প মাঝে মাঝেই বাংলা রূপান্তর প্রকাশে আগ্রহী। 'মহারাজার অসুখ' গল্পটি 'রাজকমল' প্রকাশনের—যশপাল 'প্রতিনিধি কাহানিয়া'তে প্রকাশিত 'মহারাজা কা ইলাজ' গল্পের বাংলা রূপান্তর। এই প্রয়াসের জন্য আমরা একই সাথে যশপালজির পরিবার ও রাজকমল প্রকাশনের কাছে ঋণী।

টোকিও ২০২০ (২০২১) ওলিম্পিকে ভারত (২০৬ দেশের মধ্যে)

ক্রম	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৯	৪১	৩৩	১১৩
২	চিন	৩৮	৩২	১৮	৮৮
৩	জাপান	২৭	১৪	১৭	৫৮
৪	গ্রেট ব্রিটেন	২২	২৫	২২	৬৫
৫	রাশিয়া	২০	২৮	২৩	৭১
.....					
৪৮	ভারত	০১	০২	০৪	৭

চিন ও জাপান বাদে এশিয়ার দেশ হিসাবে ভারতের আগে দঃকোরিয়া (ক্রম ১৬) ইরান (২৭), উজবেকিস্তান (৩২), তাইওয়ান (৩৪), তুরস্ক (৩৫), ইজরায়েল (৪০) ও কাতার (৪১)।

ত্রিপুরার পুরভোট ২০২১

মোট পুরসভা	১৩	বিজেপির ভোট	৫৯.০১%
বিজেপির জয়	১৩	তৃণমূলের ভোট	১৯.৬৫%
মোট ওয়ার্ড	৩৩৪	বামফ্রন্টের ভোট	১৬.৩৯%
বিজেপির জয়	৩২৯	কংগ্রেসের ভোট	২.০৭%
সিপিএমের জয়	৩	আগরতলায় বিজেপি	৫৭.৪০%
তৃণমূলের জয়	১	আগরতলায় তৃণমূল	২০.১৩%
তিপ্রা মথার জয়	১	আগরতলায় বামফ্রন্ট	১৭.৯০%
কংগ্রেস কোন আসন পায়নি		আগরতলায় কংগ্রেস	১.৮০%

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচন '২২ : বিজেপি ৩, কংগ্রেস ১

কবিতা

এক জোড়া মিষ্টি জলের মাছ

আব্বাস কিয়ারোস্তামি

A pair of trout
lying side by side
on the white bed of a
serving dish.
এক জোড়া মিষ্টি জলের মাছ
পাশাপাশি শুয়ে আছে
একটা থালার দুধসাদা বিছানায়...

This road
Has been abandoned For many
years Though the wild flowers
Do not seem to know
এই পথ
বহুদিন হোলো বাতিল হয়েছে তবুও
বুনোফুল
তা জানে না

I am being pursued
by a shadow that was my
playmate
in childhood
it grew up with me, it grew old with me,
it will continue to pursue me
to the grave.
আমি অনুবর্তী হয়েছি
একটা ছায়ার দ্বারা যে আমার খেলার সঙ্গী হয়েছিল
ছেলেবেলায়
আমি ওর সঙ্গে বড় হয়েছি, সেও আমার সঙ্গে বুড়ো হয়েছে,
এখনও সে আমাকে নিয়ে চলে কবরে...

ভাষান্তর : অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত

সংকর সময়

সুধীর চন্দ্র সরকার

নখ দিয়ে খুঁটে নেয় সুখ
ফেলে দেয় আবর্জনার স্তূপে
জন্ম নেয় অবাঞ্ছিত সন্তান
ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা
থালা, বাটি, গ্লাসের ভিড়ে।
নাগরিক সভ্যতার কোল ঘেঁষে
বিষাক্ত বাতাস চেটে জন্ম নেয়
পরগাছার জঞ্জাল।
জোনাকীর আলো জ্বলে
চটে ঘেরা খড়ের চালায়।
হাল ফ্যাশানের ফ্ল্যাটে
পাশ্চাত্য গানের সুর
ঢেউ জাগায় শিরায় শিরায়
কার্নিশের গায়ে ঝুলে থাকে
কামুক চুম্বনের রুমাল।

বাবাকে নিয়ে স্বীকারোক্তি

নরেশ দাস

একটি দিনও আমি তাঁর জন্মদিন পালন করিনি!
কারণ আমি তাঁর জন্মদিন জানি না।
একটি দিনও আমি তাঁর ছবিতে মাল্যদান করিনি।
আমার হৃদয় ছাড়া ত্রিভুবনের কোথাও তাঁর অবয়ব নেই।
তাঁর ধুলোমাখা চরণেই আমার মাথা।
মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায়—
বটবৃক্ষের শীতলতা,
শৈশবের কামরাঙা রং,
আজও অমলিন তাঁর দৃষ্টিবিহ্বল চোখ,
নীরব চেয়ে থাকা।
তাঁর হাত ধরে আজও বীরের মতো হাঁটি,
তোমার সাথে হাসি, আকাশে ভাসি।
ঘুম তো আসবেই একদিন;
তার আগে প্রতিদিন আমরা যেন তাঁর
সুযোগ্য উত্তরসূরি হই।

পরিবেশ

পলাশ গঙ্গোপাধ্যায়

কার সাথে মাখামাখি, কাকে বা পাচ্ছি ভয়
তাকে মিত্র করি, শত্রু করি তাকে
আশঙ্কার জ্যামে রাখি মন, মাথাকে

মৃত্যুও একদিন সংবাদ হয়.

দরজাটা খোলা থাক

মাহমুদুল হাসান মাসুম

জানালার নৈকট্য ছেড়ে
চন্দ্রাহত আকাশ সরে গেছে বহুদূরে
মেঘবতী ধর্ষিতা হয়ে আদালত চত্বরে ঘুরে-ফিরে
বৃষ্টি ছিটেফোঁটা নেই রাষ্ট্রের পাঁজরে

জানালাটা দীর্ঘদিন খোলা রয়েছে
ধর্ষিতার আর্ত-চিৎকার মানুষের গোঁঙানি
নরম জোছনা পেরিয়ে—সূর্যের চোখ রাঙানি
প্রতিনিয়ত ঢুকে পড়ছে আমাদের ঘরে।

সার্বভৌম দরজাটা এখন খুলে রাখার সময়
দরজাটা খোলা থাক—খোলা থাক পায়ের শেকল
বেরিয়ে যাক পায়ের দাবানল—অনিয়মের অভিমুখে
মাড়িয়ে যাক যাবতীয় অনুধাবনযোগ্য দুর্বৃত্তায়ন।

যেসব পা দরজা পেরিয়ে যাচ্ছে
তাদের কথা ইতিহাসের এফিটাফে লেখা রবে—
যারা প্রতিবাদের প্রতিরোধ করছে বা করবে
তারা ফ্যাসিস্ট হিসেবে ছিন্ন ইতিহাসে চিহ্নিত হবে।

সার্বভৌম দরজাটা খোলা থাক।

পথ

বিপুল আচার্য

আমার মতো করে সাজিয়ে রাখি
আলো ছায়া কিংবা দিগন্তল রেখা—
কাকের কর্কশ ভাষা ম্লান করে দেয় কুসুমাক্ত
ধুলোবালির নোলকপথ।

ছেলেবেলার ডুব সাঁতার স্নেহস্পর্শে বেড়ে ওঠে
হাসিকান্নার আলো ছায়া বেয়ে—
কোন আকার নেই, কোন সঞ্চার নেই, শুধু
জন্মান্তর আঁকা থাকে শ্বাসে-প্রশ্বাসে
বেঁচে থাকার পথ ধরে।

বাঙলা বন্দ

ইবনে সিরাজ

এপার বাঙলা ওপার বাঙলা
মদ্যিখানে কাঁটা
এপার থেকে ওপারে যাবে
কার সে বুকের পাটা।

ঘটি-বাঙাল একই ঘরে
সাতপুরুষে বসত করে
পাশাপাশি দুই কুঠুরি
দরজা কুলুপ আঁটা।
এপার বাঙলা ওপার বাঙলা
মদ্যিখানে কাঁটা।

নিজস্ব সংবাদদাতা

মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া

সমস্ত আক্ষেপ জুড়ে ভয়ার্ত মুখ
ফেটে পড়া বুদবুদে কী এক হাওয়ার অসুখ
মৃত্যু খুব বিনিময় হয় এই গ্রহে
ঝকঝকে ব্রেকিং নিউজে
মৃতদেহগুলি সরু হয়ে মিশে যাচ্ছে ধোঁয়ার
উপত্যকায়
হেডলাইন সরাসরি তাক করে চোখ
এই যেমন গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে
আসে কলাম
ভারী বুটের মার্চে দৌড়ে যাওয়া রাস্তা দ্যাখে
শেষবারের মতো কেঁপে ওঠে রাত
জোরালো ফোকাসে তুলে আনা মুহূর্ত বিড়বিড় করে
সত্যি হয় যদি সত্যি হয় যদি... যুদ্ধের নিথর
চোখ!
ইনসেটে কান্না ও শোক... রক্তের ছিটে
ভাঙা খেলনার মতো ছড়ানো অস্ত্রর মাথা
নিয়ে
মরে গেছে যুদ্ধের শরীর
নিজস্ব সংবাদদাতা জানাবেন
বাচ্চাদের ইস্কুলবাড়ির মতো
রোদ এল পৃথিবীর পিঠে...

[কৃতজ্ঞতা: সরোজ দেব, মৃণাল চক্রবর্তী, রাহুল বাগচী, অসীম শর্মা]

ভ্রমণ

ঈশ্বরের বানপ্রস্থে

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করে তৃতীয় প্রহরে পড়েছে। অমানিশার রাত্রি। প্রায়ন্ধকার একটি কক্ষে এক প্রায়বৃদ্ধের চোখে তখন সবে মাত্র ঘুম আসছে। আজকাল বড় একটা ঘুম তাঁর হয় না। তবু আজ প্রকৃতি তাঁর দু'চোখের পাতায় আলতো ছোঁয়ায় ঘুমের পরশ মাখিয়ে দিচ্ছে। তিনি খুব বিশ্বাস করেন এখানকার মানুষদের। এরা বড় সরল। মিছা কথা বলে না। রোদে পোড়া, জলে ভেজা মাটি লাগা মানুষগুলোও তাঁকে খুব বিশ্বাস করে। তাই তিনি দরজা আটকে ঘুমান না। কে জানে রাত-বিরেতে কখন কার তাকে দরকার পড়ে। হঠাৎ দরজায় খুট করে একটা শব্দ। নিভু নিভু প্রদীপের আলোয় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল এক ছায়ামূর্তি। তার দিকে তাকিয়ে অকুতোভয় প্রায়বৃদ্ধ বললেন—'কে রে? সামনে আয়।' ছায়ামূর্তি ভিতরে ঢুকে তার পা জড়িয়ে কেঁদে উঠল। বলল 'বাবাঠাকুর হামার বহুত বিপদ, হাম্‌কে বাঁচা বাবু। হাম্‌কে বাঁচা। হামি সাঁওতাল, ছোটজাত। হামার বৌ-টা দমে উছাল (বমি) করছে। কলেরা হইছে গো। হামি ছোটজাত বলি করি কেউ হামার ঘরে যাচ্ছে নাই। কেউ পাশে ঘেঁষছে নাই। বৌ-টা হামার মইরে যাবেক ঠাকুর। তুই ছাড়া হামাদের কেউ নাই বাবাঠাকুর, কেউ নাই।' —একদমে কথাগুলো বলে সে আবার হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

বিদ্যাসাগর স্টেশন

ধড়মড় করে উঠে বসলেন সেই প্রায়বৃদ্ধ। তারপর লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে তার হাতে দিয়ে বললেন 'চ, পথোটা দেখিয়ে ঘরপানে নিয়ে চ।' পথের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁঝি আর কোলা ব্যাঙের কটকটানি। ঝোপঝাড় থেকে শেয়াল উঁকি মারছে। মাঠের আলপথ ধরে হেঁটে চলেছে দুটি ছায়ামূর্তি। সামনের জনের হাতে একটা ভুসোওঠা লণ্ঠন আর পিছনের জনের হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। ঘরে পৌঁছে তিনি দেখেন বউটির সারা শরীর বমিতে মাখামাখি। দুর্গন্ধে টেকা দায়। তাকে পরিষ্কার করে সারারাত ধরে চলল যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে ভোর রাতে হার মানল যম। ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠতে থাকল বউটি। প্রায়বৃদ্ধ বউটির মরদকে সব ওষুধপত্র বুঝিয়ে এবার ফেরার পথ ধরবেন। মরদটি তার পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারা অনেক মানুষ দেখেছে। চাবুক হাতে লালমুখো সাহেব দেখেছে, অত্যাচারী জমিদার দেখেছে, নাক সিঁটকানো বাঙালিবাবু দেখেছে, বিহারী বাহুবলী দেখেছে। কিন্তু এমন মানুষ দেখেনি। যে তাদের দুখে কাঁদে তাদের সুখে হাসে। সব দুখের কথা যাকে বলে সুখ পাওয়া যায়। মরদ তার পা ধরে শুয়ে থাকে আর বলে 'তুই কে বটে বল, মানুষ না দেওতা?

দুহাতে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে ফেরার পথ ধরেন সেই প্রায়বৃদ্ধ। আকাশে তখন নতুন দিনের সূর্য উঠছে। না শালপ্রাংশু মহাভুজা তিনি নন এবং নিতান্তই ধুতি-আর উড়নি পরিহিত শীর্ণ চেহারার খর্বকায় এক সাধারণ মানুষ তিনি। কিন্তু প্রভাতী সূর্যের আলোয় তাঁর ছায়া এতটাই দীর্ঘ হয়ে চলেছে যে গোটা মাঠ ছাড়িয়ে বুঝিবা দেশটাকেই অতিক্রম করে যায়। আর তাঁর কপালে পতিত নতুন দিনের আলো প্রতিফলিত হয়ে ট্রেনের জানলা দিয়ে ঢুকে চোখে পড়তেই আমার ঘুমটা গেল ভেঙে। জানলা দিয়ে দেখি মোকামাঘাট প্যাসেঞ্জার গতি কমিয়ে স্টেশনে ঢুকছে। আরে এখানেই তো নামতে হবে আমাদের। সেদিনের সেই 'কারমাটার' স্টেশন এখন 'বিদ্যাসাগর' নামে অভিহিত।

বাংলার মানুষ তখন কোভিডের আবহে সবেমাত্র নিও-নর্মালে অভ্যস্থ হতে শুরু করেছে। আমাদের 'আন্তরিক' সংগঠনের তরফ থেকে পাড়ার এক পুজোয় ক'জনে মিলে আড্ডা জমেছে। আন্তরিকের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো বছরে একটা বাহিরী আড্ডা দেওয়া। এই আড্ডায় আমরা ধলভূমগড়, প্রান্তিক, গ্যাংটকে বেশ মজা করেছি। গত প্রায় দুবছর কোভিডের কারণে আর তা সম্ভব হয়নি। আমাদের সভানেত্রী পৃথা মুখার্জী প্রস্তাব দিলেন আবার যদি সেটা করা যায়। কেননা অনেকদিন সবাই ঘরবন্দি হয়ে আছি। আমি তো শুনেই হাত তুলেছি। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? আমি প্রস্তাব দিলাম তীর্থ দর্শনের। শুনেই সম্পাদকের না। তীর্থ দর্শন নয়। বললেন—কাছে পিঠে দু/তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসা যায়, এমন কোনো জায়গা ভাবুন। আমি বললাম—এ তীর্থ সে তীর্থ নয়। এ এমন এক তীর্থ যেখানে জীবন্ত ঈশ্বর লীলা দেখিয়েছেন। সবার প্রশ্ন—সে আবার কোথায়? আমি বললাম—'কারমাটার'। দু-চারজন বুঝে গেলেও অনেকেই জায়গাটা বুঝতে পারলেন না।

বিশদে বললাম জায়গাটা ঝাড়খন্ডের বর্তমান জামতারা জেলায়— বর্তমানে সেই স্টেশনের নাম হয়েছে 'বিদ্যাসাগর'। শুনেছি সেখানে এখন থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে। সেই মহাপ্রাণের দ্বিশতবর্ষপূর্তিতেই সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু নানা কারণে আর যাওয়া হয়নি। এবারে সুযোগটা নেওয়া যেতেই পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। কিন্তু যেহেতু প্রস্তাব আমার তাই সব দায়-দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। শুধু ট্রেনের টিকিটের দায়িত্ব নিলেন সম্পাদক সুজিত মুখার্জী মশাই। প্রমোদ গুনলাম। ঝোঁকের মাথায় বলে তো দিয়েছি অন্ততঃ পাঁচ/ছজন মানুষের মোটামুটিভাবে ভদ্রস্থ একটা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে। অগত্যা স্মরণ নিলাম গুগলবাবার। তার দৌলতে যোগাযোগ হয়ে গেল 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র সম্পাদক দেবাশিস মিশ্রর সাথে। সমনামী বলে নয়। সত্যি অত্যন্ত ভদ্র এই মানুষটি আশ্বাস দিলেন আমাদের থাকা-খাওয়ার। সেই সাথে কারমাটার ভ্রমণের পুরো ছকটাই এঁকে দিলেন তিনি।

গতবছর ১০ অক্টোবরের সাতসকালে আমাদের স্বাগত জানাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন 'বিদ্যাসাগর' রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরিয়েই টেম্পো-অটোর ভিড়। সকলেই জানতে চায় যাব কোথায়? মিশ্রমশাই বলে দিয়েছেন স্টেশন থেকে বেরিয়ে মিনিট তিনেকের হাঁটাপথ। বাঁদিকে স্টেট ব্যাঙ্কের পাশের গলি দিয়ে ঢুকে একটু এগোলেই 'নন্দনকানন'। বিদ্যাসাগরের বড় সাধের তপোভূমি। এমন ভাবে পৌঁছে গেলাম যেন খুব চেনা রাস্তা। সত্যি মিশ্রমশাইয়ের জবাব নেই। কিন্তু মস্ত গেটে ঝুলছে ইয়া বড় তালা। গেটের ওপর তোরণে গ্রানাইট ফলকে লেখা ''নন্দনকানন''। বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন। রয়েছে কানন রক্ষকের নাম ও তার কন্ট্যাক্ট মোবাইল নাম্বার। মোবাইলে নাম্বার টিপতেই এসে দাঁড়াল একটি বাচ্চা ছেলে, বলল ''আমি জিতেন্দরের ব্যাটা। আপলোগোঁকা বুকিং হ্যায়।'' সম্মতি জানাতে আমাদের নিয়ে চলল সে বাপের কাছে। দু'পাশে বাগানের মাঝে সুন্দর সিমেন্ট বাঁধানো পথ পেরিয়ে অমরা পৌঁছলাম অতিথি নিবাসের কাছে। বাগানে মানুষের থেকে প্রকৃতির যত্নই বেশি। রংবাহারী প্রজাপতির ওড়াউড়ি আর পাখ-পাখালির ডানার ঝাপটাঝাপটি আমাদের শহুরে চোখে রঙ ধরিয়ে দিল। সবুজ রঙের একটা ছোট্ট পাখি কি একটা পোকা ধরে একেবারে হুস করে কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল। সুপ্রাচীন বিশাল বটগাছের নিচে রেলিং ঘেরা বেদী বাঁধানো স্থানে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি। মনটা বড্ড ভাল হয়ে গেল। কতদিনের ইচ্ছে হল পূরণ। সশ্রদ্ধায় প্রণাম করলাম মহাপ্রাণকে। ইতিমধ্যে অতিথি নিবাসের ঘর দুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে গেছে। অবশ্য আগে একটি অতিথি নিবাস আছে একটু দূরের দ্বিতল বাড়িটিতে। রেজিস্টারে সই-সাবুদ করে খাটিয়ায় বসে চা-পানের নিমন্ত্রণ। সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে স্বয়ং কাননরক্ষক জিতেন্দ্র মন্ডল। আহা; প্রথম চুমুকেই যেন সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। যদিও ক্লান্তি তেমন ছিল না। খুব আরামেই হয়েছে আমাদের নৈশ রেলভ্রমণ। জিতেন্দরজি জানালেন হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি ফ্রেস হয়ে নিতে তারপর তার ছেলে একপলক ঘুরিয়ে দেবে কানন। হাতমুখ ধোওয়া তো রেল শকটেই সারা, তবে আর কিসের তাড়া? জলখাবার তৈরি হবার আগেই বরং কিছুটা ঘুরে নেওয়া যেতে পারে। আমার আর তর সইছিল না। ঘর থেকে চাবি নিয়ে ছেলেটি চলল আমাদের গাইড হয়ে।

নন্দনকানন

১৮৫৯ সাল; বিদ্যাসাগর মানসিক ভাবে তখন আঘাতে আঘাতে একেবারে ভঙ্গুর। মাথায় রয়েছে প্রচুর দেনার বোঝা। তার অধিকাংশটাই বিধবাবিবাহ ও তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি চালনার খরচ। তার মধ্যেও তাঁর দান-খয়রাতি বন্ধ না হয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অথচ তার বিরুদ্ধে কৃতঘ্নতার সীমা নেই। পরের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক, তাঁর ভাই, পুত্র এমনকি গর্ভধারিণী জননীও তাঁর প্রতি বিমুখ। অথচ এরা প্রায় সকলেই তাঁরই অন্নে প্রতিপালিত। অবশেষে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, মিত্র সকলকেই পত্র দিয়ে জানালেন ''...আর নয়, আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে।... তোমাদের নিকট জন্মের মত বিদায় লইতেছি...নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে.....কাহারও সহিত কোনো সংশ্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ...কোনো নির্জন স্থানে গিয়া অবস্থান করিব।...।'' এরপর একটি বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ঘটনায় যারপরনাই দুঃখিত হয়ে যে জন্মভূমিকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন সেই স্বর্গাদপী গরিয়সী বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এরপর তিনি আরো একত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু কোনদিন আর বীরসিংহে পদার্পণ করেন নি। এই যে চিরকালের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে চলে আসা—এও তো একরকম বানপ্রস্থ। তবে তার বানপ্রস্থ বৈদিক চতুরাশ্রমের বানপ্রস্থ নয়। বরং সাংসারিক দুঃখ ভোলার জন্য আরো বেশি করে আর্ত মানুষের সেবায় জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেই সময় বর্ধমান ফিভার মহামারিতে বর্ধমান ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে প্রচুর মানুষ প্রাণ হারাচ্ছেন। বিদ্যাসাগর যথাশক্তিতে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন

আর্তদের সেবায়। কিন্তু মন খুঁজে চলেছে নতুন এক বীরসিংহের। যেখানে আবার নতুন করে তিনি সবকিছু শুরু করবেন। ভয়ঙ্কর বর্ধমান ফিভার মহামারিতে আর্তসেবার সেবায়তে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় গোলাম আসগার জায়েদির পরিবারের সাথে। সেই পরিবারের এক সন্তান তদানীন্তন সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে খোঁজ দেন কারমাটারের এই জায়গাটার। এক কাঠ কাটা সাহেবের বিধবার কাছ থেকে উচিৎ মূল্যে বিদ্যাসাগর এই জায়গাটি কিনে নেন তিনটি ছোট ঘর সমেত। তারপর এর নাম দেন 'নন্দনকানন'।

আমাদের গাইড ঘর খুলে দেয়। তিনটি ঘরের দেওয়ালে বিদ্যাসাগরের জীবনচিত্র আঁকা। সেই তাকগুলি এখনো রাখা আছে যেখানে তিনি দরিদ্র চাষীদের কাছ থেকে পছন্দমত দামে ভুট্টা কিনে রেখে দিতেন। তারপর আরো হতদরিদ্র মানুষেরা আসতো যেমন খুশি ভুট্টা নিয়ে বাগানে সেগুলি পুড়িয়ে খেয়ে সব পরিষ্কার করে রেখে যেত। ভিতরের আর একটি ঘর সম্ভবতঃ সেখানেই রাখা থাকতো কাঠের মস্ত সিন্দুক যেখানে বড়বাজার থেকে বিদ্যাসাগর কাপড় কিনে এনে রেখে দিতেন। আর দূর দূর গ্রাম থেকে বালিকা, মহিলারা এসে নিজেরাই বেছেবুছে পছন্দ মত কাপড় নিয়ে যেত তাঁর সাথে ঠাট্টা-মস্করা মান-অভিমান করতে করতে। তিনি হাসতে হাসতে তা উপভোগ করতেন। জায়গাগুলো স্পর্শ করে আমি অনুভব করতে চাইছিলাম সেই মহাপ্রাণের আনন্দের মুহূর্তগুলো। দেখলাম তার নিজের হাতে লাগানো আমগাছের এক বংশধরকে আর সেই প্রাচীন বনস্পতি মহাবটবৃক্ষকেও। যাঁর তলায় তিনি হাসিমুখে প্রতিদিন চিকিৎসা করতেন অগণিত মানুষের। ওষুধের গুণেই হোক বা তার ভালবাসার গুণে তারা কিন্তু বেশিরভাগ সুস্থ হয়ে উঠতো।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি

ইতিমধ্যে ডাক এলো জলখাবারের জন্য। আহা সামান্য লুচি আর আলুর তরকারির যে এমন স্বাদ হয় তা না খেলে টের পেতাম না। সত্যি প্রশংসা করতে হয় রক্ষকগিন্নীর। খেতে খেতেই জিতেন্দরজি প্রস্তাব দিলেন আমরা এবার টেম্পোতে চারপাশটা ঘুরে আসতে পারি। কিছুদূরে খুব বড় একটা গ্রাম আছে, করোগ্রাম। বাংলাদেশে এতবড় গ্রাম নাকি আর নেই। সেখানে আছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দির। আর সেটি পেরিয়ে আর একটু গেলেই অজয় নদের ওপর 'সিখটিয়া' বাঁধ। বেশ সুন্দর জায়গা। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। টেম্পো-বাহনও হাজির। রক্ষকপুত্র এখানেও আমাদের গাইড। সারথির সাথে তার দেখলাম বেশ ভাব। টেম্পো বাহনে আমরা পঞ্চজনে বেরিয়ে পড়লাম। কারমাটারের চারপাশ সন্দর্শনে যেতে যেতে চোখে পড়ল বেশ কয়েকটি পুকুর। যার কয়েকটা বিদ্যাসাগর কাটিয়েছিলেন এলাকার মানুষদের জলকষ্ট দূর করতে আর মৎস্যমুখ করাতে। পথে পড়ল করোগ্রাম। সারথি রথ দাঁড় করালেন না। বললেন, ফেরার পথে দেখাবেন। আরো এগিয়ে রাজ্য সড়কের ওপর অজয় নদের জল আটকে তৈরি হয়েছে সিখটিয়া বাঁধ। এই জায়গাটার নাম সিখটিয়া। সেই অনুসারে বাঁধের নাম। বাঁধের দু-তিনটি গেট খোলা। সেখান থেকে জল বেড়িয়ে এসে নিচের অববাহিকায় পড়ছে। নিচে বেশ ঢেউ খেলছে। সেখানে চলছে মাছধরা উৎসব। বহু মানুষ জাল নিয়ে নেমে পড়েছে জলে। মাছও ভাল উঠছে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রি। ওজনে কিংবা 'থাউকোতে'। ওদের জাল ছোঁড়া আর মহানন্দে মাছধরা দেখে আর থাকতে পারলাম না। অনেকগুলো উঁচু উঁচু সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম তলার অজয়ের বালুতটে। লোভে পড়ে নিয়ে নিলাম দু/দুটো জ্যান্ত কালবোস। সে এক দারুণ মুহূর্ত। মোবাইলে ঝটপট ছবি তোলা। রোদ ঝলমলে আলোয় নদী অববাহিকায় যতটা দেখা যায় যেন ফটোফ্রেমে বাঁধানো ছবি। বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এবার গন্তব্য করোগ্রাম।

কথিত আছে এই করোগ্রামের প্রাচীন নাম কর্ণাবতী। অঙ্গরাজ্যের অধিশ্বর মহাবীর কর্ণের রাজধানী ছিল এই স্থান। শিব উপাসক অধিরাজ কর্ণ এই গ্রামের মধ্যে এবং চারপ্রান্তে মোট পাঁচটি শিবের মন্দির তৈরি করেছিলেন। একেবারে কেন্দ্রে কর্ণেশ্বর, পূর্বে বাণেশ্বর, পশ্চিমে খজেশ্বর, উত্তরে কুসুমেশ্বর এবং দক্ষিণে রামেশ্বর। আমরা দাঁড়িয়ে কর্ণেশ্বর মন্দিরের চত্বরে। বেশ প্রশস্ত মন্দিরটি। সংস্কার করে অনেকটাই নতুন হলেও ভিতরে মন্দিরের পুরানো কাঠামোয় রয়েছে প্রাচীনতার চিহ্ন। কথা হচ্ছিল মন্দিরের পূজারী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁরা বংশানুক্রমে এই মন্দিরের পূজারী। এলাকার মানুষের কাছে খুবই জাগ্রত এই কর্ণেশ্বর শিব। এখানে খুব ধুমধাম করে শিবরাত্রি, গাজন ও দুর্গোৎসব হয়। বেশ বড় বড় মেলা বসে সে সময়। তাঁদের ঠাকুরদা গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তাঁরা শুনেছেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের গল্প। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে চলে আসতেন এখানে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে। মাঝে মাঝে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতেন গ্রামের মানুষদের। তিনি এলে খুব আনন্দ হতো গ্রামে। এখনো তাঁর নাম শুনলে বয়স্ক মানুষেরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। জিজ্ঞাসা করলাম ''আর আপনাদের নাতিপুতিরা?'' লজ্জা পেয়ে বললেন ''একালের ছেলে ছোকরাদের সময় কোথায়? তারা সব মোবাইলেই মশগুল।''

মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকেই এখানকার ভূমিপুত্র মহাবিপ্লবী সখারাম গণেশ দেউস্করের বাড়ি। এই গ্রামের এক মেয়ের সাথে বিয়ের পর তাঁর পূর্বপুরুষ সদাশিব বিঠল ভাই দেউস্কর এই গ্রামে আসেন এবং কিছু সম্পত্তি পেয়ে এখানেই বসবাস করতে শুরু করেন। পরবর্তিকালে রাজদরবারে কর্ম সুবাদে তিনি এবং তার উত্তরপুরুষ বেশ প্রতিষ্ঠিত হন। ব্রিটিশ শাসনে অত্যাচারের প্রতিবাদে সখারাম জ্বালাময়ী কলম ধরেন। মহারাষ্ট্র এবং বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলনের মাঝে তিনি সেতুবন্ধ রূপে কাজ করেন। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের তিনি ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক। পরে শ্রী অরবিন্দের প্রভাবে তিনি বাঙলার আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা 'দেশের কথা' বইটি ব্রিটিশ অপশাসন ও অত্যাচারের দলিল হয়ে উঠেছিল। অতিদ্রুত চার-চারটি সংস্করণ চার লাখ কপি নিঃশেষিত হলে বাংলা সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। শ্রী অরবিন্দর কথা অনুযায়ী সখারাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রথম স্বরাজ কথাটি ব্যবহার করেন।

সখারাম দেউস্করের বাড়ি

আজ তাঁর সেই বাড়িটি বিদ্যাভারতী শিশুমন্দির স্কুল। ঝাড়খণ্ড বোর্ডের অধীনে সেখানে নার্সারি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন হয়। এমন এক মহাবিপ্লবীর বাড়ির মাটি স্পর্শ করতে আপনা থেকেই মনে সাধ জাগে। আন্তরিকতার সাথে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের গ্রহণ করলেন। প্রথমেই ঠান্ডা শরবৎ এনে আমাদের পান করালেন, সঙ্গে অনন্য স্বাদের স্থানীয় পেঁড়া। লজ্জা পেলেও খেয়ে নিলাম সকলে। ছাত্র-ছাত্রীরা সুললিত ভঙ্গিতে আমাদের গেয়ে শোনাল 'সরস্বতী বন্দনা'। শিক্ষকরা ঘুরিয়ে দেখালেন শ্রেণিকক্ষ এবং সখারাম স্মারক কক্ষ। শ্রীশক্তি গোস্বামী বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্যের স্বাক্ষর সম্বলিত 'ক্রান্তিদূত সখারাম গণেশ দেউস্কর' জীবনী গ্রন্থটি আমায় উপহার দিলেন। এনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই আমাদের। এত সহজে আমরা অচেনাদের আপন করে নিতে পারি কই? আবার হয়তো দেখা হবে কোনদিন এই আশা রেখে বিদায় নিলাম।

নন্দনকাননে তখন মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। কিন্তু আমাদের আনা অজয় নদের কালবোস? ঠিক হলো রাতে হবে রান্না। দ্বিতল অতিথি নিবাসের নিচে একটি ঘরে স্থানীয় মেয়েরা অবৈতনিক সহায়তায় সেলাই শিখেছে। মাঝে ড্রয়িংরুমে খাওয়ার ব্যবস্থা। উপরে থাকেন অতিথিরা। আমরা অবশ্য আছি সামনের একতলা 'জামশেদপুর অতিথিশালা'য়। TISCO সহযোগিতায় তৈরি। থাকার ব্যবস্থা দারুন না হলেও যতটুকু আছে তাতে দিব্যি মানিয়ে নেওয়া যায়। আর তারজন্য খরচ মাথাপিছু অতি সামান্য।

আবার পাত পেড়ে ভোজন এবং তৃপ্তির ঢোঁকুর উদগিরন। তারপর খানিক বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম আমরা চারজন। গন্তব্য স্টেশন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১৭০তম পুণ্য জন্মজয়ন্তীতে ১৯৮৯ খ্রী: ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ তাঁর স্মৃতিতে 'কারমাটার' স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'বিদ্যাসাগর' নাম দেয়। এই উপলক্ষে পূর্বরেলের আসানসোল ডিভিশনের ডি.আর.এম শ্রীঅসীম কুমার মিত্র একটি স্মৃতিফলক উন্মোচন করেন ও নতুন রূপে স্টেশনটির উদ্বোধন করেন। এখন স্টেশন ও তার মূল প্রবেশদ্বার ও সংলগ্ন পথ খুবই নয়নাভিরাম। বেশ লাগছিল প্রায় ফাঁকা স্টেশনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে একের পর এক ননস্টপ মেল ট্রেনের ছুটে যাওয়া দেখতে।

সন্ধ্যা নামতেই স্টেশন চত্বরের বাইরে থেকে খোলাসমেত চিনা বাদাম ভাজা কিনে নন্দনকাননে ফেরা। আজ সন্ধ্যায় আমাদের 'আন্তরিক'-এর চতুর্থ বাহিরী আড্ডা। বিষয় ''ঈশ্বরের বানপ্রস্থ।' আমাদের পঞ্চজনের সাথে ভারচুয়ালি যোগ দিলেন 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতির'র সম্পাদক শ্রী দেবাশিস মিশ্র মশাই। জিতেন্দরজী গরম গরম পকোড়া, মুড়ি ও ধুমায়িত চা পাঠিয়ে দিলেন। জমে উঠল আমাদের আড্ডা। ''কথায় কথায় যে রাত হয়ে যায় ...'' সেটা বুঝলাম রাতে খাবারের যখন ডাক পড়ল।

রাতে মশারি টাঙিয়ে শুতে হল কারণ এখানে মশার উপদ্রব আছে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম সেই মহাপ্রাণের কথা। সকালে গিয়েছিলাম করোগ্রাম। প্রচলিত লোকশ্রুতিতে পুরাণের কর্ণাবতী নগরী। মহাভারত কালের দানবীর কর্ণ আর ব্রিটিশ শাসনকালের ঈশ্বরচন্দ্র কোথায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিলেন। সেই একইরকম ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই। একইরকম সর্বস্ব পণ করে সত্যরক্ষা: একইরকম ভাবে নিজের ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গিয়ে দানধর্ম পালন। কত অকথা-কুকথা তাঁদের শুনতে হয়েছে। সবশেষে কর্ণের রথের চাকা ভেঙে যাওয়ার মতো ঈশ্বরচন্দ্রের জ্ঞাতিবিচ্ছেদ। যে জননী ও জন্মভূমি তাঁর কাছে ছিল স্বর্গাদপী গরিয়সী তাঁদের কাছেও তিনি হলেন পরিত্যাজ্য। অথচ মানুষের জন্য কাজ করা তাঁর থেমে থাকেনি। সাঁওতাল পরগনার এই মাটিতে

তিনি গড়ে তুললেন তাঁর বানপ্রস্থ আশ্রম। সে এক অন্যরকম বানপ্রস্থ। যেখানে সর্বস্ব ত্যাগ করে খালি দরিদ্র আর্ত মানুষের জন্য কাজ করা যায়। মাথার ওপর অনেক দেনা, মানুষকে দেওয়া অনেক প্রতিশ্রুতি। সব মেটানোর জন্য চলল অমানুষিক পরিশ্রম। রাত জেগে বই লিখে চলেছেন তিনি। ভাবছেন আরো আরো সংস্কারের কথা...। এসব ভাবতে ভাবতেই কখন যেন আমার চোখে নেমে এল ঘুম।

পরদিন ভোরে আমার অতি প্রিয় ম্যাগপাই রবিনের ডাকে ঘুম ভাঙল। এই পাখিটি আমার বহু দিনের ঘুমভাঙানিয়া। অসম, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা সর্বত্রই ভোরটাকে মিষ্টি করে তোলে দোয়েল তার বোলে। আবার একবার গেলাম মহাপ্রাণের বাটিতে। গোটা জায়গাটা ফুলে ফুলে ঢাকা। আমাদের 'আন্তরিক'-এর প্রিয়দিদি পৃথা মুখার্জি মুঠো ভরে ফুল তুলে নিলেন সেই মহাপ্রাণকে অঞ্জলি দেবেন বলে। দেখাদেখি আমরাও। আবার ঘরগুলি খোলা হল। আবার একবার পরিক্রমা করলাম সকলে। যে ঘরটিতে তাঁর কালো পাথরে আবক্ষ মূর্তিটি আছে সেখানে অঞ্জলি দিলাম সকলে। পাশে একটি ঘটে রাখা আছে তাঁর প্রাণপ্রিয় বীরসিংহের মাটি। অভিমানভরে যে মাটিকে তিনি আর কোনওদিন স্পর্শ করেননি। বাঁকুড়ার একটি স্কুলের ছাত্ররা সেই মাটি শ্রদ্ধার সাথে ঘটে ভরে এনে রেখে গেছে তাঁর বানপ্রস্থ আশ্রমে। মন ভরে গেছে আমাদের সকলের এই তীর্থে এসে।

ভাবতে অবাক লাগে পরবর্তিকালে তাঁর কুলাঙ্গার পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য অর্থের লোভে এই সম্পত্তি পাথুরিয়াঘাটার মল্লিকদের বিক্রি করে দেয়। তারপর দীর্ঘদিন তা অবহেলিত ও অসামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্র হিসাবে পড়েছিল। অত:পর 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে ও রেলের সহযোগিতায় ও সর্বোপরি পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক পরিবারের অধস্তন পুরুষ সিংহদাস মল্লিকের উদারতায় এই 'নন্দনকানন' আজকের চেহারা ফিরে পায়।

ঈশ্বরতীর্থে প্রণাম করে এবার ফিরে যাওয়ার পালা।

সকালের প্রাতঃরাশ সেরে নন্দনকাননের মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পৌঁছলাম স্টেশনে। আমাদের বিদায় জানাতে এসেছেন 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদক শ্রীচন্দন মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

ছেড়ে দিল ট্রেন। আপাতত: গন্তব্য মধুপুর। সারা দিনটা সেখানে কাটিয়ে রাতের ট্রেনে মহানগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা। মনের মধ্যে কেমন যেন মনকেমন করা উদাস ভাব। ঝমঝম শব্দে ট্রেন অজয় নদ পার হচ্ছে। মনের মাঝে গুনগুন করে উঠল সুফিসাধক অখিলুদ্দিনের গাওয়া বিদ্যাসাগর মশাইয়ের প্রিয় গানের দু/এক কলি—

''তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী। আপনি দাঁড়ি, আপনি মাঝি। আপনি হও যে চড়নদারজী। আপনি হও যে নাওয়ের কাছি।
আপনি হও যে হাইল বৈঠা। সকল কাজের আপনি কাজী...।"

হে মহাপ্রাণ, তোমাকে আবারও প্রণাম।

বি: দ্র: আগ্রহীরা এক দুটো দিন শান্তি ও আনন্দে সুলভে নন্দনকাননে কাটাতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন—

বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন, নন্দনকানন
কারমাটার, জেলা জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।
পিন কোড: ৮১৫৩৫২
জীতেন্দ্র মণ্ডল, কেয়ারটেকার
মোবাইল নং ৮০৮৪৩৯৭৯০১ এবং
চন্দন মুখার্জি, যুগ্ম সম্পাদক
মোবাইল নং ৬২০২১৬৫৯৮৯

তথ্যঋণ স্বীকার:

১। করুণা সাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র
২। বিদ্যাসাগর—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

অভিনন্দন

- শাটলার লক্ষ্য সেনকে মাত্র ২০ বছর বয়সে ২০২১এর বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ানশিপে ব্রোঞ্জ, ২০২১-এর অল ইংল্যাণ্ড ওপেনে রানার্স এবং ২০২২ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা পাওয়ার জন্য
- মঙ্গোলিয়ায় অনুষ্ঠিত এশীয় কুস্তিতে ৫৭ কেজি বিভাগে রবি দাহিয়ার সোনার হ্যাট্রিকের জন্য
- মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভারতীয় গ্র্যাণ্ডমাস্টার এস. আর. প্রজ্ঞানন্দের ২০২২ এয়ারথিং মাস্টার্স এবং চেসেবল মাস্টার্স-এ দু দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ম্যাগনাস কার্লসনকে হারানোর জন্য। মহিলা দাবা দলকে ওলিমপিয়াডে তৃতীয় হওয়ার জন্য
- ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ফাস্ট বোলার অলরাউণ্ডার ঝুলন গোস্বামীর আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটে একদিনের সীমিত ওভার ম্যাচে প্রথম ২৫০ উইকেট পাবার জন্য
- মেহুলি ঘোষ ও সাহু তুষার মানেকে শ্যুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে সোনা পাওয়ার জন্য
- সাইখম মিরাবাই চানু, অচিন্ত্য শিউলি সহ কমনওয়েলথ গেমসে বিজয়ীদের (২২ সোনা, ১৬ রুপো, ২৩ ব্রোঞ্জ, চতুর্থ)

কলকাতার সরকারি নজরুল মঞ্চে চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দর্শকাসনের তিনগুণ বেশি ভিড়ে ঠাসা দমবন্ধ পরিবেশে শাসকদলের ছাত্রসংগঠনের অনুষ্ঠানে নামী সঙ্গীতশিল্পী কে. কে. কে গান গাইতে বাধ্য করা, তারপর বিনা চিকিৎসায় তাঁর অকাল মৃত্যু, তারপর সরকারি গান স্যালুট দিয়ে তাঁকে বিদায় জানানোর ঘটনার আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

পত্রিকার দুনিয়ায়

অনন্ত যুগও এক দিন ফুরোবে

বিকাশ সিংহ

সে প্রায় ১,৪০০ কোটি বছর আগের কথা। এক অকল্পনীয় বিস্ফোরণের পরেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হল। এই বিস্ফোরণের প্রচলিত নাম বিগ ব্যাং। আমরা যখন ষাটের দশকে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে গেলাম, তখনও বিগ ব্যাং আবিষ্কার হব হব করছে। ফ্রেড হয়েল, জয়ন্ত নারলিকর, ডেনিক সিয়ামার মতো বাঘা বাঘা অধ্যাপক তখন কেমব্রিজে রয়েছেন। এঁরা সকলেই তখন ব্রহ্মাণ্ডের 'স্টেডি স্টেট থিয়োরি' নিয়ে মশগুল। ব্রহ্মাণ্ড তরতরিয়ে প্রসারিত হচ্ছে, অনেকটা বেলুনে হাওয়া ভরলে যেমনটা হয়। ফাঁকা জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে, এবং সেখানেই নতুন করে হাইড্রোজেন থেকে তৈরি হচ্ছে নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদি। সুতরাং, ব্রহ্মাণ্ডের নেই কোনও শুরু, নেই কোন শেষ। সৃষ্টি ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সে রয়েছে 'স্টেডি স্টেট'-এ।

পদার্থবিদ অমল রায়চৌধুরি

স্টেডি স্টেট থিয়োরি নিয়ে তখন সবাই খুশি। এই মতবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সঙ্গে রয়েছে এক দার্শনিক সৌন্দর্য। কিন্তু এই মতবাদই এক দিন ধুলিসাৎ হয়ে গেল। ১৯৬০ সালে নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরি বসাল মহাজাগতিক বিকিরণ মাপার এক সূক্ষ্ম অ্যান্টেনা। আর্নো অ্যালান পেনজিয়াস ও রবার্ট উড্র উইলসন অ্যান্টেনায় ধরা পড়া তথ্যে লক্ষ করলেন এক অদ্ভুত ব্যাপার—আকাশের যে কোনও দিক থেকেই এক ক্ষীণ বিকিরণ আসছে। যেন গোটা ব্রহ্মাণ্ডই নিবিষ্ট মনে বিকিরণ ছড়াচ্ছে। কিন্তু ওই বিকিরণের তাপমান খুবই কম। পেনজিয়াস ও উইলসনের প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো অ্যান্টেনায় কোনও ত্রুটি রয়েছে, বা পায়রার বর্জ্যের কারণেই অ্যান্টেনায় ঠিক তথ্য ধরা পড়ছে না।

পেনজিয়াস ও উইলসন কিছু দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা আসলে এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে এক বিরাট অকল্পনীয় বিস্ফোরণে, এবং তাঁদের অ্যান্টেনায় যে বিকিরণ ধরা পড়েছিল, তা আসলে ব্রহ্মাণ্ডের আদিম বিকিরণ। এ হল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিম মুহূর্তের সুর, মহাজাগতিক বিকিরণের ভৈরবী। এই আদিম বিকিরণ আজও ধরা দিচ্ছে বিভিন্ন গবেষণায়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসের বিচিত্র গল্প, সৃষ্টি ও ধ্বংসের অজস্র রহস্য। আবিষ্কৃত হল বিগ ব্যাং।

এর পরেই প্রশ্ন ওঠে, বিগ ব্যাং হল কেন? বিগ ব্যাং-এর আগেই বা কী ছিল? ২০২০ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী রজার পেনরোজ এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো পেয়েছেন। ওঁর মতে, আমাদের আজকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনেক অনন্ত যুগের মধ্যে একটি। এই এক-একটি অনন্ত যুগকে বলা হয় 'ইয়ন'। বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের ইয়নও এক দিন শেষ হবে। আবারও নতুন করে শুরু হবে এক ব্রহ্মাণ্ড, আরও এক নতুন ইয়ন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যুগ শুরু হয়েছিল ১,৪০০ কোটি বছর আগে। এই অনন্ত যুগ বাস্তবে অনন্ত নয়। ব্রহ্মাণ্ডের জীবনেরও শুরু আছে, শেষ আছে। অনেকটা মানুষের জীবনের মতো। তবে সময়ের পরিধি একেবারেই ভিন্ন। মানুষের জীবন ১০০ বছরের মতো। ব্রহ্মাণ্ডের জীবন তিন-পাঁচ হাজার কোটি বছর।

স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজ

ফিরে যাওয়া যাক রজার পেনরোজের চিন্তাধারায়। আমাদের বর্তমান ব্রহ্মাণ্ডের যুগের আগে আরও একটি ব্রহ্মাণ্ড ছিল। সেই ব্রহ্মাণ্ড আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের মতোই প্রসারিত হচ্ছিল। সময়ের সঙ্গে প্রসারিত হতে হতে সেই ব্রহ্মাণ্ড একটি নিজস্ব শ্মশানে পরিণত হল। ধীরে ধীরে সমস্ত তারা নিবে গেল। তাদের পারমাণবিক জ্বালানি শেষ হল। তখন কোনও কিছুই নেই আকাশে। সব শেষ। ব্ল্যাক হোলগুলোর তাপমানও তখন ব্রহ্মাণ্ডের তাপমানের চেয়ে বেশি। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী তখন কোটি কোটি ব্ল্যাক হোল ফেটে পড়তে শুরু করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সব কটা ব্ল্যাক হোল ফেটে উৎপন্ন হল প্রচুর পরিমাণে শক্তি। এই শক্তিই আরও এক নতুন ইয়ন থেকে আর এক ইয়নে যাওয়ার মাঝেই ঘটল বিগ ব্যাং। ফের নতুন করে সৃষ্টি হল ব্রহ্মাণ্ডের। অঙ্ক কষে এই ঘটনারই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন রজার পেনরোজ। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী আগের যে ইয়ন, সেখানে দুই বিশালাকার ব্ল্যাক হোলের সংঘর্ষ ঘটেছিল, যার ছাপ ও ছবি ফুটে উঠবে এখনকার ইয়নে। এ ছাড়াও এক অনন্ত যুগ শেষ হয়ে যে আর এক অনন্ত যুগ শুরু হয়েছে, তার অস্তিত্ব ধরা পড়বে আজকের মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন মহাজাগতিক ইঙ্গিতে।

আগের যুগের ধ্বংসস্তূপ থেকেই নতুন যুগের সৃষ্টি—এই হল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল কথা। আমরা ভাগ্যবান যে, সৃষ্টি-ধ্বংসের এই খেলার রহস্য যে সময়টা উন্মোচিত হচ্ছে তার সাক্ষী থাকতে পারছি আমরা।...

কৃতজ্ঞতা : আনন্দবাজার পত্রিকা

* আশুতোষ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরির (১৯২৩-২০০৫) 'রায়চৌধুরি ইকোয়েশন' (১৯৫৫) জর্ডন, হকিং, পেনরোজ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব নিয়ে কাজের অন্যতম বনিয়াদ ছিল।

** 'নাসা' ইওরোপীয় ও কানাডিয়ান মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সাহায্যে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের চাইতেও অনেক শক্তিশালী জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ নির্মাণ করে ২৫ ডিসেম্বর ২০২১, ১৫ লক্ষ কি.মি. দূরে যেখানে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রিয় সেই লাগারাঞ্জ$_2$ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে পাঠায়। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ১১ জুলাই ২০২২ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের ছবি পাঠাতে শুরু করে।

সবুজ মঞ্চ
sabuj mancha

A Platform of Organizations and People Supporting Environment
RA 449 Sector IV Salt Lake, Kolkata 700105
Contact No:9831636817
E mail : sabujmancha@gmail.com

শ্রীমতি মমতা বন্দোপাধ্যায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়—বীরভূম জেলার দেওচা পাঁচামির প্রস্তাবিত কয়লাখনির পরিবেশের উপর প্রভাব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন

মাননীয়া,

আপনি নিশ্চয় জানেন বিভিন্ন পরিবেশ প্রেমী সংগঠন এবং ব্যক্তির যৌথ উদ্যোগে 'সবুজ মঞ্চ' ২০০৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সাধ্যমত কাজ করে আসছে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই আপনার 'জল ধরো জল ভরো' আহ্বান এবং পরিবেশ রক্ষার নানা উদ্যোগকে আমরা সমর্থন জানিয়েছি।

রাজ্যের অর্থনীতিতে উন্নয়ন এবং কর্ম সংস্থানের সম্প্রসারণ হোক, আমরা অবশ্যই চাই। আমরা চাই রাজ্যে নতুন নতুন শিল্প এবং প্রকল্প গড়ে উঠুক এবং রাজ্যবাসীর জীবন মানের উন্নতি ঘটুক। সেই সঙ্গে যে ধরনের প্রকল্প পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক পদক্ষেপ নেবার এবং ক্ষতির পরিমাণ মাত্রাধিক হলে, তা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। কারণ সেই ধরনের প্রকল্পগুলি কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর সুবিধা করে দিলেও বা তাৎক্ষণিক কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত তা শুধু পরিবেশের ক্ষতি করে না, সাধারণ মানুষের সার্বিকভাবে আর্থিক ক্ষতি হয়, জীবন মানের ক্ষতি হয় এবং যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আপনিও এক সময়ে বেশ কিছু কর্মসংস্থান হবে জেনেও উপকূল অঞ্চলের জল, জমি এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতির কথা ভেবে নয়াচরে কেমিক্যাল হাব প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন।

বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা জেনেছি, বীরভূমের মহম্মদবাজার ব্লকের দেওচা-পাঁচামি-দেওয়ানগঞ্জ-হরিণশিঙ্গা কয়লা ব্লকে ১২.৮ বর্গ কিলোমিটার (৩৪০০ একর) অঞ্চল জুড়ে এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লকে খনি চালু হতে চলেছে। দেশের বিভিন্ন কয়লা খনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার সরাসরি মালিকানা এবং পরিচালনায় থাকলেও, এই বৃহত্তম কয়লা ব্লকের মালিকানা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড (CIL) প্রথমে পাঁচটি রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেছিল কিন্তু বাকিদের উৎসাহ না থাকায় সম্পূর্ণ কোল ব্লকটি এখন পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBPDCL) এই কয়লাখনি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। জানা গেছে এখানে মাটির নীচে রয়েছে প্রায় ১২০ কোটি টন কয়লা আর তার উপরে ১৪০ কোটি টন ব্যাসাল্ট পাথর। এই এলাকায় রয়েছে সরকারি দপ্তরের জমি, খাস জমি, ব্যক্তিগত মালিকানা ও পাট্টায় দেওয়া জমি এবং বনাঞ্চল। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে প্রস্তাবিত খনি অঞ্চলের বেশির ভাগ জমি আদিবাসীদের। সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী ৩০১০ টি পরিবার এই খনি অঞ্চলে বাস করেন যার মধ্যে ১০১৩টি আদিবাসী পরিবার। আরো ১০৩৮টি পরিবারের জমি এই খনি অঞ্চলের মধ্যে আছে। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা অনেক বেশি।

এরকম কিছু কিছু তথ্য জানা গেলেও প্রস্তাবিত খনি সম্পর্কে আরো বেশ কিছু তথ্য নির্দিষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। এই খনিতে কয়লা কত নীচে আছে, ব্যাসাল্ট পাথরের আচ্ছাদন ভেঙ্গে কয়লা তুলতে কত সময় লাগবে, কয়লার মান কেমন কত হবে, সেগুলি কতটা কাজে বা ব্যবসায়ে লাগবে, কি প্রযুক্তি হবে, প্রযুক্তি কারা দেবে, দেশীয় প্রযুক্তি উপযুক্ত ও লাভজনক হবে কিনা, না হলে বিদেশী প্রযুক্তি পাওয়া যাবে কিনা — এসব কিছুই জানা নেই।

এই এলাকায় সরকারি হিসাবে ইতিমধ্যেই ৯-১০টি পাথর খাদান চালু আছে, ২৮৫টি স্টোন ক্রাশার ইউনিট চালু আছে। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় চার গুণ এবং তার তিন ভাগের কোনো রেজিস্ট্রেশন নেই, বেআইনি ভাবে চলছে। আপনি নিশ্চয় জানেন পাথর খাদান ছাড়াও মহম্মদবাজার, দুবরাজপুর অঞ্চলে অনেকগুলি ইউনিট থেকে কয়লা উত্তোলন হয় যার অধিকাংশই বেআইনি। বার বার তদন্তে দেখা গেছে যে এই অঞ্চলের স্পঞ্জ আয়রন এবং ফেরো এলয় কারখানা গুলির অধিকাংশই চলে এই সব বেআইনি কয়লা ব্যবহার করে। এই অঞ্চলের মানুষ, বিশেষত: এই সব খনি, খাদান এবং ক্রাশার-এ কাজ করা কর্মীদের অনেকেই সিলিকোসিস, নিউমোকোনিওসিস ইত্যাদি অসুখে মৃতপ্রায়।

পরিবেশপ্রেমী হিসাবে আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা, এই খনি চালু হলে পরিবেশের উপর তার কি এবং কতটা প্রভাব পড়বে, কিভাবে তার ব্যবস্থাপনা হবে, তা নিয়ে জনসমক্ষে কোথাও কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কোনো বৃহৎ প্রকল্প, বিশেষ করে লাল ক্যাটাগরি প্রকল্প হলে প্রথমেই তার পরিবেশে প্রভাব নিয়ে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এখানে তেমন কিছুর অস্তিত্ব আমরা জানতে পারিনি।

এমনকি কোথাও সরকারি ঘোষণায়, ওয়েবসাইটে, বিবৃতিতে এই প্রকল্পের বিশদ বিবরণ এবং পরিবেশে প্রভাব নিয়ে মূল্যায়নের যে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে— এমন কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ ইতিমধ্যেই জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে, ক্ষতিপূরণের রূপরেখা বেসরকারি ভাবে ঘোষিত হয়েছে, চাকরির ফর্ম বিলি হচ্ছে, সরকারিভাবে তাই নিয়ে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বোঝানোর জন্য কমিটি তৈরি হয়েছে, কমিটির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মূলত পরিবেশ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে, এই প্রকল্প সম্পর্কে আমরা তাই কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই -

> এই প্রকল্পের জন্য বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট (Detailed Project Report– DPR) তৈরি হয়েছে কি? যদি এই রিপোর্ট তৈরি হয়ে থাকে, কিভাবে তা জনসমক্ষে পাওয়া যাবে? যদি না হয়ে থাকে, কবে এই রিপোর্ট তৈরি হবে?

> যদি বিশদ প্রোজেক্ট রিপোর্ট না হয়ে থাকে, প্রোজেক্টের মৌলিক কাজগুলি শুরু করা হচ্ছে কিভাবে?

> পরিবেশের উপর এই প্রকল্পের কি প্রভাব পড়বে, তার মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment–EIA) যা এই ধরনের বৃহৎ প্রকল্পের পক্ষে বাধ্যতামূলক, তা করা হয়েছে কি? যদি হয়ে থাকে, কিভাবে তা জনসমক্ষে পাওয়া যাবে?

> যদি এখনো না হয়ে থাকে, কবে তা তৈরি হবে? কোনো সংস্থাকে কি এই মূল্যায়ন করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে? হলে কোন সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে? যদি এখনও না হয়ে থাকে, প্রকৃত দক্ষ এবং নিরপেক্ষ সংস্থাকে নিয়োগ করার জন্য কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

> পরিবেশ ছাড়পত্র পাবার জন্য দ্রুত পরিবেশ মূল্যায়ন (Rapid Assessment) - এর পরিবর্তে রাজ্যবাসীর স্বার্থে বিশদ মূল্যায়নের ব্যবস্থা হবে তো?

> এই ধরনের প্রকল্পের জন্য বিশদ পরিকল্পনা জনসমক্ষে এনে, স্থানীয় মানুষের মতামত জানার জন্য কোনো জনশুনানির (Public Hearing) আয়োজন করা হয়েছে কি?

এই সব জানা গেলে আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরই হয়তো জানা হয়ে যেত। পাওয়া যায়নি বলেই আমরা জানতে চাই -

> এই প্রকল্প চালু করতে হলে, কত পরিমাণ বনাঞ্চল ধ্বংস করতে হবে? কতগুলি গাছ কাটা হবে? কিভাবে এই বনাঞ্চলের ক্ষতিপূরণ হবে? কতগুলি গাছ কোথায় বসানো হবে?

> এই প্রকল্প কত পরিমাণ জমির চরিত্র পরিবর্তন করবে? কিভাবে এই পরিবর্তনের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে?

> এই এলাকায় ভূগর্ভের এবং ভূপৃষ্ঠের জলসম্পদের পরিমাণ কত? কয়লা খনি চালু হলে তার কত পরিমাণ খনির জন্য ব্যবহার করা হবে? খরা প্রবণ এই এলাকায় এই জলসম্পদের ব্যবহারের পরিপূরণ কিভাবে হবে?

> খনি চালু হলে, এই এলাকার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নদীগুলির নাব্যতার এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির জলের উৎসগুলির উপর কি প্রভাব ফেলবে?

> কি পদ্ধতিতে অথবা কোন কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন হবে? এই পদ্ধতির বা পদ্ধতিগুলির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি? কিভাবে তা এই এলাকার পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত হবে? পদ্ধতির কারণে পরিবেশ দূষণ হলে কিভাবে তার ব্যবস্থাপনা হবে?

> প্রাসঙ্গিক সমস্ত সংবাদে প্রকাশ যে ভূতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতার (Geological challenges) জন্যই কোল ইন্ডিয়া এবং যাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল সেই রাজ্যগুলি এই খনির ভাগ নিতে রাজী হয় নি। আমাদের রাজ্য বা WBPDCL কোন পদ্ধতিতে এই প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করবে?

> যে বিপুল পরিমাণ ব্যাসাল্ট পাথরের আচ্ছাদন কয়লার উপরে রয়েছে, কয়লা পেতে হলে আগে তা তুলতে হবে। যে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে, তার কি প্রভাব তৈরি হবে? পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি, ঘরবাড়ি কিভাবে এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে? কিভাবে সেই ক্ষতির ব্যবস্থাপনা করা হবে?

> একটি অসমর্থিত খবরে জানা গেছে সরকারি ভাবে স্বীকৃত ২৮৫ টি ক্রাশার ইউনিটকে ব্যাসল্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বিনামূল্যে জায়গা দিয়ে স্থানান্তর করা অর্থাৎ কয়লা খনি চালু হবার পরেও এই দূষণ সৃষ্টিকারী ক্রাশার গুলি শুধু চালু থাকবে না, এমন ধরনের সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবে, যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হলে, বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত পাথর ভাঙ্গতে হবে এবং পরিবহণ করতে হবে। এর ফলে যে অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ ঘটবে, তার কি ব্যবস্থাপনা করা হবে?

> ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের পাথর খাদান গুলির জন্য চাষের জমি, জলাশয়, বাড়ি ঘর ধূলিকণার আচ্ছাদনে ভরে থাকে। ব্যাসাল্ট পাথর আচ্ছাদন ভাঙ্গা শুরু হলে এবং কয়লার উত্তোলন শুরু হলে, যে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা বাতাসে মিশবে তার পরিমাণ কত হবে? সেই ধূলিকণার চরিত্র কেমন হবে? কি কি ধরনের দূষণ সৃষ্টিকারী উপাদান থাকবে? কিভাবে এই ধূলিকণার ব্যবস্থাপনা করা হবে?

> যে বিপুল পরিমাণ সাধারণ এবং বিপজ্জনক আবর্জনা তৈরি হবে, তার ব্যবস্থাপনা কিভাবে করা হবে? আবর্জনা ফেলার জায়গা, পুনর্ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণের কোনো পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে কি?

> এই খনি চালু হলে, এই বিস্তীর্ণ এলাকার জীববৈচিত্রের উপর কি প্রভাব পড়বে? পশু, পাখি, মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর কতটা ক্ষতি হবে, কিভাবে তা পূরণ করা হবে?

> এই খনি চালু হলে পরিবেশের উপর যে বিপুল পরিমাণ প্রভাব পড়বে, তার জন্য সাধারণ মানুষের এবং বিশেষভাবে বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের স্বাস্থ্যর উপরে তা কি প্রভাব ফেলবে তার কোনো মূল্যায়ন করা হয়েছে কি?

> জনস্বাস্থ্যর ক্ষতির কোনো ব্যবস্থাপনা করার জন্য কোনো পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে কি?

> প্রকল্পের জন্য যে ব্যাপক উচ্ছেদ হবে, তার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব তৈরি হবে তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

আর একটি বিষয় আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। প্রশ্নটি এখানে শেষে করলেও, তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সারা পৃথিবীতে আজ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমশ: কমানোর কথা হচ্ছে, প্রতিটি দেশ তাদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করছে, প্রতিটি সরকার কিভাবে এই জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করা যায়, তার দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করছে। সম্প্রতি গ্লাসগোর কনফারেন্স অব পার্টিজ-এর ২৬ তম সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, একটি জীবাশ্ম জ্বালানির প্রকল্পে, এভাবে এত বিনিয়োগ করে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি চালু করলে রাজ্যের ভাবমূর্তি এবং সম্মান রক্ষা করা যাবে কি? তাছাড়া এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মানের উপযুক্ত বিনিয়োগ এবং উন্নত প্রযুক্তি পাওয়া যাবে কি?

এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আর একটি প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির প্রকল্প তৈরি এবং বাড়ানোর জন্য রাজ্যর পরিকল্পনা কি? এক সময়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদনে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যে অগ্রণি স্থান ছিল তা এখন পিছিয়ে পড়েছে। আপনার কি মনে হয় না, কয়লাখনির প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের পরিবর্তে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে, পরিকল্পনা করে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে পারলে, তা রাজ্যবাসীর পক্ষে অনেক ভাল হত, বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে সাহায্য করত এবং রাজ্যর ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হত?

আমরা প্রশ্নগুলির উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন সহ,
নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক, সবুজ মঞ্চ

IN ASSISTANCE WITH HOOGHLY ZILA PARISHAD
AND KHANAKUL-1 BLOCK DEVELOPMENT OFFICE

RADHANAGAR PALLI SAMITI

ESTD. 1923
[Registered under W.B. Societies Registration Act 1961]
&
Raja Rammoluun Roy 250 th Birth Celebration Committee
A RURAL VOLUNTARY ORGANISATION
VIII.- Radhanagar– P.O. - Nangulpara– P.S. - Khanakul– Dist. - Hooghly. West Bengal - 712406
Contact No. 382393336 / 001663395/0748351 461
Radhanagar Rammohun Memorial and Cultural Organisation
Contact No. - 9474360036 / 4932386453

২০২২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহনের ২৫০-তম জন্মবর্ষে ২২মে ২৫১-তম জন্মদিনে রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে রামমোহনের জন্মোৎসব পালন।

ভারতপথিক ও নবযুগের দিশারি রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন মেমোরিয়াল ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং রঘুনাথপুরে রামমোহনের স্বনির্মিত বসতবাটী ও রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ অলকমঞ্জরীর সতীদাহ স্মারকবেদী ও সংলগ্ন পর্যটনকেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করায় আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।

রাজা রামমোহনের যুক্তিবাদ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নারীপ্রগতির স্বপ্ন ও চিন্তাধারা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

এ-বছর ২২মে তারিখে রাধানগর পল্লী সমিতির পক্ষে Raja Rammohan Roy 250th Birth Celebration Committee সারাদিনব্যাপী জন্মোৎসব পালনের আয়োজন করেছে। রাধানগরে রামমোহন মেমোরিয়াল চত্বরে এই বর্ণাঢ্য জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা কামনা করি।

রামমোহন মেমোরিয়াল হল

রাধানগরে রামমোহনের সমাধির রেপলিকা

— অনুষ্ঠান সূচি —

- ❑ মেমোরিয়ালে রামমোহন মূর্তি, জন্মবেদী ও সমাধি মন্দিরে মাল্যদান ২২মে (সকাল ৭টা)
- ❑ ট্যাবলোসহ প্রভাতফেরি - রামমোহন মেমোরিয়াল হইতে রঘুনাথপুর ২২মে (সাড়ে ৭টা)
- ❑ রঘুনাথপুরে রামমোহন মূর্তি ও সতীদাহ স্মারক বেদীতে মাল্যদান ২২মে (সকাল ৮টা)

(উদ্যোগে- রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন)

- ❑ মেমোরিয়ালে প্রত্যাবর্তনের পর টিফিন বিতরণ
- ❑ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২২মে (১০টা — ১২টা)
- ❑ মধ্যাহ্ন বিরতি
- ❑ এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—
  - বসে আঁকো প্রতিযোগিতা (২১ মে, বেলা ১০টা থেকে ১১টা)
  - প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (২১ মে, বেলা ১০টা-১১.৩০ মিঃ)
  - কুইজ প্রতিযোগিতা (২২ মে, বেলা ১১টা—১টা)

(উদ্যোগে- রাধানগর পল্লী সমিতি)

- ❑ চা - পানের বিরতি
- ❑ ড. পরেশচন্দ্র দাস লিখিত ‘রামমোহন-কিশোর-কিশোরীদের জন্য’ নাট্যায়ন এবং
- ❑ রামমোহন স্মারক উদ্বোধন ও রামমোহন সম্পর্কিত আলোচনাচক্র ২২মে (বেলা ৩টা - ৫টা)
- ❑ সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২২মে (৫টা — ৮টা)
- ❑ রামমোহন সম্পর্কিত তথ্যচিত্র প্রদর্শন ২২মে (৮টা — ৯টা)
- ✸ প্রয়োজন সাপেক্ষে অনুষ্ঠান সূচির কিছু পরিবর্তন হতে পারে।

ড. পরেশচন্দ্র দাস
সভাপতি

বাসুদেব বসু
সম্পাদক

বিশ্বজিৎ দত্ত ও অসীম রায়
যুগ্ম আহ্বায়ক

দেবাশিস শেঠ
সম্পাদক

(রাজা রামমোহন ২৫০তম জন্মবর্ষ পালন কমিটি)

(রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল কমিটি)

তাং- ১৮/০৪/২০২২

সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ নিবেদিত

কলকাতায় ১৯শ মে-র ঐতিহাসিক ভাষা পদযাত্রা

মূল ডাক : আসাম সহ উত্তরপূর্ব ভারত কাঁদছে, আসুন তাদের পাশে দাঁড়াই।

মাননীয় রাজ্যের সচেতন শিল্পী সাহিত্যিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা জানেন ব্রিটিশ ভারতে প্রথম বঙ্গভঙ্গ হয় ১৮৭৪ সালে, রংপুরের গোয়ালপাড়া এবং বাংলার ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক পীঠস্থান সিলেটকে বাংলা থেকে কেটে আসামে ঢুকিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। আর স্বাধীনতার পরে ও আসাম সরকার উগ্র অসমিয়াকরণের তীব্র সংকীর্ণতায় আসাম বিধানসভায় ১৯৬০ সালের ২৪শে অক্টোবর একচক্ষু অসমিয়া রাজ্যভাষা আইন পাশ করে। সরকারের এই অন্যায় ভাষানীতির প্রতিবাদে ও বাংলা সহ অনসমিয়া ভাষাভাষীদের ভাষিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে যে অরাজনৈতিক তীব্র গণ আন্দোলন সংগঠিত হয় তাতে একমাত্র শিলচর স্টেশনেই ১৯৬১ সালের ১৯শে মে একদিনে এগারো জনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। সেই মহান ভাষাশহিদেরা হলেন : ১। কমলা ভট্টাচার্য, ২। শচীন্দ্র নাথ পাল, ৩। সুনীলকুমর সরকার, ৪। বীরেন্দ্র সূত্রধর, ৫। কানাইলাল নিয়োগী, ৬। সুকোমল পুরকায়স্থ, ৭। চণ্ডীচরণ সূত্রধর, ৮। সত্যেন্দ্র দেব, ৯। হীতেশ বিশ্বাস, ১০। কুমুদরঞ্জন দাস, ১১। তরণী দেবনাথ। এরপর ১৯৭২ সালের ১৭ই আগস্ট শহিদ হন করিমগঞ্জের যুব ফেডারেশনের নেতা বিজয় চক্রবর্তী বাচ্চু (১২তম শহিদ)। ১৯৮৬-র ২১শে জুলাই প্রাণ দেন ১৩তম শহিদ দিব্যেন্দু দাস (জিশু) ও ১৪তম শহিদ জগন্ময় দেব (জগন)। বরাকের সর্বজন স্বীকৃত ১৫তম শহিদ হলেন বিষ্ণুপুরী মণিপুরি ভাষার ষোড়শী কন্যা সুদেষ্ণা সিংহ। তিনি প্রাণ দেন ১৯৯৬-র ১৬ই মার্চ পাথরকান্দি সন্নিকটে কলকলিঘাটে। অসমিয়াভাষা আগ্রাসনের প্রতিরোধে অনসমিয়াদের এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থানপন্থীদের বিরুদ্ধে আমাদের সারাদেশে সেই ভাষা মঞ্চ রাজ্যের অন্যান্য বন্ধু-সংগঠন ও পত্রপত্রিকার যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৯শে মে ২০২২ বৃহস্পতিবার বেলা ৪ টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল যাবে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। এই ভাষা পদযাত্রার সূচনা করবেন ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সঙ্গে থাকবেন মানভূম আন্দোলনের প্রবীণ ভাষা সৈনিক কাজল সেন ও আইনজীবী সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য, বাংলা ভাষা মঞ্চের সর্বভারতীয় সভাপতি ক্যাপ্টেন ডাঃ দিলীপকুমার সিংহ। সাহিত্যিক সাধন চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য, প্রাক্তন আয়কর কমিশনার অমরকৃষ্ণ বিশ্বাস, অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা, রজত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, প.ব. গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী সংঘ) কবি জিয়াদ আলি, জাতীয় শিক্ষক সূর্যাংশু ভট্টাচার্য, লোক গবেষক কাজল অধিকারী, সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর প্রমুখ। বেলা ২টোয় কলিকাতা বিশ্ব জাতীয় সংহতি কক্ষে ভারতে বাংলা ভাষার অধিকার দিবস পালন। আলোচনা চক্র উদ্বোধন করবেন অধ্যাপক জ্যোতির্ভূষণ দত্ত। কবি সম্মেলন উদ্বোধন করবের কবি শ্যামল সেন। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন কবি দিলীপ পাল ও কবি অমল দত্ত। অন্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন লিটল ম্যাগাজিন সংগঠক সন্দীপ দত্ত, অধ্যাপক তপন মণ্ডল (ডীন) মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, সুরঞ্জন মিদ্দ্য, সুস্নাত দাশ (রবীন্দ্র ভারতী), কৃষ্ণপদ মজুমদার (যা বি) মজিজ উদ্দিন (প্রেসিডেন্সি), আশিস সানা, ড. সুজিত বড়ুয়া, অঞ্জন ঘোষ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) সমীরবরণ দাস (ঐকতান), কল্যাণ ব্যানার্জি (কালান্তর), সন্দীপ দে (দেশহিতৈষী), শান্তনু দত্ত চৌধুরী (সপ্তাহ), চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য (জনস্বার্থ বার্তা), ইমানুল হক (ভাষা ও চেতনা সমিতি), রবীন্দ্রনাথ সেন (বাঙালি বিদ্বৎসমাজ), ড. সনৎকুমার বিশ্বাস, ড. জয়দীপ চন্দ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) ড. সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক ও সাংবাদিক), ড. বিরাট বৈরাগ্য (মতুয়া বিশেষজ্ঞ), ড. সুবোধ হাঁসদা, ড. তন্ময় বীর। মূল সংগঠকদের পক্ষে উপস্থিত থাকবেন : ভাষা মঞ্চের পক্ষে : সুবোধ বিশ্বাস, ড. দুলালকৃষ্ণ দাস, জয়ন্ত রায় জয়ন্ত বিশ্বাস, অমর ঘোষাল, ড. সুজয় চক্রবর্তী, রঞ্জিত দত্ত, অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ চক্রবর্তী (অতন্দ্র পথ), সুনীল বসাক, কমল ব্যানার্জি, অশোক দাস, কেয়া মুখার্জি, বাপী নন্দী ও মুকেশ, আশিস লাহিড়ী (আকিঞ্চন), দীনেশ বিশ্বাস ও নারায়ণ বিশ্বাস (পথ সংকেত), মলয় বিশ্বাস (পালি কৃত), স্বপন পাল (শিশু সাহিত্য), সম্পাদক, নিস্পলক মলয় রায়, সমীর কয়াল, নিতাই মান্না, সন্দীপ বিশ্বাস, অমরেশ বিশ্বাস, ড. নবনীতা বসু, প্রধান শিক্ষক আশিস চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় রায়, (ঐকতান), ড. অয়ন্তিকা ঘোষ, অমর ভান্ডারি, ড. দয়াল সরদার, ড. লক্ষণ সরকার, ড. শুভ্রা ঘোষ, ড. পুষ্প বৈরাগ্য, ড. বিষ্ণু শিকদার, ড. পূর্বাশা বৈরাগ্য, ড. নিত্যানন্দ মণ্ডল, ড. পীযূষ হালদার, ড. প্রবীর লাহা, জহরকান্তি দাস, প্রিয়লাল মৃধা ও সন্তোষকুমার বিশ্বাস (এফসো), সমর প্রামাণিক ও গৌরী হালদার (দলিত সমন্বয়), অরণি সেন (স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন), পল্লব রায় (চিত্র পরিচালক), অশোক রায় (দলিত কর্মচারী সংঘ), হেলালউদ্দীন (মিজান), অজয় ঘোষ, অশোক মজুমদার (পলতা গুরুচাঁদ ভবন), লালু. বাড়াইক (পঃ বঃ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ) ভবানীশংকর চক্রবর্তী, (পঃ বঃ ছোটো পত্রিকা সমন্বয় সমিতি), রাজু সাহা (আসাম সংহতি মঞ্চ), ড. নূরুল ইসলাম, ড. বিশ্ব রায়, ড. বিরূপাক্ষ বৈদ্য, পরেশ পাল, ড. শিখা বিশ্বাস, লুৎফুল আলম, স্বরূপা মিত্র, সৈকত আলি, বাসুদেব মোশেল, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, রতন সেনগুপ্ত, দেবব্রত ঘোষ, মলয় (সাবাস), কুন্তল

ভক্ত (উত্তরমেঘ), ড. বসুধা বিশ্বাস (বাল্মীকি) চিন্ময়ী বিশ্বাস, (জলঙ্গী), ও কৌশিক সিংহ, চন্দ্রশেখর সরকার (সাধারণ সচিব, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সাহিত্য সং পরিষদ), সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, স্বপন ভট্টাচার্য ও ইন্দ্রাণী দত্তপান্না (রাইটার্স ওয়ার্ল্ড), নন্দিনী সরকার, (ঝড়ো হাওয়া), দীপঙ্কর বিশ্বাস (প্রত্যয়), গোপাল বিশ্বাস (পুষা), জগন্নাথ পাল (শব্দ সেনা), শম্পা হালদার (বহমান তিতাস), সুদীপ কর্মকার (দ্বীপবাংলা), সত্য মোদক (ফাৎনা), সাধন চন্দ্র, (অথপঠ) তারাশঙ্কর চক্রবর্তী (আলোর শিশু) চপল বিশ্বাস (চেতনা), আলোচনাচক্রের বক্তাগণ কেবল আমন্ত্রিত। কবিসম্মেলনঃ কবি শোভা মণ্ডল, লালমোহন বিশ্বাস, ড.মনোরমা পোল্লে মণ্ডল, কঙ্কণ সরকার, বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত, অর্চনা মণ্ডল, গোপালচন্দ্র মণ্ডল, গীতশ্রী সাহা, অরূপ পান্থী, রতনকুমার ঘোষ, রাজশংকর পান্ডে, প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবগোপাল চৌধুরী, রমা দেবনাথ, সুতপা ভট্টাচার্য, প্রবীর দেবনাথ, বিকাশ মৈত্র, অমৃতলাল বিশ্বাস, সুনীল মণ্ডল, রঞ্জিত মালো, শ্রীশংকর, স্মরজিৎ অধিকারী, স্বপন বালা, অপূর্ব মজুমদার, মিলি দাশ, সোমা বিশ্বাস, অসিত দাস, মানবেন্দ্র রায়, ভবেশ জানা, অসীম মাইতি, অশোক আচার্য, কালিপদ চক্রবর্তী শ্যামল ব্যাপারি, সুধীন গোলদার, সীমা বিশ্বাস, শিপ্রা আঢ্য ব্যানার্জি, শিল্পী মণ্ডল, তৃণাঞ্জন ভট্টাচার্য, ইলা দাস, বসুমিত্রা ভট্টাচার্য, পার্থ সরকার, বিশ্বনাথ অধিকারী, দুলাল সুর, স্বপন পাল, অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, চৈতন্য দাস, কবিতা ভট্টাচার্য, কল্যাণ সরকার, আশিস ব্যানার্জি, আয়েশা বেগম, বিভুতিভূষণ বিশ্বাস, আ প্রিয়া সরন, রাগিনী রাহি রায়, ডা আশিসকান্তি হীরা, প্রবীর হালদার, আকিকুল ইসলাম, অনুপ দত্ত, রীনা গিরি, কাবেরী সিংহ রায়, লোপামুদ্রা মুখার্জী, সামসাদ বেগম, অশ্রুকণা দাস, মধুমিতা গাঙ্গুলী, আবৃত্তি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, পূজন ঘোষ, একক কর্মকার, রণেন ধারা। সংগীত : অরুণ ভট্টাচার্য, প্রণতি ভৌমিক, শান্তা শ্রীমানী, সাধনা গোলদার, শিবু লাল শীল, রত্নদ্বীপ চক্রবর্তী, অনুষ্কা সরকার, পারিজাত রায়, মৌসুমী ও অমর সরকার, আর থাকবেন ঐকতান গ্রুপের মুনমুন মান্না, লতিকা মণ্ডল, নূপুর লোধ, মীনা সাহা, দীপ্তি নন্দী, সমাপ্তি দাস, মন্দিরা সেন, অনুরাধা দাস ও বাবলি দাস।

পদযাত্রা পরিচালনা ঃ তপন দাস ও অমিতাভ চক্রবর্তী। আহ্বায়ক : নীতীশ বিশ্বাস। সম্পাদক, সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চ, ৯৩৩০৯৬১৮২৪।

বি.দ্র. : অন্য যাঁরা থাকবেন ঐকতান পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে তাঁদের নাম সংযুক্ত হবে।

শতবর্ষে ডার্বি ম্যাচ

- মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ১৮৮৭ সালে
- ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০তে
- প্রথম সাক্ষাৎ ১৯২১এর কোচবিহার কাপের সেমিফাইনালে
- মোট সাক্ষাৎ ৩৭৩ বার
- ইস্টবেঙ্গলের জয় ১২৯ বার
- মোহনবাগানের জয় ১২২ বার
- ড্র ১২২ বার

দেশের এক তৃতীয়াংশ মহিলাই নির্যাতিত

(জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা রিপোর্ট-৫)

- ৩০ শতাংশ মহিলা (১৮-৪৯ বছর) ১৫ বছরের পর থেকে শারীরিক বা যৌন হেনস্থা এবং নির্যাতনের শিকার। এছাড়া রয়েছে মানসিক নির্যাতন
- ২৯.৩ শতাংশ মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার
- ১৪ শতাংশ মহিলা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব
- বিবাহিত মহিলাদের ৩২ শতাংশ স্বামীর কাছ থেকে মানসিক, শারীরিক ও যৌন হেনস্থার শিকার যার মধ্যে ২৮ শতাংশ শারীরিক ও যৌন নির্যাতন। সব চাইতে বেশি কর্ণাটক, বিহার, তেলেঙ্গানা, মণিপুর ও তামিলনাড়ুতে। সবচাইতে কম লাক্ষা দ্বীপে (২.১ শতাংশ)
- দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারে, মদ্যপায়ী স্বামীদের ক্ষেত্রে এবং গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের উপর নির্যাতন বেশি

খবরাখবর

- গ্রিক পুরাণের পক্ষীরাজ ঘোড়া, হিন্দু পুরাণে সমুদ্র মন্থনে আগত ইন্দ্রবাহন উচ্চৈঃশ্রবা এবং অধুনা ইজরায়েলের এন.এস.ও সংস্থার তৈরি 'পেগাসাস' স্পাইওয়্যারের মাধ্যমে মোদি সরকার বিরোধী দলের নেতানেত্রী, নিজের দলের বিরুদ্ধ পক্ষ, নিজের সরকারের দুজন মন্ত্রী, বিচারপতি, আইনজীবী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী প্রমুখের ফোন গোপনে হ্যাক করে আড়ি পেতে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ ও নজরদারি চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ২০১৭ থেকে। ১৫টি সংবাদমাধ্যমের যৌথ তদন্তে জুলাই ২১-র মাঝামাঝি এই খবর ফাঁস হওয়ার পর ভারতীয় সংসদ থেকে রাজনৈতিক মহল প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠেন।
- উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহের দ্রুত গলনের ফলে ১৮৫০ থেকে ২০১৫-র মধ্যে সুইস আলপসের কাছে তৈরি হয়েছে ১২০০টি জলাশয়। এর মধ্যে গত এক দশকে তৈরি হয়েছে ১৮০টি জলাশয়। হিমবাহের আয়তন গত এক বছরে সংকুচিত হয়েছে দুই তৃতীয়াংশ।
- ২০২১-র কান চলচ্চিত্র উৎসবে পায়েল কাপাডিয়ার 'আ নাইট অফ নোয়িং নাথিং' শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র নির্বাচিত হল।
- নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজে ছয়টি ডোম পদের (ল্যাবেরটরি অ্যাটেন্ডেন্ট) জন্য আবেদন ৮,০০০ প্রার্থীর। তার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ১০০ জন। স্নাতকোত্তর প্রায় ৫০০ জন এবং স্নাতক ২০০০ জনের বেশি।
- কিংহাই-তিব্বত রেলপথের মাধ্যমে আগেই চিনের মূল অঞ্চলের সাথে বিশ্বের সর্বোচ্চ মালভূমি তিব্বতের রাজধানী লাসায় বুলেট ট্রেন সংযোগ হয়েছিল। এবার সিচুয়ান-তিব্বতের অন্তর্গত লাসা থেকে ৪৩৫ কিমি দূরে ৪,৫০০ মিটার উচ্চতায় ভারতের অরুণাচল সীমান্তে নিনচি অবধি তৈরি হল বুলেট ট্রেন, যা মাত্র সাড়ে তিনঘণ্টায় বিপুল পরিমাণ সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে পারবে সীমান্তে।
- রাষ্টপুঞ্জের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০-এর মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে। ১৯০১ থেকে ১৯৭১ অবধি সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩ মিলিমিটার। ২০০৬ থেকে ২০১৮ তে ৩.৭ মিলিমিটার। ১৯০১ থেকে ২০১৮ অবধি সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বেড়েছে ০.২০ মিটার। স্থলভাগের তাপপ্রবাহ বেড়েছে।
- ১৮৯৬ থেকে আধুনিক ওলিম্পিকস শুরু হয় এবং ১৯০০ থেকে ভারত অংশ নিতে শুরু করে। সেই বছরই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র নর্মান প্রিচার্ড ২০০ মিটার স্প্রিন্ট ও ২০০ মিটার হার্ডলসে রুপো পান। এরপর ভারতীয় হকি দল আটবার সোনা পায়। ব্যক্তিগত সোনা প্রথম ভারতীয় হিসাবে পান অভিনব বিন্দ্রা শুটিং-এ ২০০৮ এর বেজিং ওলিম্পিকসে। অ্যাথলিটকসে প্রথম সোনা পান নীরজ চোপরা জ্যাভেলিন থ্রো তে ২০২১ (২০) টোকিও ওলিমপিকসে। সেখানে একটি সোনা, দুটি রুপো ও চারটে ব্রোঞ্জ পেয়ে ভারত ৪৮তম স্থান পায়।
- বাংলাদেশের মেঘনা সহ পটুয়াখালি, বরিশাল, খুলনার বড় নদীগুলির বঙ্গোপসাগর মোহনায় এবং মায়ানমারের ইরাবতী নদীর মোহনায় সিতুইয়ে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গা মোহনায় ইলিশের আকাল। এর কারণ হিসাবে 'সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক অফ ড্যাম রিভার অ্যান্ড পিপল' এর মতে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার পাড় বরাবর একশোরও বেশি পুরসভার যাবতীয় আবর্জনা এবং কলকারখানার বর্জ্যে গঙ্গার দূষণ মাত্রা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।
- বক্সা ও দার্জিলিংয়ের চা বাগানের পর নেওড়াভ্যালির জঙ্গলেও ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা মিলল। ট্র্যাপ ক্যামেরায় তার ছবি ধরা পড়ে।
- স্পাইনাল মস্কিউলার অ্যাট্রফি (এস.এম.এ) রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসার বিনামূল্যে ১৩টি শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল পিয়ারলেস হাসপাতাল এবং 'কিয়োর এসএমএ ইন্ডিয়া'।
- আরব মুলুকে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন উত্তর আফ্রিকার তিউনিশিয়ার ভূতত্ত্বের অধ্যাপিকা নাজলা বাউদেন রমধান।
- ২০২১-এ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিজ্ঞানী ডেভিড জুলিয়াস ও আর্ডেম পাটাপুটিয়ান। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যুকুরো মানাবে, জার্মানির ক্লাউস হাসেলমান ও ইতালির জার্জিয়ো পারিসি। রসায়নে নোবেল পেলেন জার্মানির বেঞ্জামিন লিষ্ট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ম্যাকমিলান। সাহিত্যে নোবেল পেলেন ব্রিটেনের অভিবাসী পূর্ব আফ্রিকার সাহিত্যিক আবদুল রাজাক গুরনা। নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন দুই সাংবাদিক ফিলিপাইনসের মারিয়া রেসা ও রাশিয়ার দিমিত্রি মুরাতভ। অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোওয়া অ্যাংগ্রাইষ্ট, গিডো ইমবেন্স ও ডেভিড কার্ড।
- পূর্ব কলকাতার বিশ্ববিখ্যাত জলাভূমি ধাপার সাথে সংপৃক্ত। সেই পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে যেমন প্রোমোটার ও জমি মাফিয়ারা প্রভাবশালীদের মদতে গ্রাস করছে তেমনই ধাপাকে করে তোলা হচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। 'রাজ্য দূষণ পর্ষদে'র সমীক্ষা অনুযায়ী ধাপার দূষিত এলাকার পরিমাণ ২৪ হেক্টর। মাত্রাতিরিক্ত ধূলিকণা ৮৮০.৫ কিগ্রা। জল ও স্থলে মাত্রাতিরিক্ত ক্রোমিয়াম, তামা, সীসা, ক্যাডমিয়াম, দস্তা, নিকেল। আর্থিক হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ মাসিক আট লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।
- ইয়াস সহ ঘূর্ণিঝড়-প্লাবনের দাপটে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরের ভেড়ি, জলাশয়গুলো উপচে পড়ায় চাষ করা মাছ অন্যত্র চলে গিয়ে মৎস্যজীবীরা প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। আবার দেখা গেছে মীনদ্বীপ, নয়াচর সহ বিভিন্ন জায়গায় জলাশয়ে নদী বা অন্যত্র থেকে পোনা ট্যাংরা, মিঠা ট্যাংরা, খয়রা, বেলে, পায়রাচাঁদা, মুক্তোগাছা, বকমাছ, পাঁকাল মাছ, গুড়চাকলি, চিতল, ভেটকি, গলদা চিংড়ি সহ বেশ কিছু হারিয়ে যাওয়া মাছের দেখা মিলেছে। নদীর পাড় বরাবর মিলছে সামুদ্রিক কাঁকড়া।

- ১৯৮১ সালের ৪০ বছর পরে ২০২১ সালে কলকাতা ফুটবল লীগ চাম্পিয়ন হল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।
- ২০২১-র নভেম্বর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের শতবার্ষিক ডার্বি ম্যাচে জিতল মোহনবাগান।
- মধ্য ইরানের ইস্পাহানের উপর দিয়ে বয়ে চলা নদী 'জায়ান দেহ্ রুদ' আজ খরা ও সরকারি অবহেলায় মৃত। তাকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে হাজার হাজার কৃষক ও স্থানীয় মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন।
- গুগলের সুন্দর পিচাই, মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা, আইবিএমএর অরবিন্দ কৃষ্ণা, অ্যাডবের শান্তনু নারায়ণ, ভি এম ওয়ারের রঘু রঘুরামের পর ট্যুইটারের সিইও হলেন আরেক ভারতীয় বংশধর আইআইটি মুম্বইয়ের প্রাক্তনী পরাগ আগরওয়াল।
- নীতি আয়োগ ২০২১ নভেম্বরে যে রিপোর্ট বের করেছেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের ২১.৪% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করেন ২৯টি রাজ্যের মধ্যে তিনটিতে—বিহার, ঝাড়খন্ড ও উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার তিনভাগের এক ভাগ পরিবার অপুষ্টিতে ভোগেন। ৬.১ % পরিবার রান্নার জ্বালানি হিসাবে কাঠ ও কয়লা ব্যবহার করেন। ৪৭% পরিবার কাঁচা বাড়িতে থাকেন। ৩২% পরিবারের শৌচাগার নেই। রাজ্যের মধ্যে বেশি দারিদ্র্য উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে।
- মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারতের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ১০টি উইকেট পেয়ে কিংবদন্তি জিম লেকার ও অনিল কুম্বলের রেকর্ড ছুলেন নিউজিল্যান্ডের স্পিনার অজাজ প্যাটেল।
- 'নিউক্লিয়ার থ্রেট ইনিসিয়েটিভ', 'ইকনমিক ইমপ্যাকট' ও 'জন হপকিনস্ সেন্টার ফর হেলথ্ সিকোয়ারিটি' ডিসেম্বর ২১-এ যে 'গ্লোবাল হেল্থ সিকোয়রিটি ইনডেক্স' প্রকাশ করেছে তাতে বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৬ (১০০ তে ৪২.৮)। প্রথম তিনটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ফিনল্যান্ড।
- ২০১৯ এ মাত্র ৩৫ বছর বয়সে পেয়েছিলেন 'শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার'। বীজগণিত ও জ্যামিতির সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন। এযাবৎকালের অঙ্কের অমীমাংসিত সমস্যা 'জ্যারিস্কি ক্যানসেলেশন' এর সমাধানের দিশা দেখিয়ে হয়েছেন 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের'র নির্বাচিত ফেলো। ২০২১-এ 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরোটিকাল ফিজিক্স', ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক ও 'ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথামেটিকাল ইউনিয়ন' এর প্রদত্ত 'রামানুজম পুরস্কার' পেলেন কলকাতার 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট (আই.এস.আই)' এর থিয়োরেটিকাল স্ট্যাটিসটিক্স ও ম্যাথামেটিক্স বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর নীনা গুপ্ত।
- সুস্মিতা সেন ও লারা দত্তের পর ২১ বছর বাদে ২১ বছরের ভারতীয় সুন্দরী হারনাজ সান্ধু ইজরায়েলের এলাটে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলেন।
- তাসখন্দে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারত্তোলনে ৭৩ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন হাওড়ার ধূলাগড়ের বাসিন্দা অচিন্ত্য শিউলি।
- ইউনেস্কোর আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় (ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি) ২০২১-এ বিশ্বের যে ৩১ টি বিষয় সংযোজন হয়েছে তাতে স্থান পেয়েছে কলকাতার দুর্গোৎসব।
- ২৩ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের বক্সার জঙ্গলে বাঘ দেখতে পাওয়া গেল। ধারণা ভূটানের জঙ্গল থেকে এসেছিল।
- ২৫ ডিসেম্বর ২১-এ এরিয়ন-৫ রকেটে চড়ে মহাকাশে পাড়ি দিল সবচাইতে শক্তিশালী 'জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ'। ২৯ দিনে ১৫ লক্ষ কি.মি. পাড়ি দিয়ে দূর মহাকাশের ছবি তুলে বিশ্লেষণ করে পাঠাতে শুরু করেছে।
- ১০০ এর বেশি মাইন শনাক্তকারী বিখ্যাত ইঁদুর মাগাওয়ার আট বছর বয়সে ১৩ জানুয়ারি ২২এ মৃত্যু হয়। ২০১৩-এ আফ্রিকার তানজানিয়ায় জন্ম এই জায়ান্ট পাউচড র‍্যাটের। এপোপোতে প্রশিক্ষণ শেষে ২০১৬তে পাঠানো হয় কম্বোডিয়ার সিয়াম রিয়েপে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কম্বোডিয়ায় লুকোনো মাইন খুঁজতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল মাগাওয়া।
- ভূপৃষ্ঠের ৯০% অধিকার করে থাকা সমুদ্র সম্পর্কে বিশেষ করে বিশেষত ১০ হাজার ফুট বা তার বেশি গভীর অঞ্চল সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। সেই বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে 'লোরিয়াসে'র পর 'অর্ফিয়ুস' জলযানকে পাঠাচ্ছেন সমুদ্র বিজ্ঞানীরা।
- ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জয়তী ঘোষ জানুয়ারি ২১ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বিতীয় উচ্চপর্যায়ের আর্থিক ও সামাজিক উপদেষ্টা পদে কাজ করার পর ২১ মার্চ '২২এ রাষ্ট্রপুঞ্জের উচ্চ পর্যায়ের পর্ষদে মনোনীত হলেন।
- ভারতীয় বিদেশনীতির প্রশংসা করলেন প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খাঁন। তিনি বলেছেন ভারতকে অভিনন্দন জানাই। তাদের বিদেশনীতি পাকিস্তানের চাইতে ভাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কোয়াড গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ভারত নিরপেক্ষ নীতি নিয়ে চলেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া পশ্চিমী দেশগুলির নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছে। তথাপি ভারত তাদের কাছ থেকে তেল কিনছে। কারণ ভারতের বিদেশনীতি ভারতবাসীর উন্নতির জন্য পরিচালনা করা হয়।
- বাংলাদেশ আগেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরিত হয়েছিল। এবার পটুয়াখালির কলাপাড়ায় চিনের সাহায্যে দেশের সর্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে বিদ্যুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হল।
- এবার পুরুলিয়ায় বনদপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ঝালদার কোটশিলা বনাঞ্চলের সিমনি পাহাড়ে অস্তিত্ব পাওয়া গেল চিতাবাঘের। যদিও স্থানীয় আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে চিতাবাঘের অস্তিত্ব দাবি করছিলেন।

- পাকিস্তানের নবগঠিত শাহবাজ শরিফ মন্ত্রীসভায় শেরি রহমান, হিনা রাব্বানি খার, মরিয়ম ঔরঙ্গজেব, আয়েষা গউস পাশা ও সাজিয়া মারি—পাঁচজন নারীকে মন্ত্রী করা হয়েছে।
- স্থাপত্যবিদ্যায় নোবেল ২০২২ প্রিৎজেকার পুরস্কার পেলেন প্রথম আফ্রিকান ও কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে বোরকিনা ফাসোর দিয়েবেদো ফ্রান্সিস কেরে।
- অ্যালিসা হিলির ব্যাটিং দাপটে ইংল্যাণ্ড মহিলা ক্রিকেট দলকে হারিয়ে সপ্তমবার প্রমিলা ক্রিকেটের বিশ্বকাপ জিতল অস্ট্রেলিয়া।
- ভারতের বেঙ্গালুরুর হ্যাল এ তৈরি ১৭ আসনের ডরনিয়ার—২২৮ ১৩ এপ্রিল প্রথম যাত্রী নিয়ে অসমের ডিব্রুগড় বিমানবন্দর থেকে অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট বিমানবন্দরে পৌঁছল।
- কেরলের কান্নুরে অনুষ্ঠিত সিপিআইএম দলের ২৩তম কংগ্রেসে দলিত সম্প্রদায়ের রামচন্দ্র ডোম পলিটব্যুরোতে এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেবলীনা হেমব্রম কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হলেন।
- সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন-এর ডাকে বেতনবৃদ্ধি সহ বারো দফা দাবিতে ১৬ মার্চ '২২ কলকাতায় বিক্ষোভ দেখান মিড-ডে মিলের কর্মীরা। তারা কেন্দ্র সরকারের মিড-ডে মিলের বাজেট ছাঁটাই এরও প্রতিবাদ করেন।
- বকেয়া উৎসাহ ভাতা সহ বিভিন্ন দাবিতে 'পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী সংগঠনে'র নেতৃত্বে কয়েক হাজার আশাকর্মী ১৮ ফেব্রুয়ারির '২২ কলকাতার ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখালেন।
- কম্পিউটার নির্মিত কৃত্রিম জীবনসত্তা যুক্ত জ্যান্ত রোবট জেনোবটের প্রজনন।
- ইউক্রেনে রুশ হানায় ধ্বংস হয়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম বিমান 'ম্রিয়া' (স্বপ্ন)। আন্তোনভ বিমান নির্মাণ সংস্থা ১৯৮০-র দশকে এই ২৯০ ফুট চওড়া ডানার এ এন-২২৫ বিমানটি নির্মাণ করে রাশিয়ার মহাকাশযান বুরানকে বহন করার জন্য।
- গুজরাটের দাহোদে ভারতের চতুর্থ ও গুজরাটের প্রথম ৯০০০ হর্স পাওয়ার লোকোমোটিভ তৈরির কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর হল।
- দিল্লি জাহাঙ্গিরপুরীতে উত্তর দিল্লি পুরনিগম বুলডোজার দিয়ে বেআইনি বাড়ি ও দোকান ভাঙছিল। অভিযোগ বিজেপি চালিত পুর নিগম সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ করছিল। এর বিরুদ্ধে আদালত স্থগিতাদেশ দেয়। এরপরও উচ্ছেদ চলতে থাকে। আদালতের কপি হাতে নিয়ে সিপিআইএম নেত্রী বৃন্দা কারাত সহযোগীদের নিয়ে বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে উচ্ছেদ আটকান।
- ২০১৮এর পর ২০২২-এ আবার পুলিৎজার পুরস্কার পেলেন চিত্র সাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকি। এবার মরণোত্তর। এছাড়াও ২০২২-এ পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন তিন ভারতীয় আদনান আবিদি (দ্বিতীয়বার), সান্না ইরশাদ মাট্টু ও অমিত দাভে।
- ১৪২৯ বঙ্গাব্দে ২৫ বৈশাখ কলকাতার বাংলা আকাদেমির রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর 'কবিতাবিতান' কাব্যগ্রন্থের জন্য প্রথম 'রিট্রিভারশিপ পুরস্কার' ঘোষণায় ব্যাপক বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবাদ করেছেন রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাদিরঞ্জন বিশ্বাস, তসলিমা নাসরিন, কৃষ্ণেন্দু বেরা, আখতারুজ্জামান আজাদ প্রমুখ সাহিত্যিকরা।
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী কালীঘাটের আদিগঙ্গায় ভাটার সময় মোট কলিফর্ম ১০০ মিলিলিটারে এক কোটি ১০ লক্ষ এম. পি. এন.। নির্ধারিত সর্বাধিক মাত্রার দু হাজার গুণ। এর মধ্যে ফিকাল কলিফর্ম ৪৬ লক্ষ এম.পি.এন।
- ইস্তামবুলে অনুষ্ঠিত মহিলাদের বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম সোনাজয়ী ভারতীয় বক্সার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন তেলেঙ্গানার নিজামাবাদের নিখাত জারিন।
- চারিদিকে দূষণ, কার্বণ নিঃসরণ, গাছ কাটা, বনধ্বংস, জলের হাহাকারেই মধ্যে একসময় সাহারা মরুভূমি ও বৃক্ষনিধনের গ্রাসে চলে যাওয়া উষর উষ্ণতম দরিদ্রতম দেশ নাইজারের কৃষকরা গত তিনদশকে ২৫ কোটি আকেসিয়া, গাও, বাওবাব সহ নানাধরনের গাছ লাগিয়ে এমন এক সবুজপ্রাচীর গড়ে তুলেছে যার ফলে মরুভূমির অগ্রগতি থেমে গেছে। জলস্তর, গবাদিপশু ও কৃষি ফলন বেড়েছে।
- কোভিড অতিমারির তিনটি ঢেউয়ে ভারত সরকার কোভিডে মৃত্যু দেখিয়েছিলেন পাঁচ লক্ষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ল্যানসেট হিসাব কষে দেখিয়েছেন ভারতে কোভিডের তিনটি ঢেউয়ে মৃত্যুর সংখ্যা অন্তত ভারত সরকার ঘোষিত সংখ্যার ১০ গুণেরও বেশি।
- সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কাছে ভারত এক বিপজ্জনক দেশ হয়ে উঠেছে। এখানে নিয়মিতভাবে সংবাদজগৎ ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে। সাংবাদিকদের হত্যা করা হচ্ছে। 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স'এর সূচকে বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান ১৫০।
- গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ভারতের আশা (ASHA) কর্মীদের, যার সংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি, 'গ্লোবাল হেলথ লিডারস' পুরস্কার দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংখ্যা। ৭৫তম হেলথ সামিটে একই পুরস্কার মরণোত্তর পেলেন আফগানিস্তানের আটজন পোলিও স্বেচ্ছাসেবক ২০২১এ যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।
- ভারতীয় হিসাবে প্রথম ইন্টারন্যাশনাল বুকার প্রাইজ পেলেন গীতাঞ্জলি শ্রী দেশভাগের পটভূমিকায় হিন্দি উপন্যাস 'রেত সমাধির (ইংরেজি অনুবাদ 'টুম অফ স্যাণ্ড', অনুবাদক : ডেজি রকওয়েল) জন্য। এই প্রথম কোন ভারতীয় ভাষায় লেখার অনুবাদ বুকার পেল।
- সব শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ২৩ ও ২৪ মে হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ও স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন 'নাসেস ইউনিটি'র নেতৃত্ব নার্সিং ডিগ্রিপ্রাপ্ত তরুণীরা।
- সব রকম ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ। টেস্টে তার ১২ ম্যাচে ৬৯৯ (গড় ৪৩.৬৮), ওয়ান ডে তে ২৩২ ম্যাচে ৭৮০৫ (গড় ৫০.৬৮), টি টোয়েন্টিতে ৮৯ ম্যাচ ২৩৬৪ (৩৭.৫২)।
- মারিয়াম মির্জাখানির পর দ্বিতীয় নারী গণিতবিদ মারিয়া ভিয়াজস্কোভা গণিতে 'ফিলডস' পুরস্কার পেলেন।
- টোকিও প্যারাওলিম্পিক গেমসে পাঁচটি সোনা, আটটি রুপো, ছয়টি ব্রোঞ্জ পেয়ে ভারত ২৪তম স্থানে।

কার্টুনের দুনিয়ায়

AFGHANISTAN?
THE BUCK STOPS HERE.

A SUPERHERO EMERGES...
ZELENSKY

SRI LANKA
Gota go!

CLEAN SWEEP...

WHAT VIOLENCE? I'M STARVELESS!

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন • দ্বাদশ বর্ষ • শারদ সংখ্যা ১৪২৯ • ISSN : 13660

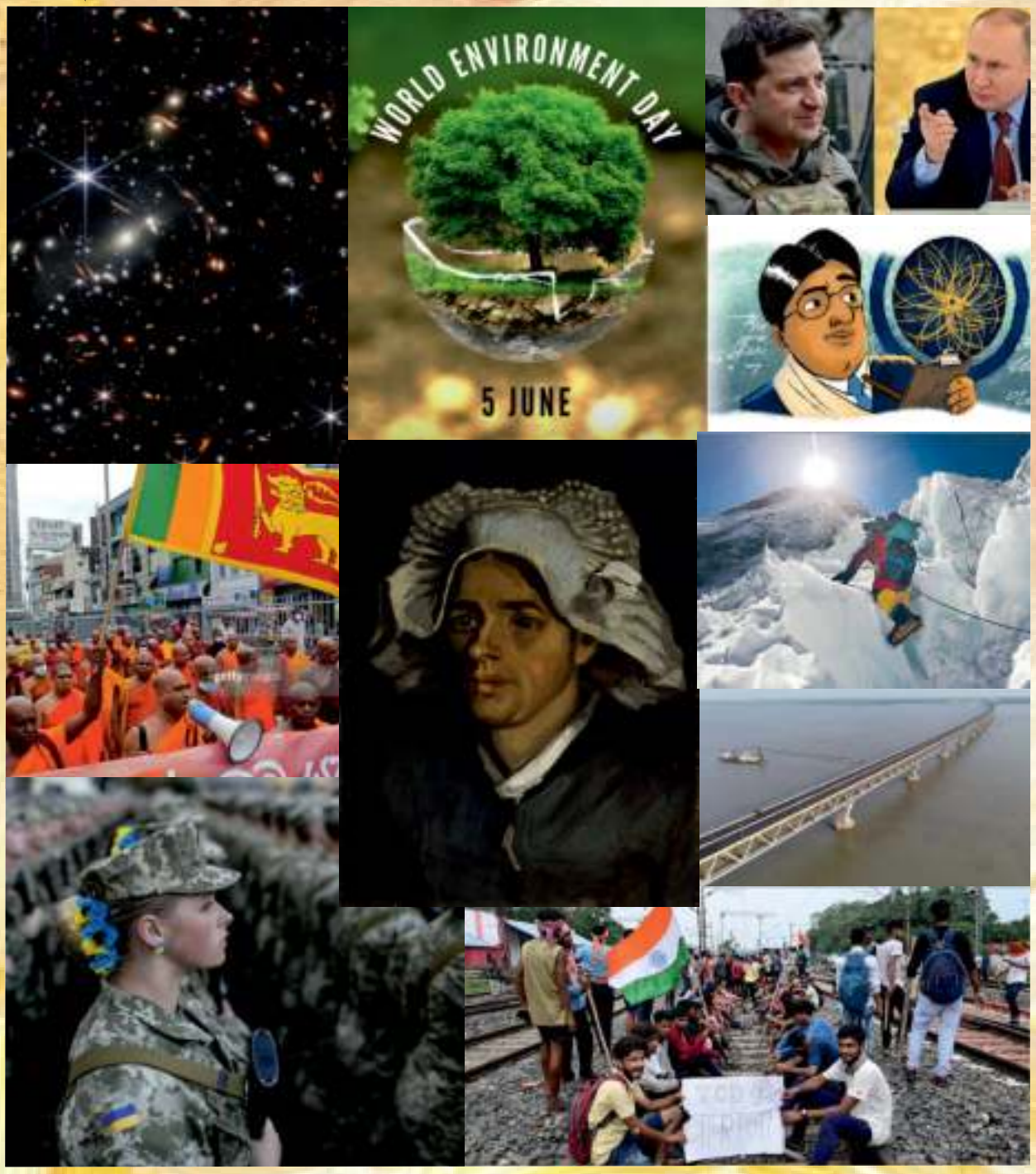

স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়নের সম্পাদকমণ্ডলীর তরফ থেকে অরণি সেন কর্তৃক ৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২, ফোন ৯৮৩০০৫৮৫৪৭ থেকে মুদ্রিত।

e-mail : ssunnayan@gmail.com || Website : www.ssu2011.com

₹৬০